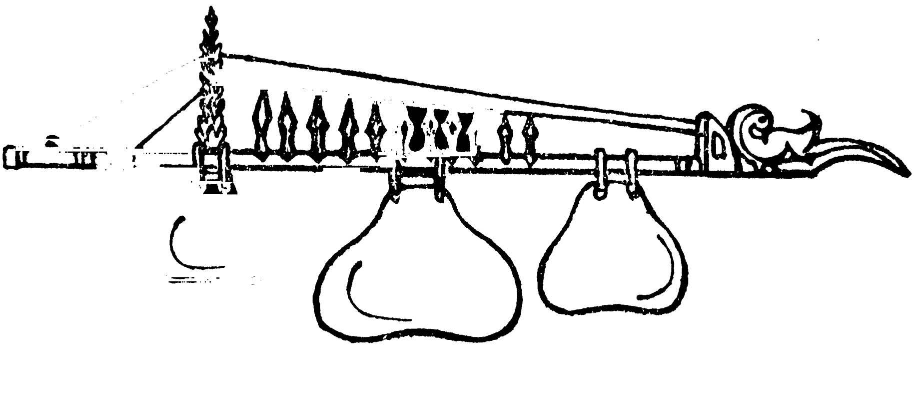
সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান



॥ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

বাংলা :

১। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (সংগীত ও সংস্কৃতি), ১ম ও ২য় ভাগ,
(শিশির-স্মৃতি পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৯৫৮)

২। রাগ ও রূপ, ১ম ও ২য় ভাগ,

৩। বাংলা ধ্রুপদমালা (স্বরলিপিসহ),

৪। নাট্যসংগীতের রূপায়ন।

ইংরাজী :

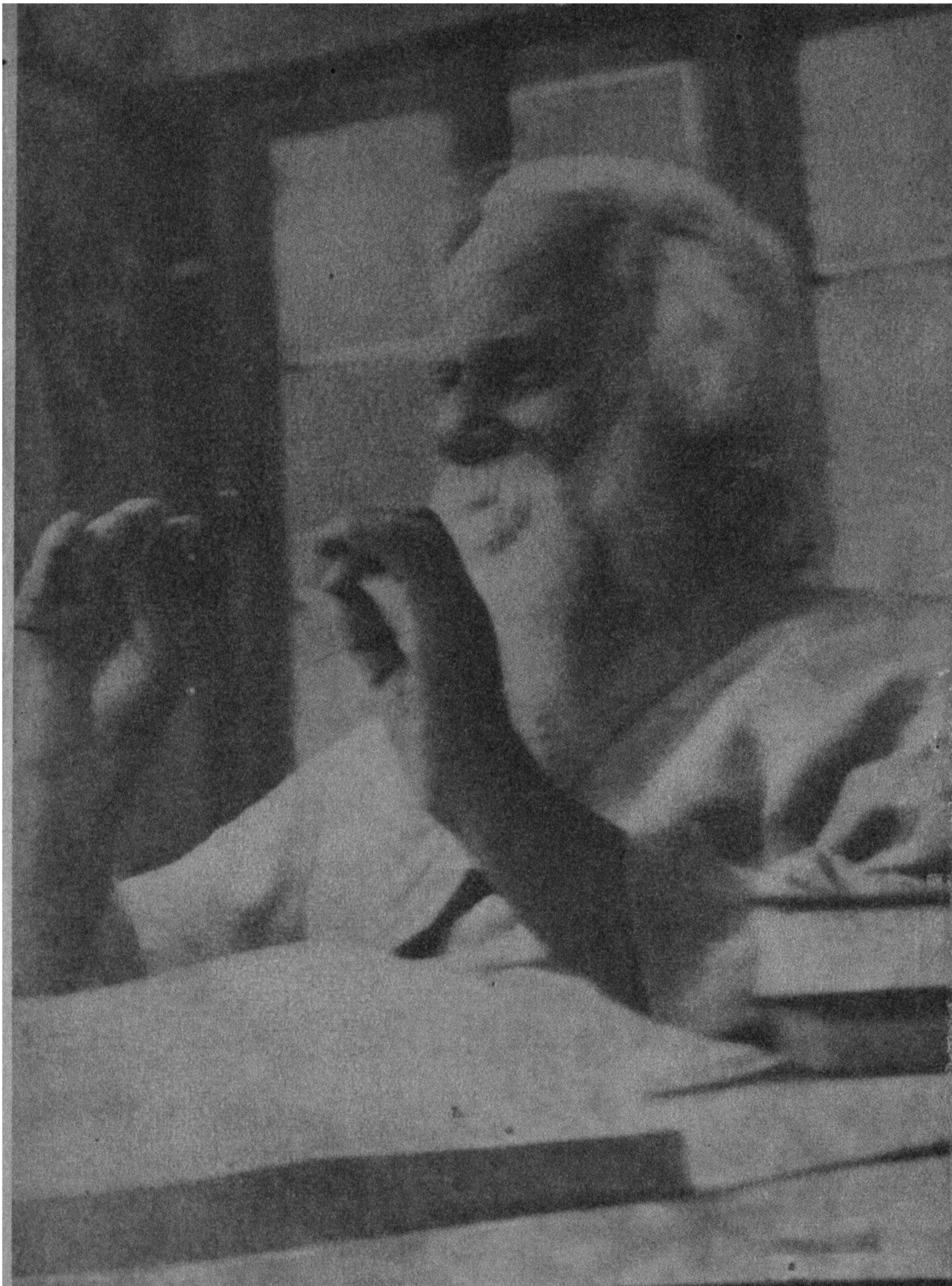
1 A History of Indian Music, vols. I & II.

2. A Historical Study of Indian Music.

3. Historical Development of Indian Music.
(*Awarded the Rabindra Prize in 1960.*)

4. Music of the Nations.
(*Music systems of different nations of the world.*)

তাছাড়া Philosophy of Progress & Perfection ; Christ the Saviour ; অভেদানন্দ-দর্শন ; তীর্থরেণু ; মন ও মানুষ ; শ্রীদুর্গা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র ও দার্শনিক আলোচনার এবং অন্যান্য ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থ।



সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭
দ্বিতীয় বর্ধিত নূতন প্রকাশ ১৯৬৫

প্রকাশক স্বামী আদ্যানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬
মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ.
বোধি প্রেস। ৫ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

॥ উৎসর্গ ॥

কবির স্নেহধন্যা

শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানিকে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করা হোল।

॥ ভূমিকা ॥

'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' পূর্বে প্রকাশিত 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ'-গ্রন্থেরই সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত নূতন সংস্করণ।

রবীন্দ্রনাথের গানের আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে একেবারে যে রবীন্দ্র-সংগীত জানি না তাও নয়। কেননা ক্ল্যাসিক্যাল ধ্রুপদ খেয়ালাদি গান শিক্ষা এবং বিশেষভাবে সংগীতের ঐতিহাসিক তথ্যের গবেষণা নিয়েই কাটিয়েছি বহুদিন এবং এখনও ঐ গবেষণাকর্মেরই পথিক। আসলে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের আমি ছাত্র, কিন্তু আমার পূর্ববংশের সংগীতসাধনা-সংস্কারই (family, tradition) আমায় সংগীতসাধনায় ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত করেছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ বিদগ্ধ বেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সংস্পর্শে আসি এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যোগদান করি। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও সংগীতশিক্ষায় ও সংগীত-গবেষণায় আমায় বিশেষভাবে প্রেরাণা-দীপ্ত করেন এবং নিঃসংশয়েই স্বীকার করি যে, সংগীতকর্মসাফল্যে যতটুকু আজ অগ্রসর হয়েছি তার কারণ একমাত্র স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরই সযত্ন-প্রেরণা এবং অসামান্য করুণা ও স্নেহ।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার তিনবার মাত্র হয়েছিল এবং আমায় বিমুগ্ধ করেছিল তাঁর অসাধারণ সংগীত, সাহিত্য ও কবিতা-মাধুর্য এবং সর্বোপরি তাঁর মহিমময় বিরাট ব্যক্তিত্ব। সেই সৌম্য-শান্ত-স্নিগ্ধ কান্তিবিশিষ্ট দীর্ঘায়তন মানুষটিকে তাই আজও আমি ভুলিনি এবং ভুলিনি বলেই তাঁর সংগীত-আলোচনার উপকরণগুলি সংগ্রহ ক'রে ঔপপত্তিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণযুক্ত এই রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থ রচনা করেছি।

রবীন্দ্রসংগীতের উপাদানসমৃদ্ধ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন বাঙলার বিদগ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞেরা, কিন্তু সে সকল রবীন্দ্রসংগীতের গ্রন্থে মরমী কবির জীবনদর্শনের পরিচয় পাই খুব কমই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থের

ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য ও সাহিত্য-রচনার সঙ্গে সংগীতের ভাবতত্ত্বেরও আলোচনা করেছেন অনেকে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সাধনাক্ষেত্রে শিল্পীজীবনে সেই সংগীতদর্শনতত্ত্বের আলোচনা ও সমাদরের নিদর্শন পাই নিতান্ত অল্প। অথচ রবীন্দ্র-জীবনসাধনা-মন্থনজাত তত্ত্বনির্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানে, প্রতিটি কবিতায় ও প্রতিটি রচনার মধ্যেই নিগূঢ়ভাবে নিহিত। রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়নে তাই সুরশিল্পীর মন অবগাহন করা উচিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানের মর্মকথা ও ভাবতত্ত্বের পুণ্যসলিলে। প্রতিটি গানের মসিরেখায় কবির জীবনরসেরই আছে সঞ্চয় ও পরিচয় এবং সুরের প্রেরণায় স্পন্দিত ও প্রাণবান হোলে কবি-মনেরই নিগূঢ় কথা এবং কবির জীবনসাধনা প্রতিফলিত হবে চাক্ষুষভাবে। সুরশিল্পী তাই অবহিত হবেন কবির জীবন-উপলব্ধির তত্ত্বনির্দেশ এবং কথা ও সুরের যুগ্মপ্রতিফলন অভিষিক্ত হবে রবীন্দ্রনাথেরই গানতত্ত্বে ও জীবনতত্ত্বরসে। নচেৎ রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতিফলন হবে অসারতায় পর্যবসিত।

তাই রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র দিকের আলোচনা করেছি তাঁর সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও সংগীতের দিকে দৃষ্টি রেখে। তাছাড়া বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তাঁর সংগীতে নিহিত দর্শনতত্ত্ব ও জীবনদর্শনের মর্মকথা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র বিশ্বেরই অন্তরাত্মার নিবিড় উপলব্ধি। 'রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে তাঁর জীবনদর্শন-সম্পর্কে আলোচনা করেছি একনিষ্ঠভাবে। মিষ্টার টমসন তাঁর ***Rabindranath Tagore (Poet and Dramatist)***-গ্রন্থে কবির জীবনদর্শনের মূলতত্ত্ব-সম্পর্কে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের দর্শনানুভূতি হোল "a deep and intimate communion with God into which the Jivan Devatā feeling merged" (p. 113)। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ***The Philosophy of Rabiandranath Tagore***-গ্রন্থে কবির জীবনদর্শনের পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন—"a sigh of the soul rather than a reasoned account of metaphysics; an atmosphere rather than a system of philosophy" (p. 6); অর্থাৎ তাঁর মতে, বৌদ্ধিক বিচারের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে দিব্যানুভূতির জ্ঞানরূপই হোল রবীন্দ্রনাথের ভাবতত্ত্ব

বা জীবনদর্শন। অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায় এ' প্রসঙ্গে বলেছেন : "The Absolute, according to the poet, contains changes, but does not Himself change. He is changeless, but His expressions are in change and movement"।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যানুভূতির কবি। ধর্মও ছিল তাঁর কবির ধর্ম। সাহিত্য, নাটক, গল্প, সংগীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের তিনি রচয়িতা এবং সকলগুলির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট তাঁর সচল কবিদৃষ্টির অনুভূতি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ তাই *The Philosophy of Rabindranath Tagore*-গ্রন্থে বলেছেন : "The poet worships God as the spirit of beauty, while the plilosopher pays his homage to God as the ideal of truth. Philosophy is the temple of truth, while poetry is the shrine of beauty. The two are not opposed, as truth is beauty and beauty is truth" (p. 160)। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মর্মকথাও তাই। মিঃ বামার, আণ্ডারহিল্, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 'মিস্টিক' বা মরমীয়া বলে বর্ণনা করেছেন। সে যাই হোক, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কবিতা বা গানের প্রতিটি ছন্দে অন্তর্নিহিত রয়েছে কবির জীবনদর্শনের মর্মকথা। প্লেটো, অ্যারিষ্টোটেল, হেরাক্লিটাস, কিংবা কান্ট, হেগেল, শেলিঙ, ফিক্টে, সোপেনহাওয়ার, কিংবা ব্র্যাডলি, বোসাঙ্কে, বের্গসোঁ, ক্রোচে, কিংবা শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতির বিচিত্র বিচারশৈলীযুক্ত দর্শনধারার প্রতিফলন তাঁর জীবনদর্শন নয়, পরন্তু সরল স্বচ্ছ বাস্তব ও সচল অনুভূতিকে নিয়েই তাঁর দর্শন সার্থক।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংগীতসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র পরিবেশে ও ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যে সকল আলোচনা করেছিলেন মোটামুটি তাদের একত্র সন্নিবেশ করেছি 'রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধ-সমীক্ষা' নাম দিয়ে। তাছাড়া গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ভাবতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্ব ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি সেগুলি হোল :

১। (ক) *The Religion of Man* (1940) ; (খ) *Sadhana* ;

২। *Contemporary Indian Philosophy* (George Allen and

Unwin Ltd., London প্রকাশিত) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'The Religion of an Artist'.

৩। Dr. S. Radhakrishnan: *Philosophy of Rabindranath Tagore ;*

৪। Prof. Benoy Gopal Ray: (a) *The Philosophy of Rabindranath* ;
(b) *Contemporary Indian Philosophers (1947)* ;

৫। Sybil Baumer: *An Introduction to Tagore's Mysticism*

৬। E. Thompson: *Rabindranath Tagore (Poet and Dramatist*) ;

৭। রবীন্দ্রনাথ: 'জীবনস্মৃতি',

৮। ঐ : 'শান্তিনিকেতন',

৯। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী: (ক) 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' ; (খ) 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭)

১০। অজিতকুমার চক্রবর্তী: 'কাব্য-পরিক্রমা' (২য় সংস্করণ, ১৩৪০) ;

১১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবি-রশ্মি' (১ম ও ২য় ভাগ) ;

১২। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়: 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১) ;

১৩। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী: 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ' (১ম ও ২য় খণ্ড);

১৪। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: (ক) রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা' ও (খ) 'বাঙলার বাউল' ;

১৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্রজীবনী', (১ম-৪র্থ খণ্ড) ;

১৬। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্র-দর্শন' (২য় সংস্করণ) ;

১৭। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (১ম-১৪শ খণ্ড) ;

১৮। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ: 'রবীন্দ্রসংগীত' ;

১৯। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; (ক) 'কথা ও সুর' ; (খ) 'সুর ও সংগতি' ; (গ) 'বক্তব্য' ;

২০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস: 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' (১ম ও ২য় ভাগ) ;

২১। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'রবীন্দ্রনাথের গান' (১৩৫৯) ;

২২। শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা: 'রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা' (২য় সংস্করণ) ;

২৩। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্র-সংগীতের ভূমিকা';

২৪। শ্রীদিলীপকুমার রায়: 'সাঙ্গীতিকী';

২৫। 'গীতবিতান বার্ষিকী' (১৩৫০);

২৬। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার: 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' (১৩৬৮);

২৭। ডক্টর শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়: 'দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার' (১৯৬০);

২৮। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম ও ৩য় ভাগ)।

এবং আরো বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রসংগীত'-সম্পর্কে প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, 'রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা'-আলোচনায় আমি বিশেষভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র সাহায্য গ্রহণ করেছি এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 'রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব' আলোচনায় নানাশাস্ত্রপারগ ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-লিখিত 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান'-গ্রন্থের যথেষ্টভাবে সহায়তা নিয়েছি, তজ্জন্য শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদারের নিকট কৃতজ্ঞ। এ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব' আলোচনাংশে 'পদাবলী-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' (১ম) রচনাটি শ্রীমতী মীরা মিত্রের লেখা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-পরিচালিত 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত। ঐ রচনাটি তাঁর অনুমতি অনুসারে সামান্য পরিশুদ্ধ ক'রে এ'গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। গ্রন্থের পরিশিষ্টে (২য় পরিশেষ্টে) প্রকাশিত 'রবীন্দ্রসংগীত-সমীক্ষা' প্রবন্ধ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার-কর্তৃক লিখিত এবং 'সুরধুনী'-পত্রিকায় (১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭২, পৃঃ ৪৯-৫৬) প্রকাশিত। তাঁর অনুমতি অনুসারে কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে এ' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। সুতরাং শ্রীমতী মীরা মিত্র ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আমার গুরুভ্রাতা ও সুহৃদ শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ. এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বহু অংশ সযত্নে সংশোধন ক'রে দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য ক'রে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গী ও রূপায়ন একটু নূতন ধরনের এবং আলোচনামূলক। রবীন্দ্রসংগীতের সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে এ' গ্রন্থ লেখা নয়, সর্বতোমুখী প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের সংগীত, সংগীত-প্রবন্ধ ও সংগীত-আলোচনা ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কী পরিমাণে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে মহিমময় হয়েছে তা দেখানোই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রূপায়ন প্রচলিত ক্ল্যাসিক্যাল ও দেশীয় সংগীতধারা থেকে কিছুটা পৃথক হোলেও অভিনব এবং ভারতীয় সংগীতের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। ভারতীয় সংগীতের আলোচনাক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু আলোচনার যে একটি স্থান ও উপযোগিতা আছে তা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থের সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপট অঙ্কন করার জন্য এবং কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীমান্ সুকান্ত রায়কে এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৫

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বাভাষ

প্রতিভা সহজাত ; প্রতিভার কষ্টকল্পিত সৃষ্টি হয় না। তবে প্রতিভা অব্যক্ত-রূপ থেকে ব্যক্তরূপে বিকাশ লাভ করে, অর্থাৎ প্রসুপ্ত বা অব্যক্ত প্রতিভার জাগরণ বা অভিব্যক্তি হয়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের বাঙলায় বহু প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কি সাহিত্য-জগতে, কি নাট্য-জগতে, কি শিল্প ও সঙ্গীত-জগতে এবং কি ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জগতে। তাঁদের পুণ্যস্পর্শে বাঙলাদেশ শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

নদীমাতৃকা বাঙলাদেশের পলিমাটি ও জলবায়ু যেমন একদিকে বাঙলা-দেশকে উর্বর ও শস্যশ্যামলা করেছে, তেমনি অন্যদিকে চিন্তাশীল প্রতিভাদীপ্ত মনীষীদের আবির্ভাবের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করেছে। বাঙলার সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, নাটক, ভাস্কর্য, সংগীত ও ধর্ম তাই এত সরস, সুন্দর, সাবলীল ও হৃদয়স্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি নামে শ্রদ্ধার মাল্যে বরণীয় হলেও বাঙলার মাটিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাঙলার শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম-সংস্কারকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর লোকোত্তর কবি-জীবনকে সর্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রপূর্ব বাঙলার সাধারণ সমাজ, রাষ্ট্রজীবন, সাহিত্যচর্চা, নাটক, কাব্য, দর্শন, সংগীত, শিল্প, ধর্ম ও এমনকি অধ্যাত্মভাবধারা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে যে প্রভাবিত করেছিল একথা স্বীকার্য। কিন্তু তিনি সকল-কিছুকে গ্রহণ করেও তাদের নূতন রূপে, রসে ও ভাবে সুষমায়িত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন অভিনব ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিকে গ্রহণ করে এবং তারি জন্য তাঁর সাহিত্য, কবিতা, নাটক, শিল্প ও সংগীত

প্রভৃতি আজ বাঙলার চতুঃসীমা অতিক্রম করে বিশ্ববাসীর অন্তর-সিংহাসনে তাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন সীমাহীন সমুদ্র এবং সম্মিলিত হয়েছিল তাতে বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত গুণরাশিরূপ অসংখ্য স্রোতস্বিনী এবং সেই গুণরাশির সমুজ্জ্বল প্রতিফলন বা নবরূপায়ণই তাঁর শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি অবদান। তাঁর মধ্যে ছিল নূতনতর চেতনা ও স্বাধীন চিন্তার উজ্জীবন; তারি জন্য তিনি সকল-কিছু পুরাতনের বুকে নূতনের করেছিলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির চলমানতাকেও করেছিলেন তিনি অধিকতরভাবে সতেজ। শুধু তাই বাঙলারই বা ভারতেরই নয়, বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রেও সঞ্চারিত হয়েছে নূতন এক শক্তি ও চেতনা। এমনকি মানুষের দৈনন্দিন প্রাণছন্দেও তিনি এনেছেন এক নূতন জাগৃতির আলোড়ন ও নূতন দৃষ্টির প্রসারণ।

এখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম দানরূপে রবীন্দ্রসংগীতের করবো কথঞ্চিৎ আলোচনা। একথা আমাদের অবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত বাঙলাদেশের পলিমাটি ও জলবায়ুতেই বিশেষভাবে পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট এবং বাঙলার সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সকল রকমের প্রেরণাই তাঁর জীবনচিন্তাকে করেছিল বিশেষভাবে প্রদীপ্ত। কিন্তু তাহলেও একথা আবার সত্য যে, সীমার মাঝেই তাঁর সংগীত অসীমের আহ্বানকে করেছে বরণ, অথবা বলা যায়, সীমার মাঝে পরিপুষ্টি লাভ করেই তাঁর সংগীত আজ সীমার সকল বন্ধনকে করেছে অতিক্রম সুর ও কথার সার্বজনীন আবেদনকে গ্রহণ করে।

॥ রবীন্দ্রসংগীতের উৎস-সন্ধানে ॥

রবীন্দ্রসংগীতের উৎস-সন্ধানে এখন কেন্দ্রায়িত হোক আমাদের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রসংগীতের মূলকথা বা মূলবস্তু হল তার কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর-রূপ এবং সে দ্বন্দ্ব অথচ দ্বন্দ্বাতীত রূপ রসানুভূতি ও ভাবোপলব্ধির সঙ্গে রাখে নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের সমন্বয়ী রূপের মধ্যে লুক্কায়িত যেন রবীন্দ্রনাথেরই ক্ষুব্ধ এক বেদনাতুর মন ও সতর্ক দৃষ্টি। প্রাচীনকালের গীতরচনা ও গীতরীতির কথা ছেড়ে দিলে মধ্যযুগীয়

ও বিশেষ করে মুসলমান যুগের ক্লাসিক্যাল বা অভিজাত উচ্চাঙ্গ-সংগীতে দেখা যায় যে, সুরেরই কেবল প্রাধান্য এবং কথা সেখানে সুরের দাসী বা অনুসঙ্গী। সুতরাং কথা ও সুর তথা দাসত্ব ও প্রভুত্ব এই দুটি বিপরীত ধর্মের একত্র মিলন সম্ভব হলেও সে মিলন দ্বন্দ্বাতীত মোটেই নয়।* সংগীতের ক্ষেত্রে এই অসচ্ছল ভাব ও সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে। তাঁর মতে, কথা ও সুর কেউ কারু দাসত্ব করবে কেন! বরং দুয়ের মধ্যে থাকবে সমতার এক সঙ্গতি ও তারই অনুপাতে থাকবে মিলনের আকুতি এবং তবেই সকল গানের মধ্যে পাওয়া যাবে প্রাণ ও আনন্দের প্রাচুর্য। কথা সাহিত্য-সম্পদ দিয়ে সুরে সৃষ্টি করবে যেমন ভাবের গাম্ভীর্য, সুরও তার কোমল আনন্দস্পর্শ দিয়ে গানের কথা বা সাহিত্যকে করবে তেমনি সরস ও প্রাণবান। গঙ্গা ও যমুনা—শিব ও শক্তির মিলন-মাধুর্যই করবে সত্যকারের সৃষ্টি গানে। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টিপথে সে রহস্যই হয়েছিল উদ্‌ঘাটিত। নইলে ঋষি বঙ্কিমোত্তর সংস্কারযুগে বাংলা সাহিত্যের এই রসঘন রূপ কখনই এতো লীলায়িত ও ছন্দায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতো না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বা সংগীতের মূলকথা হল কথা ও সুরের মধ্যে থাকবে ভারসাম্য মৈত্রীর বা মিলনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আর তারি জন্য রবীন্দ্রনাথ অপরূপভাবে অর্ধনারীশ্বর-রূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর গানে।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানের যোগ্য পরিবেশ পেয়েছিলেন কলকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একথা সকলেরই বিদিত। তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান উস্তাদদের বসতো উচ্চাঙ্গ-সংগীতের আসর, সুতরাং সে সব আসরে সংগীত শোনার সুযোগ হয়েছিল তাঁর যথেষ্ট। বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লী, আগ্রা, মোরাদাবাদ ও আরো অন্যান্য দেশ থেকে সংগীতশিল্পীরা আশ্রয় নিতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে দু'জন সংগীতশিল্পীর গানের মাধ্যমে পেয়েছিলেন প্রেরণা তাঁর সংগীতশিক্ষায় এবং তাঁদের একজনের নাম বিষ্ণু চক্রবর্তী ও অপরজন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিদগ্ধ সংগীত-শিক্ষক। বিষ্ণু চক্রবর্তী-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু 'রবীন্দ্র জীবনী'-গ্রন্থে (১ম খণ্ড) লিখেছেন: "আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৮১৯—১৯০১ ?) ছিলেন ইঁহাদের বাড়ীর গীতশিক্ষক; ধ্রুপদী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। 'ছেলেবেলা'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিষ্ণু চক্রবর্তীর পরিচয় দিয়েছেন। শোনা যায়, বিষ্ণু চক্রবর্তী উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গীতরীতি ছাড়াও বাঙালীর নিজস্ব গান বাংলাটপ্পা, টপ্‌খেয়াল, শ্যামাসংগীত ও অন্যান্য গান জানতেন ও গাইতেন। তাঁর গানের মধ্যে তানের বাহুল্য ছিল না, ছিল কণ্ঠসৌকর্য এবং প্রাণের ও ভাবের আবেদন। মনে হয়, বিষ্ণু চক্রবর্তীর গান-পরিবেশন ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা ও সহজ সুন্দর শৈলীই রবীন্দ্রনাথের মনকে করেছিল প্রভাবিত। তিনি বাল্যকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছেই সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের প্রশংসাও করেছেন কতবারই না জীবনের উত্তরভাগে।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং ধর্ম-সংগীতের অনুশীলনও করতেন অনেক সময় দু'জনে। শ্রীকণ্ঠ সিংহের সুকণ্ঠের প্রশংসাও করতেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। শ্রীকণ্ঠ সিংহের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: "আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। * * তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসুরী',—সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না"।

'জীবনস্মৃতির'-র এক স্থানে তিনি আবার অনুরূপভাবে বলেছেন: "গান-সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসুরী'। ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ' সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন এবং অশান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন ঠেলা দিয়া উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন"।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, শ্রীকণ্ঠবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তবন্ধু ছিলেন। 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়' এই ব্রহ্ম-সংগীতটি তিনি একটি হিন্দিগান থেকে ভেঙে রচনা করেছিলেন। "এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন, সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'। আবার পাল্টাইয়া লইয়া তাঁহাকে মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে'।" এই কথাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠ সিংহ-সম্বন্ধে কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যদু ভট্টের কাছে গান শিক্ষা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তবে বাঙলা শুধু নয়, তদানীন্তন কালে ভারতবিখ্যাত যদু ভট্টের গান বাল্যকালে বহুবারই তিনি শুনেছিলেন এবং সেই প্রসন্ন-গম্ভীর ধ্রুবপদ ও ভজন গান তাঁর হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদু ভট্টের গানকে অরিজিনাল বা স্বকীয়তা-সম্পন্ন বলে উচ্চপ্রশংসা করেছেন। তিনি যদু ভট্টের প্রসঙ্গে বলেছেন: "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল টোকাঠুকি করতো না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যদু ভট্ট। * * যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে, কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগ-রাগিণীর আলাপ। বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর গানে একটি originality ছিল—যাকে আমি বলি স্বকীয়তা"। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনে সুরের প্রভাব বিস্তার করেছিল অনেক হিন্দু-মুসলমান শিল্পীর গানই, কেননা তাঁর গান-রচনার প্রথম যুগে রচিত ধ্রুবপদরীতির গানগুলিই সেই স্বাক্ষ্য দান করে।

সংগীতসেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকেও গীত-রচনায় ও সুর-যোজনায় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সহায়তা অফুরন্তভাবে। তখনকার সমাজে প্রচলিত বাংলা-টপ্পা, টপখেয়াল, পদাবলীকীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গীতরীতিও জুগিয়েছিল তাঁকে যথেষ্ট প্রেরণার উপাদান। ১২৯৯ সালে 'ভারতীয় সংগীত-সমাজ'-এর হল প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং সেই সংগীত-

সমাজও রবীন্দ্রনাথকে জুগিয়েছিল সংগীত-অনুশীলনের প্রেরণা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সমাজের করেন প্রবর্তন পুণা-নগরীতে মহারাষ্ট্রদের 'গায়েন সমাজ' দর্শন করে। "সংগীত-সমাজ হইল বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের বৈঠকখানার মিশ্রণ। ফরাশ, তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে থাকিল পিয়ানো, টেবিল-অর্গান, বিলিয়ার্ড-টেবিল প্রভৃতি। জমিদার ও ধনীরা আসিলেন, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার, ডাক্তার আসিলেন। কণ্ঠসংগীতের ওস্তাদ কেহ কলিকাতায় আসিলে যেমন তাঁহাকে সমাজ-ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব উপভোগ করিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনি আনন্দ ও শিক্ষার জন্য সুসংস্কৃত প্রণালীতে অভিনয়ের ব্যবহার হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সংগীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক"।[১] সংগীত-সমাজের সৃষ্টি হলে রবীন্দ্রনাথ তার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

'সংগীত-সমাজ' সৃষ্টি হল যেন অভিজাত ও সাধারণ সংগীত-শিল্পীদের মিলনভূমিরূপে। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু 'রবীন্দ্রজীবনী'-তে (১ম খণ্ড) এর সুন্দর একটি রূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "এতকাল বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গের সংগীতের কদর ও আদর ছিল ধনীর বৈঠকখানায়; আর লৌকিক সংগীত আশ্রয় পাইয়াছিল বাউল-বৈষ্ণবের আখড়ায়। তাঁহারও নীচের স্তরে ছিল কবি, তরজা, খেউড়, লোটো, খেমটা ঝুমরোর গান। * * বাঙলাদেশে সংগীতকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্তিদান করলো ব্রাহ্মসমাজ। কারণ, মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত"।[২] তাছাড়া হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদ, খেয়াল প্রভৃতি গীতশ্রেণীর অনুশীলন হতো একমাত্র সৌখীন জমিদার ও ধনী লোকদের বৈঠকখানায়, 'সংগীত-সমাজ' সে রীতির মধ্যে আনলো এক পরিবর্তন। ফলে সংগীত-সমাজে ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানী-সংগীতের অনুশীলনের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনি ছিল বাংলার অন্যান্য সংগীত—কীর্তন, বাউল, বাংলা-টপ্পা; টপখেয়াল প্রভৃতির। ফলে সর্বসাধারণ পেলো সুযোগ-সুবিধা সকল শ্রেণী গান শোনার ও অনুশীলন করার। সংগীত-সমাজের সমাদর ও সুনামও হলো বর্ধিত। তাছাড়া থিয়েটার-অভিনয় প্রভৃতি অনুশীলনের অবাধ প্রচলন

১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১

২। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯

এবং প্রেরণাও জোগালো সংগীত-সমাজ। রবীন্দ্রনাথ সেই সংগীত-সমাজের প্রেরণা লাভ করেই বলতে গেলে সকল শ্রেণীর গান-রচনার পথে হলেন অগ্রসর এবং নাটক-রচনায়ও পেলেন উদ্দীপনা। গান, নৃত্য-সম্বলিত গান, নৃত্য প্রভৃতির নূতন নূতন সৃষ্টিচিন্তার পেলেন সূত্র। তাছাড়া পরবর্তীকালে দেশে-বিদেশে ভ্রমণকালেও তিনি গান শুনেছিলেন ও নৃত্য দেখেছিলেন বিচিত্র রকমের। সেই সকল শোনার ও দেখার অভিজ্ঞতা-সংস্কার তাঁর ভবিষ্যৎ গান-রচনার ক্ষেত্রকে করেছিল সমৃদ্ধ। সংকীর্ণতামুক্ত ছিল তাঁর মন সকল সময়ই, তাই সকল দেশ ও সকল জাতির কাছ থেকে ভাল ও সুন্দর সকল-কিছুকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁর নূতন গীতিভাণ্ডারকে পূর্ণ করার জন্য। তারি জন্য তাঁর গানের সুরে, নৃত্যের ভঙ্গিতে ও তালের ছন্দে একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের এবং অপরদিকে বৃহত্তর-ভারতের ও পাশ্চাত্ত্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন সুর, ভঙ্গি ও ছন্দের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল অপরূপভাবে। তাঁর গীতি ও নৃত্যছন্দের মধ্যে তাই লক্ষ্য করি আমরা দুটি পরিবেশের বিকাশ: একটি—প্রাকৃতিক ও পূর্বনির্দিষ্ট, এবং অপরটি—নিজ-সৃষ্ট ও নিজ-নির্বাচিত। এই দুই পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রথমটির প্রভাব বা সাহায্য পেয়েছিলেন শিশুকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। তারপর এলো গান-রচনার প্রেরণা ও জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরের সাথে সাথে চললো গানের মহড়া ও গানের রচনা। রচনা করলেন তিনি কাব্যসৌন্দর্য দিয়ে কত শত হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদ, ধামার প্রভৃতি শৈলীর গান। সৃষ্টির উন্মাদনা ও সৌন্দর্যের আস্বাদন তখন স্বতঃউচ্ছ্বলিত। দিগন্তবিস্তারী অফুরন্ত আশা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে তিনি সৃষ্টি করে চললেন কখনো পুরাতনের বুকে নূতনের এবং কখনো বা সম্পূর্ণ পুরাতননির্মুক্ত নূতন নূতন গান।

॥ রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশ, রূপরেখা ও ক্রমবিবর্তন ॥

নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এলো তাদের বিচিত্র বিকাশের পালা। এক একটি গান রচনা ও তাতে সুর যোজনা করে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে গানের শতদল ও সহস্রদল কমল রচনা করলেন। তাদের সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো সারা বাঙলাদেশের ও ভারতের চতুর্দিকে—যেসব দিকে বাঙালীরা বাসা বেঁধেছিলেন ছোটখাট সমাজ গঠন করে। ক্রমে নির্বাচিত গণ্ডী পার

হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সকল সমাজে সকল জাতির মানুষের কাছে তাঁর গান এবং প্রসার লাভ করলো পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে।

প্রতিটি গীতশ্রেণীর মধ্যে থাকে যেমন একটি নিজস্বতার রূপ, গতি ও শৈলী, রবীন্দ্রনাথের গীতশ্রেণীর বেলায়ও তাই। হিন্দুস্তানী গীতশ্রেণীর মূলানুগ ও ছায়ানুগ গানগুলি ছাড়া তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন নিজস্ব ভঙ্গিতে বিচিত্র বিষয়, পরিবেশ, বর্ণনা ও ভাবকে নিয়ে। তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য-সম্পর্কিত গানের সংখ্যাও কম নয়। চার থেকে আঠারো মাত্রার ছন্দ ও তাল এবং শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের নিয়ে তার গান হলো মুখর ও লীলায়িত। আঙ্গিক, বর্ণ ও অলংকার, গমক, ছোটখাট সীমায়িত ও সংযত তান ও মীড় প্রভৃতিকে নিয়ে তাঁর গান রূপায়িত। অলংকারপ্রয়োগে সংযম-সংরক্ষণই তাঁর গানের আসল বৈশিষ্ট্য।

ছোট ছোট হালকা তানের ব্যবহার যে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানে করেন নি, তা নয়। তবে হিন্দুস্তানী সংগীতের যে সুদীর্ঘ স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারী তানের বিস্তার, তা তিনি পছন্দ করতেন না। হিন্দিভাঙা :বাংলাগানে সামান্য সামান্য সুর-বিস্তারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া ঢিমালয়ের হিন্দিভাঙা গানেই ছোট ছোট তানের প্রয়োগ তিনি করতেন। কিন্তু জটিল ছন্দের কোন তান বা বাঁট-প্রয়োগের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। আসল কথাও তাই যে, হিন্দুস্তানী গানের শিল্পীরা সচরাচর পুনরুক্তি-বাহুল্যের তিক্ততা নিয়ে গানের কথায় ও সুরের আকারকে যেমন প্রসারিত ও ভারাক্রান্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে রীতির অনুসারী ছিলেন না, বরং সীমার মাঝে অসীমের বিকাশকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে বলতেন গানে।

মোটকথা সংগীত-বিকাশেও একটি নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার নীতি আছে এবং সেই নীতিকে অবহেলা করায় সার্থকতা নেই। সীমিত ও সংযত রূপরেখার মাঝেই পূর্ণরূপের বিকাশ করা উচিত। ভারতবর্ষের সূত্রযুগের নিদর্শনই এখানে দেওয়া যেতে পারে। স্বল্পাকারে বা স্বল্পকথায় বিস্তৃত ও বিরাট বিষয়ের অবতারণা ওই সূত্রযুগেই সম্ভব হয়েছিল। তবে স্বল্পপরিসর সূত্রযুগের হুবহু নিদর্শনকে আমি সংগীত-বিকাশের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে বলছি না, আমার বক্তব্য কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য যে, সরল স্বচ্ছন্দ

গানের কথায়, সুরে ও ছন্দে বিরাটের মহিমা ও ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করাতেই সৃষ্টির থাকে বিপুলতা ও নৈপুণ্য।

গানে অন্তরে আবেদনের সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য, কেননা ঐ আবেদনই আনে জাগরণ—যে জাগরণ মানুষের দিব্যচেতনার মধ্যে সৃষ্টি করে স্পন্দন ও করে অমৃতের পথযাত্রী। গানের সুরে জীবনের অবগুণ্ঠন দূর করাই তো সংগীতের আদর্শ। নইলে অকারণ কথা ও সুরের বাহুল্য-সৃষ্টির মধ্যে সত্যকারের পাওয়া যায় না আনন্দ।

রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেও আছে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা,—যদিও সে ধারা নিছক মনোবৈজ্ঞানিকী তথা মনোবিলাসেরই লীলা ও বিস্তৃতি। সাধারণভাবে সাহিত্য-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সংগীতে পাই তিনটি চারিটি স্তরের বিকাশ (যদিও স্তর-বিভাগের সংখ্যা আরও কিছু বেশি বলে কল্পনা করা হয়েছে)। (১) প্রথম স্তরে রবীন্দ্রনাথ ভাল ভাল খানদানী ঘরোয়ানা চীজের আশ্রয় নিয়ে গান রচনা করেন। (২) দ্বিতীয় যুগে খানদানী কাঠামোর ভিতরেই একটু সুরের ও তালের নূতনত্ব। কাঠামোটি যদিও পুরাতন, কিন্তু কিসের একটা প্রয়োজন, কিসের একটা তাগিদ রবীন্দ্রনাথ পূরণ করতে পারছেন না, তাই কাঠামোর ওপর রঙটি বদলাতে হচ্ছে, তার ওপর অলংকারগুলিকে একটু নূতন রকমে সাজাতে হচ্ছে। (৩) তৃতীয় স্তরে, এলো ভাটিয়ালী, বাউল গান প্রভৃতি। এ'যুগে দরবারি সুরের সঙ্গে দেশীর হয়েছিল মিশ্রণ। এবং এ'মিশ্রণ কিন্তু মোটেই নূতন নয়। কেননা, খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে সংস্কারযুগের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, কোহল, দুর্গাশক্তি, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রীরা অনেকানেক আঞ্চলিক ও জাতীয় সুরগুলিকে দশলক্ষণে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে ক্লাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। এঁরা ছিলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতোত্তর শাস্ত্রী। (৪) চতুর্থ যুগটির কীর্তি অসীম, কেননা এ' যুগীয় গানগুলির মধ্যে পাই সুসংযত নিয়ম-কানুন ও উদারতার ভাব। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বললে বলা যায়, 'শেষের গানগুলি সম্পূর্ণ ইসথেটিক'। আমরা আরো একটি অধিক স্তরের করেছি কল্পনা এবং গ্রন্থমধ্যে দিয়েছি তার পরিচয়। 'রবীন্দ্রস্মৃতি'-গ্রন্থের লেখিকা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী তাঁর সংগীত-স্মৃতির পর্যায়ে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেছেন: "অনেকে

তাঁর প্রথম বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তাঁর ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী বোলে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন: আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকার গুলি ইসথেটিক'।"

যাই হোক গান-রচনার ক্রমস্তর বা ক্রমবিকাশ গানের ক্রমবিবর্তনের মর্মকথাই প্রকাশ করে। যদিও এসব স্তর-বিভাগ কাল্পনিক, তবুও গানের বিকাশবৈচিত্র্যের দিক থেকে এ' বিভাগের মূল্য যথেষ্ট। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও বোধির যেমন ক্রমস্ফূরণ হয়, তেমনি তার রচনা ও অনুভূতিশক্তিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করতে হয়। কাজেই গানের জন্য গান এবং নাটক ও নৃত্যের জন্য গান রবীন্দ্রনাথ যতই রচনা করেছেন, তাদের প্রকৃতি ও শ্রেণীর মধ্যে ততই তর-তমতার একটা ভাব লক্ষ্য করা যায়, এবং সেই ভাব ও রচনার তর-তমতাকেই আমরা ধরে নেব রচনার স্তররূপে। মোটকথা গানের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার চাক্ষুষ পরিচয় এবং সেই পরিচয়ই কবির অখণ্ড আত্মপরিচয়। এই অখণ্ড আত্মসত্তায় অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি সংগীতের মতো সাহিত্য, কাব্য, নাটক, চিত্র, গল্প ও সকল-কিছু রচনা করেছিলেন এবং সবার মধ্যেই তাই তাঁর অখণ্ড আত্মসত্তার বিকাশ লক্ষ্য করি।

॥ রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য ॥

রবীন্দ্রসংগীতের প্রাথমিক সূচনা অনুসরণ ও অনুকরণ-নীতির অনুসারী হলেও তাদের মধ্যে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও আত্মবোধের ভাব। পরবর্তীকালে রচিত গান ও সুরের বৈশিষ্ট্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। ব্যাপ্তি তার রসে, ভাবে ও তাদের পূর্ণ-অনুভূতিতে। ব্যাপ্তি তার শুধুই মনে নয়, বুদ্ধিতে ও বোধিতে। ব্যাপ্তি তার একটিমাত্র মানুষে নয়, সকল মানুষে, সর্বজাতিতে ও সর্বদেশে। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মতা, কবিধর্মতা ও আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণীসঙ্গমে সকল রকম গান, সুর, নাটক ও নৃত্য যেন রস ও ভাবের প্রাণচঞ্চল অভিব্যক্তি। মানুষের আত্মদমন ও আত্মবোধ-জাগরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের সংগীত যে একটি রসায়িত সামগ্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গীতরীতির মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও একটি নিজস্ব ধারা বা শৈলী আছে,—ইংরাজীতে যাকে বলে ষ্টাইল। এ' সম্বন্ধে 'কবির সংস্পর্শে'-নিবন্ধে

শ্রীসাহানা দেবীর বক্তব্য সূত্রাকারে স্পষ্ট। তিনি বলেছেন: "যার গান তোলা হয় সেই সংগীতস্রষ্টার নিজস্ব ধারা রীতিনীতি ভাবভঙ্গি সবের সঙ্গেই তার থাকা দরকার পূর্ণ-পরিচয়"। এরই নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গান-স্রষ্টার আত্মভাব ও প্রকৃতিকে আত্মস্থ বা নিজস্ব করা। যেকোন রচনার ও সেই রচনায় নিবদ্ধ ভাবের সঙ্গে মনের একাত্মতা না এসে ঠিক ঠিক শৈলীর সৃষ্টি হয় না। গ্রন্থপাঠ তখনি সার্থক হয়. যখন গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে নিবদ্ধ গ্রন্থকারের নিজস্ব ভাব ও ধারণার সঙ্গে পাঠকের চিত্তের ঘটে একাত্মতা। সংগীতে শৈলীকে পরোক্ষভাবে বলা যায় ঘরোয়াণা-রক্ষিত ধারা। তবে 'ঘরোয়াণা'-শব্দের মধ্যে ঠিক ঠিক শৈলী বা ইংরাজী 'ষ্টাইল'-শব্দের পূর্ণসঙ্গতি বা পূর্ণব্যপ্তি আবার পাওয়া যায় না, কেননা শৈলী বা ষ্টাইল ঘরোরানা অথবা ঘরোয়াণা-রক্ষিত ধারা ছাড়াও আরো-কিছু বেশী জিনিস এবং সে জিনিস হলো ভাবের সঙ্গে চিত্ত বা মনের ও মনের সঙ্গে আত্মার একীকরণ তথা সমীকরণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গানের গতি, প্রকৃতি ও রসকে অনুসরণ করে যখন রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিফলন করা হয় তখনই তাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রগীতিশৈলী। গানের প্রকাশভঙ্গি হওয়া উচিত গীতিরচনা ও তার ভাবের মেজাজ (টেম্পারামেণ্ট) অনুযায়ী, আর সুরও হবে তার অনুসারী, তবেই গানের রস ও ভাবের অভিব্যক্তি হয় প্রাণময়। তখনি ঠিক ঠিক গীতরীতির নিজস্ব ভঙ্গি ও ধারা, শৈলী বা ষ্টাইল করবে আত্ম-প্রকাশ। রবীন্দ্রসংগীতের সাধক ও শ্রোতাদের তাই হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গায়নভঙ্গির প্রকাশক, এবং তবেই ঠিক ঠিক ভাবে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রসংগীতের মর্মকথার পরিচয়।

অথচ রবীন্দ্রসংগীতের গীতরীতির বৈপরীত্যও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়। শ্রীসাহানা দেবীর মন্তব্যের কথাই বলি এই প্রসঙ্গে পুনরায়। 'কবির সংস্পর্শে'-প্রবন্ধপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "এখন যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত করেন তাঁরা সকলেই বেশ সুকণ্ঠ ও সুকণ্ঠি। তাঁদের গলা আমাদের দিনের চেয়ে অনেক বেশি তৈরী, আর ক্ষমতাও যথেষ্ট। তবু তাঁদের অনেকের মুখে সব সময় রবীন্দ্রসংগীত তেমন ফোটে না, আসল রূপটি পাওয়া যায় না। যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা হয়তো সাধারণতঃ স্বরলিপি দেখে, বা কারও

কাছে শুনে শেখেন, অথবা এমন কারও কাছে শেখেন, রবীন্দ্রসংগীতের আসল পরিচয় যাঁর ঠিক জানা নেই। অথচ সুর হয়তো ঠিকই আছে। সেজন্যে ঠিক সুর গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসংগীত হয়, তা নয়। এও দেখা গেছে কারও কণ্ঠে মূলসুর থেকে সুরের হয়তো এক-আধটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে, কিন্তু তবু তা রবীন্দ্রসংগীত ঠিকই হয়েছে"।

"সুরের যে এত তারতম্য আজকাল ঘটেছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধকরি ছিলেন কতকটা দায়ী। কেননা তিনি অনেক সময়, সুর ভুলেই হোক বা সুর বদলাবার জন্যেই হোক, দেখা গেছে একই গান সব সময়েই ঠিক একই সুরে সকলকে শেখান নি। অনেক সময় তার তারতম্য ঘটেছে, যদিও তা খুবই সামান্য হ'ত। এত গান তিনি রচনা করেছেন যে, সব হুবহু মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই জন্যে তাঁর গানের কোন্ সুরটা ঠিক এ' নিয়ে তর্ক চিরকালই থেকে যাবে"।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রকাশভঙ্গিতে যে আজকাল ব্যতিক্রম ঘটেছে বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন কণ্ঠে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। একই গানের স্বরলিপির মধ্যেও কখনো কখনো আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বররূপের লিখন ও প্রকাশ দেখেছি। এ' ব্যতিক্রমের কারণ কি যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গানশেখার সৌভাগ্য পেয়েছেন তাঁরা হয়তো কিছুটা বলতে পারেন। কারণ একই রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ যদি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে এবং ভিন্ন ভিন্ন সংগীতশিক্ষাতীর্থে বিচিত্রভাবে দেখা দেয়, তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়-সৃষ্টিরও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ভবিষ্যতে,—যেমনটি হয়েছে হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল-সংগীতের ভাগ্যে। রবীন্দ্রসংগীতে গায়নভঙ্গির ব্যাপারে বিশ্ব-ভারতীর কর্তৃপক্ষরা নিয়ম-নীতির বাঁধন-কষণও দিয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু সে নিয়মগণ্ডীকে অতিক্রম করেও রবীন্দ্রগীতরীতির মধ্যে দেখা দিয়েছে মিলনের অভাব। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষজ্ঞ যাঁরা—তাঁদের মিলিত চেষ্টায় সমাধান হতে পারে এই ব্যতিক্রম হওয়ার প্রচেষ্টার।

কালজয়ী রবীন্দ্রনাথের অবদান। অমরকীর্তি তাঁর সাহিত্য, নাটক, নৃত্য ও সংগীত-সৃষ্টি। বাঙলাদেশের পরমসৌভাগ্য যে, সেই দুর্লভ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারই পবিত্র শ্যামল বক্ষে। যে রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল

বাঙলার প্রাণস্পন্দনকে কেন্দ্র করে, তার বিস্তৃতি আজ বিশ্বের সর্বত্র সর্ব মানুষের কাছে। তাই সকল সাম্প্রদায়িক ভাবের ঊর্ধ্বে আসীন থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব এই সম্পদ আজ বিশ্বের দরবারে পেয়েছে যে শ্রদ্ধার সমাদর, সে গৌরবের অধিকারী আজ বাঙলাদেশও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীত-পরিচিতির সূত্রপাত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাবসুন্দর কবি এবং তার ধর্ম ছিল 'কবির ধর্ম'। 'কন্‌টেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি'-গ্রন্থে তিনি বলেছেন: "My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has follwed the same mystrious line of growth as has my poetical life"।[১] সংগীতকেও তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন অনন্ত অমৃতের দিকদর্শনরূপে। আন্তর নিবিড় সংযম ও সাধনায় সংগীতের অনন্ত ও অমৃত রূপের হয় আবিষ্কার। তিনি বলেছেন: "For music, though it comprehends a limited number of notes, yet represents the infinite. It is for man to produce the music of the spirit with all the notes which he has in his psychology, **. In music, man is revealed, and not in a noise"।[২]

একথা অতীব সত্য যে, ভারতবর্ষের সংগীত অধ্যাত্ম-সাধনারই উপায়-স্বরূপ। অতীতের ইতিহাস এর স্বাক্ষ্য দান করে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ থাকলেও অধ্যাত্ম-সাধনার মর্মকথাই তা প্রকাশ করে, কেননা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সত্য-শিব-সুন্দরেরই ধ্যান ও উপাসনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তারি জন্য পৃথিবীর মলিন ধূলিকণার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েও উর্ধে শাশ্বত আনন্দলোকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তাঁর সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, কবির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্থলে তাই পেয়েছিলেন অনির্বচনীয় এক সত্য বা সত্তার অনুভূতি এবং সেই সত্তানুভূতির দীপ্তি ও দৃষ্টি নিয়েই রচনা করেছিলেন তাঁর সংগীত কথায় ও সুরে। 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান'-

1. Cf *Contemporary Indian Philosophy* (1936), p. 32.
2. Cf. *The Religion of Man* (1949), pp. 127-128.

গ্রন্থের 'দি আর্টিষ্ট'-নিবন্ধে সংগীত-সম্পর্কে তাই স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন: "In music, the feelings, distilled in sounds, becomes itself an independent object. It assumes a tune-form which is definite, but a meaning which is undefinable, and yet which grips our mind with a sense of absolute truth"।[3] সেজন্য তাঁর গানের কাব্য, সুর ও অধ্যাত্ম-ভাবধারার ত্রিবেনীসঙ্গম মানুষকে করে সচল ও প্রাণময়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন স্বভাব-কবি, তেমনি ছিলেন স্বভাব-স্বচ্ছল গান-রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা। তিনি বলেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে অহরহঃ যে অনির্বচনীয় অনাহত ধ্বনি ও অপার্থিব সুর, তারই সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনে এবং তারই অবগুণ্ঠন মোচন করে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি বিশ্বসংগীতের অনন্ত ধারা ও মহিমা। নিজের অন্তরেও উৎসারিত হয়েছিল তাই তার উচ্ছল প্রবাহ। তিনি বলেছেন: "সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে, গান শুনে সেটারই বেদনাবেগ যেন আমার চিত্তে অনুভব করি"। গান রচনাকালে এই অনুভূতিই তাঁর রচনা-প্রতিভায় আনতো সচঞ্চল প্রেরণা এবং সেই প্রেরণার অভিঘাতে কি কাব্যে, কি সুরে, কি তালে ও ছন্দে তিনি প্রদীপ্ত করেছেন তাঁর সংগীতে এক অনন্যসাধারণ আবেদন,—যা সহজ ও সরল অথচ মনের অন্তস্থলস্পর্শী, গভীর ও সুন্দর।

রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার কোনই সার্থকতা নেই, কেননা এতই তার পরিধি বিরাট ও বিস্তৃত, এতই তার ভাব ও মাধুর্যের গভীরতা যে, সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। ভারতের ও তার বাইরের এবং বিশেষ করে বাঙলার বিচিত্র সংগীতধারার মিলন হয়েছে তাঁর গানে, অথচ সকল প্রভাবকে অতিক্রম করে আসীন তাঁর গান আপন বৈশিষ্ট্যের স্বর্ণসিংহাসনে। পুরাতনকে দিয়েছেন তিনি সম্মান, কিন্তু তাই বলে পুরাতনকে তিনি করেন নি অন্ধ-অনুসরণ, বরং পুরাতনের সঙ্গে নূতনের পাতিয়েছেন মিতালী এবং নূতন সৃষ্টির পথ হয়েছে তাতে উৎসারিত। উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানী-সংগীত থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন বাঙলার বৈঠকীসংগীত টপখেয়াল, টপ্পা, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, কীর্তন, সহজিয়া দেহতত্ত্ব,

3. Ibid., p. 141.

ভক্তিরসবাহী রামপ্রসাদী এ' ধরণের বিচিত্র গান ও গীতরীতি যুগিয়েছিল তাঁর গান-রচনায় প্রেরণা এবং প্রতিটির প্রেরণায় প্রভাবিত হলেও তাঁর রচিত বাউল, কীর্তন, ধ্রুপদ ও খেয়ালাঙ্গের গানে একটা স্বতন্ত্র রূপ ও তাদের পরিবেশনরীতিতেও একটি নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। পুনরাবৃত্তির পথকে চিরদিনই তিনি করেছিলেন বর্জন ; বাদশাহী আমলের টাকা এ' যুগে চলে না বা চালানোর চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয় এটাই ছিল তাঁর অভিমত। তার কারণ আর কিছু নয়, নূতন স্থষ্টির পথে নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার পায় প্রকাশ এবং সেই প্রকাশ বা দীপ্তির পথকেই তিনি অব্যাহত বাখার পক্ষপাতী ছিলেন চিরদিন। কাব্য, গান, সাহিত্য, শিল্প হয়তো অনেকেই রচনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে যদি না থাকে নূতনত্বের কোন লক্ষণ, তবে সংস্কৃতিসেবী সমাজের মধ্যে তার কোন মূল্যই থাকে না। তাছাড়া কালজয়ীও হয় না সেই সব অবদান। তাই প্রতিভার সহযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন সকল রকম স্থষ্টির পিছনে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নূতন স্থষ্টিপথের পথিক, কিন্তু তাই বলে—পূর্বেই বলেছি যে, পুরাতন যা-কিছু ভাল—যা-কিছু সুন্দর ও কল্যাণময় তাদের তিনি অবজ্ঞা বা বর্জন করার ছিলেন না পক্ষপাতী। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, অতীতের যা-কিছু সুন্দর, শিক্ষাপ্রদ ও সমাজ-কল্যাণকর, তাদেরও গ্রহণ করতে হবে নূতনের সঙ্গে এবং তবেই বৈশিষ্ট্যলাভের অধিকারী হয় সেই নূতন অবদান। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদীপ্ত অভিমতও ছিল অনেকটা তাই এবং তারি জন্য সমাজের অন্তরে নিবিড়ভাবে আসন পেতে বসেছে তাঁর কাব্য-রচনা, শিল্প ও সংগীত। অনর্থস্থষ্টির বাহুল্য হয়েছে তাঁর রচনায় ম্লান, তাই ভাব ও আনন্দানুভূতির চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছে বিশ্বসমাজ। নূতন স্থষ্টির পথকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন চিরদিনই। তাই ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে সমাদর দিয়ে তিনি বলেছেন, শৃঙ্খলিত পথনির্দেশ কোনদিনই সুখপ্রদ হতে পারে না, নূতন স্থষ্টির পথে স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র-চেতনার আবশ্যকতা সর্বদাই আছে। 'সুর ও সংগতি'-সম্পর্কে তিনি ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় হিন্দুস্তানী-সংগীতক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাঁধন-কষণসম্বন্ধে বলেছেন : "হিন্দুস্তানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্টেটারদের আমি মানিনে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব

যুগের নব নব স্বষ্টির স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই; ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃপুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমনীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যারা স্পর্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন, তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্য আমার মত বিদ্রোহীদের জন্ম,—সেই প্রতিবাদ. ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন"। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিদ্রোহী এবং এই 'বিদ্রোহী' অর্থে অচলায়তন বা চিরস্থিতধারার ছিলেন তিনি পরিপন্থী। এ'বিদ্রোহের সংগ্রাম বাঙলার পদাবলীকীর্তনের ধারক ও বাহকেরাও যে করেছিলেন তাঁদের গান, তাল ও আখরের বেলায়, বাঙলার ইতিহাসে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪]

রবীন্দ্রসংগীতে সুর বড়—কি কথা বড় এই আলোচনা নিরর্থক, কেননা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সুর কথার পরিধিকে অতিক্রম করেই চলে এবং করাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সংগীতের ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় সুরের খেলাই একমাত্র প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না, তাকে বচনীয়, ব্যক্ত বা প্রকাশ করার জন্য কথার সহযোগিতা অবশ্যই থাকা চাই। কথা ও সুরের বেণীবন্ধনে সংগীতের মূর্তি হয় লীলায়িত; কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বরমূর্তিই সংগীতের সামগ্রীক রূপ ও মাধুর্যকে গড়ে তোলে। সংগীতের নৈবেদ্যে সুরের চাহিদা বেশী হলেও কথার মূল্যকে তাই বলে কম করলে চলবে না। পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়ে যেমন বিশ্বসংসারের খেলা, তেমনি কথা ও সুরকে নিয়েই সংগীতের সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের গান বা সংগীতকে যাঁরা দেখেন কেবল কাব্যধর্মীরূপে, তাঁদের দেখা হয় আংশিক, কেননা রবীন্দ্র-নাথের গান কাব্যধর্মীর মতো সুরধর্মীও। তারপর একথাও সত্য যে, সাহিত্য ও সুরের মধ্যে আছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো ভাবসৌন্দর্যের এক গাম্ভীর্য ও রসানুভূতির প্রদীপ্ত পরিচয়। রাগসংগীতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর তাঁর গান প্রতিষ্ঠিত, তারি জন্য বাঙলাদেশের নিজস্ব স্বষ্টির গতিকে তিনি রেখেছেন অব্যাহত তাঁর গানে, রাগসংগীতের ধারা তাঁর রচনায় কোনদিনই তাই ম্লান হয় নি।

'জীবনস্মৃতি'-তে গানের প্রবন্ধে কথা ও সুরের প্রসঙ্গটি তাঁর মৌলিক ও অনিন্দ্যসুন্দর। তাতে কথাকে তিনি বলেছেন সুরের অধীন অথচ

৪। 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান' (১৯৪৯), পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।

অধীনতার মধ্যে বন্ধনহীন মুক্তির স্বাধীনতাও পেয়েছে সুরানুগামী কথা। তাই একে অন্যের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেনি কোথাও, বরং দু'য়ের মিলন-মৈত্রীভাবই অব্যাহত থেকেছে তাঁর গানে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "গানে যখন কথা থাকে, তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো—বাক্যের দাসত্ব কেন সে করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয়, সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না, গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে, ততই ভালো। * * * কিন্তু বাঙলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশী যে, এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়"। রবীন্দ্রনাথ তাই কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নূতন গানের গোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি: "কথা সুরকে অবজ্ঞা করে কোণঠাসা করেনি, সুরও কথাকে ছাড়িয়ে পার্থক্যের অসংগতি প্রকাশ করেনি। রসবেত্তা সুরজ্ঞের যথানির্দিষ্ট ওজনবোধ বজায় রেখে তাঁর সংগীতে নূতন সৃষ্টিই তিনি করেছেন,—কিন্তু সেই সৃষ্টি রাগ-রাগিণীর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি কখনো। এবষ্ট্রাক্ট সুর মানবীয় রসে নিটোল হয়ে উঠেছে"।

সংগীতে সুরকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ আসন, এবং কথাকেও কাব্যসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে সুরের চরণে পরিয়েছেন অলংকাররূপে। তিনি বলেছেন: "হিন্দুস্তানী গানের কথা সাধারণত: এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ"। তারি জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগ-রাগিণীর আবির্ভাবকে দিয়েছেন

সমাদর, আর সঙ্গে সঙ্গে কথাকেও করেছেন কাব্যসুষমায় মণ্ডিত। হিন্দুস্তানী সংগীতের অধিকাংশ কাব্যসৌন্দর্যহীন কথা তাঁর প্রাণে এনেছিলো বেদনা, তাই কথাকে করেছিলেন তিনি সুরের সহযাত্রী, অথচ মুখর ও সচল। কবি জয়দেবের মতো রাগের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিনিও কথার মালা রচনা করেছেন সুর ও কথা এই উভয়ের মধ্যে ছন্দের লালিত্য ও মাধুর্যকে বজায় রেখে। তাই তাঁর গানে কথা-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সুর-সমৃদ্ধিরও পাই পূর্ণ-সমন্বয়।

রবীন্দ্রনাথের গানে রাগ মিশ্রণের সুযোগ পেয়েছে পরবর্তীকালে। দরবারী-সংগীতে কৃতবিদ্য বা পারদর্শী একেবারে না হলেও তিনি যে সংগীতের একজন রসজ্ঞ সাধক এবং যথার্থ বোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরী ক্ল্যাসিক্যালপদ্ধতিই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা সকলেই জানেন। ছেলেবেলা থেকে হিন্দুস্তানী সুরে তাঁর কান ও প্রাণ হয়েছিল পরিপূর্ণ। তিনি নিজেই তার চাক্ষুষ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : "ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। * * কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস-সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল। * * ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্তানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্তানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে"।

এখানে তাঁর সংগীত-শিক্ষা ও গান-রচনা-সম্পর্কে তিনি নিজে যা বলেছেন তার স্বাক্ষ্য আছে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার মধ্যে। তিনি বলেছেন : "আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে-সুর ভেসে ওঠে তা-ই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়। ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে সংগীত-শিক্ষার দহরম-মহরম করা—যে আমাকে দিয়ে কোনোকালেই হল না। ভালোই হয়েছে যে, ওস্তাদের কাছে হাতেখড়ি হয় নি। আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ-সংগীতের খুব চর্চা হত সেকথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ' বাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়ি

নি। আড়ালে আড়ালে থেকে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ওপাশে বসে থাকার কালে যেসব সুর ভেসে আসত কানে সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত প্রতিনিয়ত। তা থেকেই পেয়েছি আমার গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে, ভিতরে ভূপালী-সুরের আলাপ চলেছে—আমি বাইরে থেকে শুনেছি। আর কী আশ্চর্য দেখ, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি, তার প্রায় সবটিতেই অদ্ভুত ভাবে এসে গেছে ভূপালী-সুর। কাজেই বুঝেছ, সংগীত-শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত,—ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়। ছেলেবেলায় আমার গলা খুব ভাল ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদু ভট্ট,—অত বড়ো গাইয়ে বাঙলায় আজ-পর্যন্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ,—আমাদের বাড়ীর সভা-গায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরেকেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে ধাতের ছেলেই আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার জো ছিল না"।

কলাবতীগান ও রাগসংগীত রবীন্দ্রনাথের প্রাণকে আকৃষ্ট করেছিলো বলে তাঁর জীবনের গোড়ার দিকে গানগুলির অধিকাংশই ছিল দরবারী ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ। তদানীন্তনকালে বাঙলার প্রখ্যাতনামা যদু ভট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাধিকামোহন গোস্বামী প্রভৃতি গুণী-শিল্পীদের ধ্রুবপদগানও তাঁর বাঙলা গান-রচনার প্রেরণাতে যথেষ্টভাবে খোরাক যুগিয়েছিলো। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন : "বাঙলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারি অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্তানী গান জানিনে, বুঝিনে। আমার আদি-যুগের রচিত গানে হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগ-রাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূরভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাগ্‌বিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে ; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্তানী সংগীত জানে না"।

কথাটা পুরোপুরি সত্য, কেননা তাঁর বেশীর ভাগ আদিযুগের গানগুলিতে যেমন ছিল বিভিন্ন প্রসিদ্ধ রাগের সমাবেশ, তেমনি ছিল বিচিত্র খানদানী

তালের সমারোহ। "বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে" (আড়ানা—চৌতাল), "শোন তার সুধা-বাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে" (ইমনকল্যাণ—চৌতাল), "জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে তুমি গম্ভীর" (বিভাস—চৌতাল), "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী" (বাগেশ্রী—তেওরা) প্রভৃতি ধ্রুবপদগানগুলি তাঁর দরবারী সংগীতে একান্ত অনুরাগ ও পারদর্শিতার কথাই প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই সকল ধ্রুবপদগান রবীন্দ্রসংগীতের বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করেন না। ভারতীয় সংগীতে জ্ঞান ও অধিকার এবং কণ্ঠমাধুর্য অর্জন করার জন্যও রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গপ্রকৃতির গানগুলি সকলের গান করা উচিত। ধ্রুবপদ-গীতরীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর। তিনি নিজেও স্বীকার করে বলেছেন: "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদগান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রচনা করে। এই ধ্রুপদগানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করে। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তৃত হোক, আরো বহু কক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবিচিত্র ঘটুক। তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে"। তাঁর ধ্রুবপদসম্বন্ধে অভিমত আরো বিশেষভাবে আলোচনা করবো আমরা পরে। তবে তিনি যে সংগীত-শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য ধ্রুবপদ-গীতরীতিকে উচ্চে স্থান দিতেন, তা অতীব সত্য।

সৃষ্টি চিরদিনই চায় নূতন পথকে ধরে চলতে, পুনরাবৃত্তির গতানুগতিকতাকে সে বরদাস্ত করার পক্ষপাতী কোনদিনই নয়, কেননা তাই যদি হত তবে ভারতীয় সংগীতের অব্যাহত গতিস্রোত আজ হত মন্থর বা রুদ্ধ। নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বা প্রতিভা সৃষ্টির সহচারিণী। সে হতে চায় নূতন পথের অনুগামী, পুরাতনকে অনুসরণ করলেও নূতনতার ছন্দ ও পরিবেশ দিয়ে সে তাকে সুষমান্বিত করে, তারই জন্য পরিবর্তনশীল সমাজ-রুচিও তাকে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের সম্বন্ধে ঐ এক কথা। লক্ষ্ণৌয়ে কোন দরবারী-সংগীতের সভায় দীর্ঘক্ষণ ধরে একটি রাগের আলাপচারী শোনার সময় তিনি অধীর হয়ে তার বিরামের সময়টি খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন। ঠিক এ' ধরনের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দেখি 'সুর ও সংগতি'-র

আলোচনাক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন : "ভাণ্ডারের ধনে আরোর ফরমাস চলে, কিন্তু আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাক, 'নিমেষে শতেক যুগ-বাসী'। রামচন্দ্র সোনার সীতা বানিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য নিয়ে যদি তার গৌরব হত তাহলে দশটা খনি উজার করে যে পিণ্ডটা তৈরী হত তার মতো সীতার শোকাবহ নির্বাসন আর কিছু হতে পারত না। রামচন্দ্রকে 'থামো' বলতে হয়েছে, কিন্তু ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্ভতার মুখে 'থামো' বলবার সাহস আমাদের জোগায় না। তাতে ভুজবলের প্রয়োজন হয়"। এরই জন্য রবীন্দ্রনাথের স্থষ্টি-মন ছিল সর্বদা সতর্ক, 'লিমিট' বা সংযমের মাত্রা ছিল তাঁর সকল রচনায়, সকল গানে, সকল জিনিস শোনার সময় এবং দেখার সময়। উত্তরকালে প্রাচীনতার বন্ধন-মুক্তির প্রেরণা দিয়েছিল তাঁকে গানে নূতনের অভিযান ; সুর, তাল ও ছন্দের ব্যাপারে এনে দিয়েছিল তাঁর মনে নূতন স্থষ্টিকথা। তিনি নিজের সংগীতে আনলেন তাই নূতন রূপ, নূতন গায়কীভঙ্গি, অথচ আগেকার সঙ্গে পরেকার রচনার বিন্দুমাত্রও থাকলো না বৈরীভাব ; নূতন ভাব ও রসের আনন্দলোক স্থষ্টি করে তিনি তাঁর গানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতার বৈশিষ্ট্য। এখানেই রবীন্দ্রসংগীত বাঙলার শুধু কেন, বিশ্বসংগীতের দরবারে পেলো এক নবীনত্বের দাবী, রাগসংগীতের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও ভাব-সংগীতের মানকে সে করলো উন্নত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন মৌলিক নূতন চিন্তার ও স্থষ্টির ধারক তা আগেই বলেছি। ভারতের রাগ-রাগিণী তাঁর অন্তরে রসলোক স্থষ্টি করলেও কয়েকটি রাগকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। আবার কয়েকটি রাগকে তিনি নূতন রূপেও করেছিলেন রূপায়িত। অনুকরণ, অনুসরণ, সংযোজন ও সংগঠন এই নীতিগুলি তাঁর প্রকৃতির নিজস্ব বস্তু। পুরবী, ইমনকল্যাণ, বেহাগ, ভৈরবী, আশাবরী, রামকেলী, সাহানা, মল্লার, বাহার, খাম্বাজ, বেহাগ-খাম্বাজ প্রভৃতি রাগগুলি ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। রাগ যে কোন-দিনই অচল স্বরূপ নয়—একথা তিনি জানতেন শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কিনা জানি না, তবে মন ও প্রাণের অনুভূতি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতেন সকল জিনিসই। তাই আশাবরীতে কখনো শুদ্ধ-ঋষভের সঙ্গে অবরোহণে লাগাতেন কোমল-ঋষভ। তাছাড়া রামকেলীতে শুদ্ধ-মধ্যম, পুরবীতে শুদ্ধ-ধৈবত,

বেহাগে কোমল-নিষাদ ও কখনো কখনো বিহঙ্গড়ার আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখেও বেহাগে ব্যবহার করতেন উভয়-নিষাদ। বাঙলার সঙ্গীতধারায় নিজস্ব সৃষ্টির কথা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। তিনি জানতেন যে, প্রচলিত গুরুশিষ্য-সংক্রমিত বসন্ত শুদ্ধ-মধ্যমের সঙ্গে শুদ্ধ-ধৈবতের সঙ্গতি রাখে, আর আধুনিক হিন্দুস্তানী শুদ্ধ-বসন্তের স্থান অধিকার করে আছে পরজ-বসন্ত। বাঙালী সঙ্গীতগুণী দামোদর, হরিনারায়ণ, লোচন পণ্ডিত, শুভঙ্কর, নরহরি এঁদের মধ্যে ছিল একটি স্বতন্ত্র মতবাদ। তাই বাঙলাদেশের রামকেলী, বসন্ত, পূরবী, ভৈরব, মল্লার প্রভৃতির প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল সাধারণপদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরপদ্ধতির পক্ষপাতী। বিষ্ণুপুরপদ্ধতি রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রবর্তিত দিল্লী-আগ্রার প্রভাব ও প্রকৃতি নিয়ে রূপায়িত হলেও বাঙলার নিজস্ব প্রকৃতিগুণ এসেছিল তাতে কিছুটা পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন বাঙলার স্বকীয় সজল ভাব ও অনুভূতি নিয়েই হয়েছিলো সৃষ্টি।

এ'প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন কালের রাগরূপ বর্তমান কালের রাগরূপের সঙ্গে ঠিক মিল নাই, কেননা মূলথাট বা standard scale-র পরিবর্তন হয়েছে। মুখারী বা কাফী-রাগের স্বরসজ্জার মতো ছিল যে প্রাচীন কালের মূলথাটের রূপ, বর্তমানকালে তার রূপ হয়েছে বিলাবল। কাজেই কার্য-কারণ বা জন্য-জনক-নীতিতে যারা বিশ্বাসী, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, মূলথাটের রূপ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যরাগ-গুলিতে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ১৫শ-১৭শ শতকে ভারতের সংগীতক্ষেত্রে অনেকগুলি রাগের যে রূপের প্রচলন ছিল, বর্তমান কালে তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য কতকগুলি রাগ-রূপের মধ্যে বিচিত্র গঠনের রূপ আমরা লক্ষ্য করি। যেমন ভৈরব, রামকেলী, বসন্ত, পঞ্চম, দীপক, পূর্বী বা পূরবী, বেহাগ, ললিত এবং আরো অনেক-গুলি। প্রাচীন ধ্রুবপদ-গীতরীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তারা অবশ্যই জানেন যে, বসন্তরাগের সকল ধ্রুবপদ-প্রবন্ধগানের বিকাশই ছিল (এবং এখনো অন্তত: বাঙালাদেশের গুণীদের মধ্যে আছে) উভয়-মধ্যম, কোমল-ঋষভ, শুদ্ধ-ধৈবত এবং নিষাদকে নিয়ে, এবং পঞ্চম-বর্জিত। এই রূপকে বলা হত এবং এখনো বলা হয় শুদ্ধবসন্ত। এ' বসন্তের রূপরেখা যেমন—সা মা | মা মা | মা

ক্ষা | মা গা | মা ধা | নি র্সা | ঋর্নি ধনি ধা মা | ক্ষা মগা | মা ধা | মা গা | ঋ সা | ন্‌া সা | প্রভৃতি। সা মা মগা, মা ধা না র্সা, ঋর্া না ধা মা গা, মা গা ঋা সা এভাবে স্বরন্যস্ত হলেই আমরা শুদ্ধবসন্তের রূপ অনুভব করি। ধ্রুবপদের প্রায় সকল প্রাচীন গানের স্বররেখাই এই শুদ্ধবসন্তের ছকে ফেলা। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল বসন্তের রূপবিকাশে। কিন্তু বর্তমান কালে হিন্দুস্তানী গানের শিল্পীমাত্রেই বসন্তের রূপরেখা সৃষ্টি করেন পরজ-বসন্তের রূপরেখার মতো এবং একেই তাঁরা শাস্ত্রানুগত বলেন। এবিষয়ে বিশেষ করে বাঙলাদেশের এখনো যে কজন ধ্রুবপদ-গীতরীতির শিল্পী আছেন, তাঁদের রূপায়ণের প্রতি সকলকে দৃষ্টিপাত করতে আমরা অনুরোধ করি। আমার নিজেরও সৌভাগ্য হয়েছে কয়েকজন বিদগ্ধ ধ্রুবপদের শিল্পীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে ধ্রুবপদ-গীতরীতি শিক্ষা করার এবং বসন্তরাগের যতগুলি গানই শিক্ষা করেছি তাঁদের সকলের কাছে, কেউই পরজ-বসন্ত-ছকের বসন্ত শিক্ষা দেন নি, দিয়েছেন শুদ্ধ-বসন্তরাগের। এখানে বলা বাহুল্য যে, এক বসন্তরাগেরই বিচিত্র রূপরেখার প্রচলন আছে ভারতীয় সমাজে—কি উত্তর-ভারতে ও কি দক্ষিণ-ভারতে। কিন্তু তাদের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

ঠিক আরো অনেকগুলি রাগের স্বর-বিকাশের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে বাঙলার সমাজে তো বটেই। তাই রবীন্দ্রনাথের রাগরূপে কিছু কিছু পরিবর্তনের নীতি ও রুচি লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই বিচারবান শিল্পী ও শাস্ত্রীরা মোটেই বিস্মিত হবেন না। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের পাতায় এ'ধরনের পরিবর্তনধারার নিদর্শনের অভাব নাই শিল্পীমাত্রেই জানেন।

রবীন্দ্রনাথের চক্ষেও রাগগুলি প্রাণবান বলে অনুভূত হয়েছিল, আর তারি জন্য রাগগুলিকে প্রকৃতির সহচররূপে গণ্য করে খ্রীষ্টীয় ১৬শ—১৭শ শতকের সৌন্দর্যকামী শিল্পীদের মতো তিনি অনেকগুলি রাগের ধ্যান-মূর্তির কল্পনা ও রূপরেখা এঁকেছিলেন তাঁর মানসপটে। তিনি এ' বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছেন, গানের সুরের (রাগের) সঙ্গে আমাদের অন্তরের ভাবের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে, যদিও গানের কথা ও সুরের কম্পন সৃষ্টি করে রসের মাধ্যমে মনে বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা। তিনি বলেছেন: "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না—আমি নিশ্চয় জানি, এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি

ভাজতে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল নীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মত আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে”। তিনি প্রভাত ও সন্ধ্যার রাগিণী ভৈরবী ও পূরবী নিয়ে বিচক্ষণ রসবোদ্ধা শাস্ত্রকারের মতই বিচার করে বলেছেন : “প্রথমত সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণী—উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নয়ন উন্মিলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। * * একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক”।

তাই গানের কথায় তিনি সুর যোজনা করতেন প্রকৃতির ভাব বা মেজাজ লক্ষ্য করে। প্রভাতের নবজাগরণের সমারোহকে উপলক্ষ্য করে যখন তিনি গান রচনা করতেন, তখনি তাতে সুর-সন্নিবেশ করতেন ভৈরব, ভৈরবী, তোড়ী, রামকেলী বা কলিঙ্গড়া রাগগুলি দিয়ে। সন্ধ্যার বর্ণনায় তিনি রাগ হিসাবে ব্যবহার করতেন ইমন ও পূরবীকে। রাত্রের বর্ণনায় তাঁর গানে সুরের আমেজ পাওয়া যায় কানাড়া, বেহাগ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগের। বসন্তঋতুর বর্ণনায় বাহার অথবা বসন্ত-বাহারের বিকাশ আছে। বর্ষার গানে পাওয়া যায় দেশমল্লার বা মিঞামল্লারে সংযোজন। তবে ব্যতিক্রমও যে কোন কোন জায়গায় হত না—তা নয়, কেননা শরতের বর্ণনার সময় তিনি সকালের রাগ বা রাগিণীগুলিকে ব্যবহার করেছেন। সারঙ্গকে (সারঙ্) তিনি দুপুরের রাগ বলতে নারাজ ছিলেন। তাছাড়া ছ'টি ঋতুর ছ'রকম প্রকৃতিকে রূপায়িত করার জন্য 'ঋতুরঙ্গ'-নাটিকার সমাবেশ করেছিলেন তিনি ঋতু-অনুযায়ী রাগরূপের যোজনা করে।

উন্মীলন ও নিমীলনই ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংগীতে রাগ-রাগিণী তথা পুরুষ-রাগ ও স্ত্রী-রাগ-নির্ণয়ের এক মর্মকথা। পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেব তাঁদের 'সংগীতসময়সার' ও 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থ-দুটিতে আলাপ ও আলপ্তির কথা বর্ণনা করেছেন এবং ভাবসাধনের লক্ষণ হিসাবে টীকাকার কল্লিনাথ 'আবির্ভাব'

ও 'তিরোভাব' শব্দেরই ব্যবহার করে বলেছেন, 'আবির্ভাব' প্রকাশ করে বলে উন্মীলন ও 'তিরোভাব' আবরণ করে বলে নিমীলন। টীকাকার কল্লিনাথের বর্ণনাভঙ্গী হল : তিনি আলাপ ও আলপ্তি শব্দ-দুটিকে 'ভাবসাধনতত্ত্ব'-রূপে গণ্য করেছেন। 'ভাবসাধন' বলতে ধাতুর অর্থসিদ্ধ আবির্ভাব ও তিরোভাব-প্রকৃতি বা অবস্থাকে বোঝায়। তিনি বলেছেন : "ভাবো নাম সাধ্যরূপস্য ধাত্বর্থস্য সিদ্ধত্বাকারঃ। তদবস্থাবিশেষা আবির্ভাবাদয়ঃ"। তিনি ব্যাকরণ-উপাদান ঘঞ্ ও ক্তি প্রত্যয়-দুটির ব্যবহার দেখিয়ে বলেছেন, 'ঘঞ্' অর্থে আবির্ভাব অথবা উন্মীলন এবং 'ক্তি' অর্থে তিরোভাব বা নিমীলন। এই প্রত্যয়ভেদেই রাগ পুরুষ ও স্ত্রী, আবার প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপে রূপায়িত হয়—"লিঙ্গভেদোপ্যুপপন্ন এব"। পণ্ডিত হরদত্ত মিশ্র 'পদমঞ্জরী'-গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কল্লিনাথ মিশ্রের প্রমাণই উদ্ধৃত করেছেন। আবির্ভাব, উন্মীলন ও উপচয় প্রকাশপদবাচ্য এবং তিরোভাব, নিমীলন ও অপচয় অপ্রকাশপদবাচ্য। সত্ত্ব ও রজঃ গুণই উন্মীলন-নিমীলনের কারণ।

যাক্ এতো গেল নিছক শাস্ত্রযুক্তির কথা এবং তাছাড়া আছে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুভূতির কথা। রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কল্লিনাথের টীকা অথবা পদমঞ্জরী অনুশীলন করেছিলেন কিনা জানি না (নিশ্চয়ই করেন নি), তবে তাঁর সূক্ষ্মবিচারদৃষ্টিতে যে এ'তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যথার্থ প্রতিভাবান বা প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান মনীষীমাত্রেই এ'ধরনের দৃষ্টি বা অনুভূতি থাকে,—বিচারের মাপকাটিতে বা ইতিহাসের পাতায় যার কোন প্রমাণ মেলে না। তারি জন্য রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ রাগের পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবদুটি নিয়ে শাস্ত্রীয় বিচারের কোন অবতারণা করেন নি, করেছেন মাত্র দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে রাগের ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীমনের দুটি বিরুদ্ধ অথচ মৈত্রীভাবসম্পন্ন প্রকৃতির আলোচনা। তাঁর আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্যই হোল রাগের কোমলতা ও কারুণ্য-ভাবের কারণ নির্ণয় করা।

রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর ভাব ও আবেদন-সম্পর্কে তাই বলেছেন : "ভৈরবী-সুরের মোচড়গুলো কানে এলে মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠছে। * * ভৈরোঁ যেন ভোর-বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ। * * মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুসরণ, না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তববিলাসী তাকে অবাস্তর বলে নিন্দা করে না। * * মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা। * * মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা-সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। * * বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি 'থাম্‌রে থাম্‌, আর রে আয়'। পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রা-বিহ্বলতা। সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর—যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই, তাই সেটি আমাদের বিবাহ-উৎসবের রাগিণী। কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি। খাম্বাজের করুণ তান শহর-আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল"।

'সংগীত ও ভাব'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীদের ভাববোধনের একটা কারণ অনুসন্ধানের কথা বলেছেন এবং বলেছেন সেই ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে শিল্পী ও শ্রোতার মনকে একীভূত করার জন্য, কেননা এই একীকরণ-সাধনায়ই মেলে আনন্দরসভোগের আশীর্বাদ। তিনি বলেছেন: "সংগীত-বেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভেরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবল মাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে"।

গূঢ় কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু শিল্পীরা সেই কারণের প্রতি সচেতন থাকেন না, যার জন্য রাগ-রাগিণীদের স্বরসজ্জায় রসরূপ ও প্রাণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ তারি জন্য বেদনাহত। তিনি রাগের সুর-বিকাশের মধ্যে নিজের চিত্তস্পন্দনকে প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দেখেছেন, তাই শাস্ত্রকার যেমন রস-বিচার করে রাগকে ভাগ করেন, কাল অনুযায়ী তিনি ঠিক তেমনি করেন নি। সকল শ্রেণীর সংগীতশিল্পীদের একথা

ভেবে দেখার বিষয়, কেননা রাগ-রাগিণী স্বরেরই মাত্র আরোহণ-অবরোহণের কাঠামো নয়। ভারতীয় সাধকরা রাগ-রাগিণীদের রূপ বর্ণনা করেছেন ধ্যানমৌনদৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে। স্বভাব-কবি রবীন্দ্রনাথের সহজ দৃষ্টিতে রাগ-রাগিণীদের ভাবদীপ্ত রূপ ধরা পড়েছিলো চাক্ষুষভাবে, তাই কোন রাগকেই তিনি নিরর্থক বলেন নি, আর বলেন নি যে তারা শিল্পীরই শুধু কল্পনা-স্বষ্টির পরিণতি, বরং বলেছেন, রাগ রাগিণীরা চিররহস্যময়ী প্রকৃতিরই অন্তরের গোপন সম্পদ, শিল্পী শুধু তার প্রকাশক ও পরিবেশক মাত্র। তাই রাগ-রাগিণীদের ভাব ও রসানুভূতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে মুখ্য, আর স্থর-সন্নিবেশ ও তাদের বিচিত্র প্রয়োগপ্রণালী ছিল গৌণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্যকে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। ছন্দকে তিনি বলেছেন স্পন্দন, বেগ, গতি বা প্রাণকম্পন। "ছন্দ মানেই ইচ্ছা" একথাও তিনি বলেছেন। ছন্দের উপযোগিতা সাধারণত কাব্যে, সেটাই কাজ করে গানে তালের আকারে। 'সংগীত ও ছন্দ'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি স্বষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না"। তাই অনাদিকাল থেকে বিশ্বস্বষ্টির বুকে লয়ের কাজ চলেছে অবিশ্রান্তধারায় স্রষ্টা নটরাজের নৃত্যের তালে তালে। লয় ও তাল আপাতদৃষ্টিতে তাই পৃথক বলে প্রতিভাত হলেও একেরই তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। দীর্ঘতা, হ্রস্বতা বা সমতা-রূপ পরিমাপকে অনন্তকালের বা অনন্ত গতির বুকে সার্থক করার জন্যই লয় বা তালের স্বষ্টি।

'ছন্দ'-গ্রন্থ থেকে ছন্দ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কিছুটা পরিচয় দেই। গানের বা কবিতার স্থরের সঙ্গে ছন্দের যে সামঞ্জস্য বা মিতালী সেই প্রসঙ্গে সমমাত্রিক ছন্দ-সম্বন্ধে কবি বলেছেন: "একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কনচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের স্থরে কীর্তিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের স্থরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। * *

বাঙলাদেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ; কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না। গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা"।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। তিনি বলেছেন: "বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখন সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই"।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিশেষভাবে ছন্দ, লয় ও তালকে স্থান দিয়েছেন তা আগেই বলেছি। সুরকে তিনি বলেছেন 'একটা বেগ'। তাল সেই বেগকে গতিদান করে, তালের তাই উপযোগিতা আছে সুরে। তিনি বলেছেন: "সে (সুর) আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতি দান করে"। গতি বা গতিবেগ থেকেই সৃষ্টি হয় আবেগ। এই আবেগ দুঃখ বা শোকের বেদনা নয়, বা সাংসারিক কোন ঘটনামূলক পদার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই আবেগ বিশ্বব্যাপী একটি প্রাণস্পন্দন, গান শুনে সেটাকেই আমরা চিত্তে অনুভব করি। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ভৈরবী ও দেশমল্লার রাগ-দুটির অভিব্যক্তি নিয়ে। তিনি 'সংগীত ও ছন্দ'-প্রবন্ধে বলেছেন: "গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোন সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয়, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রু-গঙ্গোত্রীর কোন আদি-নির্ঝরের কল-কল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশ-কালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে"। সুতরাং গান বা রাগ-রাগিণী সকলের মনে একটি আবেগ সৃষ্টি করে ও সেই আবেগ দেশ-

কালাতীত বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মহিমাকেই উপলব্ধি করার জন্য সহায়তা করে।

মোটকথা গানে শুধু নয়—কাব্যে, নৃত্যে এবং নাটকেও ভাবের স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সবার ওপরে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও যে ছন্দ খেলে তা বিকাশ লাভ করে শিল্পীর ভাবমুখর মনের সক্রিয় ইচ্ছার ইঙ্গিতে। নৃত্যেও তাই ; দেহাবয়বের চঞ্চল গতি শুধু নৃত্য-সুষমাকে প্রাণময় করে না, করে নৃত্যশিল্পীর মন বা মনের ভাব বা মনের চেতনাকে। 'বাংলাছন্দের প্রকৃতি'-নিবন্ধে তিনি নৃত্যকলার পরিচয় দিয়েছেন অপরূপভাবে। তিনি বলেছেন : "নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দেরই আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি, সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাব-ব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপ সৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য, সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে"। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যই তার প্রমাণ। তাঁর 'ঋতুরঙ্গশালা' 'বসন্ত' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলি রচিত হয়েছে একটি ছন্দায়িত মূলভাবকে আশ্রয় ও লক্ষ্য ক'রে। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যগুলিতে গান নৃত্যছন্দের অনুবর্তন করেছে প্রাকৃতিক ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। গীতিনাট্য রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে সম্ভবত ছায়াপাত করেছিল বৈদিক যুগের সামগান-আয়োজনের চিত্রসৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের দোলায়িত যে গতি থাকে মৌন হয়ে, তা মুখর হয় নৃত্যে এবং হস্ত ও মুখের ভাব-ব্যঞ্জনায়। বৈদিক সামগানকারীরাও গান করতেন বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ নিয়ে, আর ছন্দের যে অংশ থাকতো গানে আত্মগোপন করে অফুটন্ত ফুলের কুঁড়ির মতো, সামগ-পুরোনারীদের মণ্ডলাকার ছন্দায়িত নৃত্য ও পিচ্ছোরা-বীণাবাদ্য প্রকাশ করতো তাকে বাস্তব রূপ দিয়ে। তাছাড়া বৈদিকোত্তর যুগে গানের সঙ্গে ছন্দায়িত নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশের অপ্রতুলতা নাই। তাই মনে হয়, বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের

সংগীত-সমারোহ যেন নবজীবন লাভ করলো আবার রবীন্দ্রনাথের হাতে এই বিংশ শতকে।

গান-রচনায় রবীন্দ্রনাথের যেমন প্রতিভাদীপ্ত নূতন অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়, তালসৃষ্টির বেলাও তাই। চলাপথে না চল্যাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ও ধর্ম। কাওয়ালী তেওরা, রূপক, একতাল এসব তালের ব্যবহার তো তিনি করতেনই, তাছাড়া নব-নব তালের সৃষ্টিও তিনি করেছেন তাঁর নূতন গানের পথকে সচল করার জন্য। তিনি সৃষ্টি করলেন 'নবতাল', 'একাদশীতাল', 'ঝম্পকতাল' প্রভৃতি। তালের কথায় এখানে মনে পড়ে বাঙলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথা। হিন্দুস্তানী সংগীতে তালের সংখ্যাও বড় কম নয় আমরা জানি। সংগীতশাস্ত্রে এমন অনেক তালের পরিচয় আছে যেগুলি নষ্ট হয়েছে সার্থক অনুশীলনের অভাবে। কিন্তু বাঙলাদেশের কীর্তনে ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন গানে তালের যে বিচিত্র রকমের পরিচয় পাওয়া যায়—তা হিন্দুস্তানী ও অন্য কোন দেশের সংগীতে মেলে না। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। নূতনের পথে অভিযান করা ছিল তাঁর অভ্যাস তা আগেই বলেছি। ঝাঁপতালের ১২।১২৩।১২।১২৩ মাত্রার কথা তিনি জানতেন, কিন্তু সৃষ্টি করলেন তার বিপরীত গতিকে অবলম্বন করে ১২৩।১২।১২৩।১২ এই ঝম্পকতালের ধারা। দক্ষিণ-ভারতের সারতালের অনুযায়ী ৩।২।৩ মাত্রার সমাবেশ দিয়ে সৃষ্টি করলেন তিনি রূপকড়ার। কর্ণাটি চুক্করতালের (৫।২।২) মাত্রাকে অনুসরণ করে তিনি রচনা করলেন নবতাল ৩।২। ।২ মাত্রাগুলিকে সাজিয়ে। কর্ণাটি-সংগীতের মণিতাল, বিন্দুতাল ও নীলতালকে অনুসরণ ক'রে সৃষ্টি হোল তাঁর হাতে একাদশীতাল—যার মাত্রা-বিভাগ ৩।২।২।৪। তালগুলিতে ফাঁকের সার্থকতা তিনি রাখেন নি, কেননা শক্তির ওজন যায় তাতে কমে, তাই আঘাতেই তালের সবল গতিবেগকে রাখলেন তিনি অব্যাহত।[১] কাজেই গানে তাঁর নূতন সৃষ্টির নিদর্শনই মেলে অফুরন্তভাবে, পিছন ফেরার গতানুগতিক অভিনয় তিনি করেন নি কখনো। তিনি ছিলেন সত্যকারের সৃষ্টিকারী রচয়িতা। স্থিতিশীলতার পরিবর্তে গতিশীলতাকেই তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে ও গতিতে।

১। তাল ও তাদের রূপসম্বন্ধে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি পরে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুর বা রাগ-মিশ্রণের রাজা। তাঁর গানে তিনি মিশিয়েছিলেন প্রাচ্যের সকল দেশের প্রায় সকল জাতিরই সুর এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যেরও সুরসম্পদ। এপ্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্রভাব বা অনুকরণ স্বীকার করেন না। কিন্তু এ' অস্বীকরণের মধ্যে কোন সার্থকতা আমরা দেখি না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাবান পুরুষ এবং সৌন্দর্যের ছিলেন পরম-অনুরাগী ও পিপাসী। পাশ্চাত্ত্যের যা-কিছু ভাল তা তিনি সংগীতে, সাহিত্যে এবং নাটকেও কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন এবং এই গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর উদার-দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও এ' ধরনের মিশ্রন-প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টিকর্মেও এর অভাব নেই।

আমরা আগেই বলেছি যে, দরবারী হিন্দুস্তানী সংগীত থেকে আরম্ভ করে রাঢ়দেশের কীর্তন, পশ্চিমবঙ্গের সহজিয়া ও বাউল, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি, সারি, গম্ভীরা, মণিপুরের কীর্তন, আসামের বড়্গীত ও বন্গীত, তাছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় সকল-কিছু সুরের সার্থক সমাবেশ হয়েছিল তাঁর গানে। কবি জয়দেবের প্রেরণায় জন্মলাভ করলো তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী'। কীর্তন, বাউল, ও ভাটিয়ালির ছাঁচে গান রচনা করেছিলেন তিনি অনেক। দক্ষিণ-ভারতীয় পদ্ধতির অনুযায়ীও তাঁর গান পাওয়া যায় কতকগুলি। অনুবাদ-গীতির রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন, হিন্দুস্তানী গান যেখানে কথা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

> বীণা বাজায় রে মন লে গয়ো।
> মধুর মধুর ধুন অধরণ ধররে
> রস ভরি তান শুনায়রে মন লে গয়ো।

রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা রূপ দিয়েছেন—

> বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
> সজনে বিজনে বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
> আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।

তাছাড়া আরো এ'ধরনের অনেক নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। হিন্দী তেলেনা ও চতুরঙ্গ-শ্রেণীর গানের অনুকরণেও তিনি অনেক গান রচনা

করেছিলেন। নাট্যকবি দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বিলেতি সুরের আমেজ দিয়ে অসংখ্য স্বদেশী ও হাসির গান রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অবদানেও তেমনটি পাওয়া যায়,—যদিও উভয়ের রচনাশৈলীতে পার্থক্য ছিল অনেক। ভাব, ভাষা ও মাধুর্যের বিভেদও দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। দু'জনের হাসির গানের তুলনা করে দেখলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের হাসির গানগুলিতে শিষ্টাচার ও সুরুচি যথেষ্ট এবং তারা গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ, আর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে শিষ্টাচার গৌণ, মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চেয়েও বরং কৌতুকের ভাব। ইংরেজী গানের রূপায়ণেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় অনেক, কেননা দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কথা সরস, সাবলীল ও সাহিত্যরুচিপূর্ণ। মৌলিকতার সৌন্দর্যও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে বেশী।

ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে বিলেতী তথা পাশ্চাত্ত্য সংগীতের অনেক জায়গায় তিনি তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় প্রাচ্য-সংগীত ভাবে, আদর্শে ও বৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের আসন উচ্চে। 'জীবনস্মৃতি'-তে এ'প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "আমাদের দেশে গান-সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা; য়ুরোপে গলা-সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে"। কিন্তু সকল-কিছু সত্ত্বেও ভারতীয় সংগীতের মাধুর্যকে কবি শ্রেষ্ঠ আসনই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাঁহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর,—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই। * * * আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা"।

এরপর 'পথের সঞ্চয়'-পর্যায়ে সংগীতসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই উভয় সংগীতের অন্তরতম বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : "য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, সেকথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগ-রাগিণীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বৈচিত্র্যের তান সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে; একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি জগতের সেই বহুরূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে স্বর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই গানের তান-লয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্রগতিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশের সংগীতে সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বৈচিত্র্যের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি, আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া মন রাখিয়া আপনাকে শান্ত করাই আমাদের স্বভাব। * * * আমাদের সংগীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের সংগীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়-লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য বারবার ইহা অনুভব করিয়াছি। আমাদের সংগীতে আমাদের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে সাহানা বাজে, কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে আমোদের ঢেউ খেলে কোথায়? তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গম্ভীর, তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলেতী ব্যাণ্ড বাজানো বড়মানুষী বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। * * * আমাদের সংগীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সংগীত

একের গান,—একলার গান, কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক"।

তাছাড়া আইরিশ, স্কচ ও ইংরেজী গানের সুরপ্রেরণা তাঁকে কয়েকটি গীতিনাট্য-রচনায় সচল করেছিল এবং এর প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়ে বলেছেন: "আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। * * এই আইরিশ মেলডীজ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। * * আইরিশ মেলডীজ বিলেতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম, কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। * * দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলেতী গান স্বজন-সমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন রবির গলা এমন বদল হইল কেন। কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে"। কবি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, বিলেতি সুর তার প্রাণের তারে বিশেষভাবে ঝঙ্কারের সাড়া না দিলেও তিনি দেশী ও বিলেতি সুরের মিশ্রণেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-র রূপদান করেছিলেন এবং রচনা করেছিলেন কয়েকটি গান আইরিশ মেলডীজের অনুকরণে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতবাবু 'রবীন্দ্রজীবনী'-তে (১ম খণ্ড) লিখেছেন 'কবি-কাহিনী'-প্রসঙ্গে: "ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি কবির মনে পুরাতন আয়রল্যাণ্ডের একটি মায়ালোক সৃজন করিত। সেই মেলডীজের কয়েকটি সংগীত বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'ভারতী'-তে ('সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৭) এই সময়ে প্রকাশ করেন"। এ' থেকে সহজেই মনে হয়, শিশুজীবন থেকেই আইরিশ মেলডীজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল এবং আইরিশ কবি টমাস ম্যুর (১৭৭৯—১৮৫২) -এর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Iris Melodies-গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেছিল।

বিলাতী সুরের মাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল পূর্বেই বলেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ' প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রজীবনী'-গ্রন্থে (১ম

খণ্ড) লিখেছেন : "বাল্মীকীপ্রতিভার ন্যায় 'কালমৃগয়া'-রও কয়েকটি গানের সুর সম্পূর্ণ বিলাতী সুরে ঢালা। বিলাতে থাকিতে তিনি যে কেবল বিলাতী সংগীত ও নৃত্যকলা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, এদেশে আসিয়াও সর্বোত্তম পাশ্চাত্য সংগীত শ্রবণের জন্য তাঁহার উৎসাহ ম্লান হয় নাই। কলিকাতায় কোন য়ুরোপীয় বিখ্যাত সংগীতাচার্য বা বাদক আসিলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাদের গান-বাজনা শুনিতে যাইতেন (১৮৮৫ জানুয়ারী ২১, বিখ্যাত বেহালাবাদক রেমিনির বাজনা শুনিতে যান)"।[১]

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রবীন্দ্রনাথের মতো বিলেতি সুরের মিশ্রণে বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। তবে দু'জনের রচনার মধ্যে পার্থক্য পাই অনেক পরিমাণে। কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি যেখানে মৌলিক রচনার প্রেরণা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ভিতর দেখি সেখানে অনুবাদ করার প্রেরণা। সামান্য একটু উদাহরণ এ' সম্বন্ধে দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, টমাস ম্যুরের (Thomas Moore) অন্যতম প্রসিদ্ধ 'Go where glory waits thee' ইংরেজী গানের অনুকরণে বাংলাগান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই, কিন্তু একজনের মধ্যে আছে রচনার স্বকীয়তা ও অপরের মধ্যে পাই অনুবাদের আকুলতা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজী গানটি বাংলা রূপ দিয়েছেন—

যাও যেথা যশ আছে, কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো,
যখন অতি অধীর প্রাণে, শুনবে আপন
নামের গানে, আমায় একবার মনে কোরে।
—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ গানটির বাংলা রূপ দিয়েছেন—

মানা না মানিনি তবুও চিনিনি,
কি জানি ঘটে ; অমঙ্গল হেন, প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন, প্রাণ কেঁদে ওঠে।—ইত্যাদি।

ঠিক এ' ধরনের তুলনামূলক আলোচনা করা যায় উভয়ের আরও অন্য

১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২-৩৩

গান-রচনার বেলায়ও। যেমন, যে ছন্দ ও রচনাধারার অনুসরণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছেন,

(ক) সে আসে ধেয়ে, এন. ডি. ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্,
চায়ের গন্ধ পেয়ে।

সেখানে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন,

(খ) সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে,
রিনিক রিনিক রিনি ঝিনি,
মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে ;
রিনি ঝিনি ঝিল্লিরে।

উভয়ের ভাব, ভাষা ও রচনাচাতুর্যের মধ্যে দেখি পার্থক্য যথেষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথের হাসির গানে শিষ্টাচার ও সুরুচির সাথে সাথে গাম্ভির্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের গানেও শিষ্টাচার যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাঁর হাসির গানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চেয়ে কৌতুকের ভাব অধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন 'প্যারডি'-রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'কোরাস' বা সমবেত কণ্ঠে বাংলাগানের আধুনিক রীতি তিনিই প্রথমে প্রবর্তন করেন। তা' ছাড়া স্বদেশীগানে দেশপ্রেমিকতার সাথে সাথে বীরত্বের দ্যোতক বীররসের সমবেশ করাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মোটকথা বাংলাভাষার একটি নিজস্বতা সৃষ্টি করে বাংলাগানকে দ্বিজেন্দ্রলাল সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর হাসির ও স্বদেশীগানের অবদানকে বাঙ্গালীজাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে।

কান্তকবি রজনীকান্তও জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগে, অথচ রবীন্দ্র-নাথের বিশেষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন স্বভাব-কবি, প্রকৃতির মর্মকথাকে প্রকাশ করতেন তিনি সরস সাবলীল ভাষায় ও প্রাণস্পর্শী সুরে। পৃথিবীর মাটিতে বাস করলেও তাঁর দরদ ছিল অপার্থিব আনন্দলোকের দিকে। তাঁর গান-রচনার মধ্যে পাওয়া যায় তাই অধ্যাত্ম-সম্পদের সরস ও প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর অমর 'কল্যাণী' ও 'বাণী' গীতিগ্রন্থ-দু'খানি। রজনীকান্তের গান এক সময়ে শোনা যেতো বাঙলার পথে মাঠে ঘাটে, কিন্তু

তার অনুশীলন রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তুলনা করলে যেন কম। তার কারণ মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা। যেমন প্রদীপ্ত সূর্যকিরণের প্রভা অনেক গ্রহ-তারকার আলোককেও ম্লান করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা-মাধুর্যের প্রভাবে শুধু রজনীকান্ত কেন, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি নজরুল প্রভৃতির অবদানের অনুশীলনও অনেকাংশে ম্লান হয়েছে স্বীকার করতে হবে।

কবি অতুলপ্রসাদও জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগে, অথচ রচনা ও গানের মধ্যে ছিল তাঁর স্বকীয়তা। উচ্চাংগ হিন্দুস্তানী সংগীতের ছিলেন অতুলপ্রসাদ পরম-অনুরাগী। গান রচনা করেছিলেন তিনি সমগ্র জীবন সরল স্বছন্দ বাংলাভাষায়। লক্ষ্ণৌ-ঠুম্‌রীর সুরবৈচিত্র্যকে অনুসরণ করে তিনি অসংখ্য রচনা করেছিলেন। বাঙ্‌লাদেশের বাউল ও কীর্তনের মাধুর্যও করেছিল তাঁকে পাগল।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন নিঃসঙ্গতার সহচর ; লোকের ঝামেলা বা নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি চিরদিনই ছিলেন দূরে। তিনি গেয়েছেন : 'মিছে তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা—গান গেয়ে যা আজীবন'। সত্যই তিনি গান রচনা করেছেন ও গান করেছেন আজীবন নীরবে ও নিভৃতে, নিজের জন্য চান নি কোনদিন কিছুই, অথচ রেখে গেছেন সারা বাঙ্‌লার কেন, সারা বিশ্বের মরমী ও দরদী যারা তাদের জন্য সান্ত্বনা ও শান্তির অনন্ত প্রস্রবন। তাঁর প্রেম-সংগীতের আবেদনে নাই চাটুলতা ও ক্ষণিকের সরসতা, বরং আছে বিশ্বপ্রেমের আকুলতা ও শাশ্বতলোকের ইঙ্গিত। তিনি গেয়েছেন যেখানে 'চল্‌ আজ স্রোতের সনে, ছুটি সেই ডাকের পানে, যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়', সেখানে তাঁর গান সার্থক হয়েছে জীবন-মরণহীন আনন্দময় দেশে তার সুরকে পৌঁছে দিয়ে। কিন্তু এহেন স্বভাব-সরল সুরকারের গানও আজ নিষ্প্রভ হতে চলেছে বাঙ্‌লার শিল্পীসমাজে। রবীন্দ্র-সংগীতের অপ্রতিহত ধারা ও তার ভাবমাধুর্যই সম্ভবতঃ সেই নিষ্প্রভতার জন্য দায়ী! সূক্ষ্মদর্শীর কাছে দিচ্ছি এর বিচারের ভার।

বাঙ্‌লার স্বদেশী তথা অগ্নিযুগের বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলামেরও প্রতিভা ছিল অসামান্য। ইস্‌লামধর্মী হলেও হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতির ভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে

মহাশক্তি কালিকার প্রতিও ছিল তাঁর অচলা ভক্তি; তাই তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতগুলি আজও ভাবে ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে।

কবি নজরুল অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেছেন, বাংলা গীতিকবিতা ও সংগীত-রচনার তিনি পরিপূর্ণ প্রেরণা পেয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তেজোদীপ্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাছেও তিনি ঋণী ছিলেন। কবি নজরুলের বিশেষ অবদান হোল তিনি বাংলাভাষায় সরস ও সুন্দর করে গজলগানের প্রচলন করেন। 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী', 'বাগিচার বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল,' 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা' প্রভৃতি গজলগানগুলি আজও তাঁর মধুময়ী স্মৃতিকে জাগ্রত রেখেছে। তাছাড়া 'জাগো হে রুদ্র হে রুদ্রাণী,' 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার', 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল', 'টলমল টলমল্ পদভরে' গানগুলি স্বদেশী যুগে অত্যাচারপীড়িত ও ব্যথিত ভারতবাসীর প্রতি সমবেদনার ভাব নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন। যুদ্ধাভিসারে যাত্রীদের জন্য এই উদ্দীপনার গানগুলি লিখিত। অসংখ্য বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, কাজরী এবং ভজনগানও কবি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, নমো নমো', 'রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়', 'তিমির বিদারী অলখ বিহারী কৃষ্ণমুরারি আগত ঐ' গানগুলি ভাষা ও ভাবসম্পদে অতুলনীয়। সংগীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ বা সুর সৃষ্টি করাতেও তাঁর কৃতিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা-সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গানের অনুশীলনও আজ লোপ পেতে বসেছে। এমন দিন ছিল, যখন পথে ঘাটে মাঠে নদীবুকে কবি নজরুলের ছন্দ-দোলায়িত গজলগানের প্রতিধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু আজ সে-সব যেন বিস্মৃতির গর্ভে ছুটে চলেছে। এর কারণও মনে হয়, প্রদীপ্ত কিরণমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের গানের অনিন্দ্যসুন্দর ভাব এবং রচনার লালিত্য ও মোহনীয় শক্তির প্রভাব। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কবি নজরুলকে স্মরণ করেছি ঠিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদেরকে তুলনা করার জন্য নয়, বরং রবীন্দ্র-নাথেরই রচনাচাতুর্যকে পরিস্ফুট করার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের গানে দেশের ও দশের প্রতি দরদও অফুরন্ত। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর গান সর্বসাধারণের জন্য, নির্বাচিত শ্রেণী ও আরামবিলাসী ধনীদের জন্য শুধু .নয়। গানের জন্য প্রশংসা পাবার আশাও তিনি করেন নি কোনদিন। তিনি বলেছেন: "আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমন সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর খুব বেশী ambition মনে নাই রাখলাম"। অবশ্য ambition বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি নিজে না রাখলেও বাণী-সরস্বতী প্রশংসার অজস্র.আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন তাঁর সমুন্নত শিরে। সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী তাঁর গানের সুর বিশ্বসমাজের সর্ব-সাধারণের হৃদয়ে আসন পেতে বসতে আজ সক্ষম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশকে ভালবেসেছিলেন প্রাণের অন্তরতম দেশ থেকে। দেশ-মাতৃকার পরাধীনতাকে তিনি কোনদিনই জীবনে বরদাস্ত করতে পারেন নি, আর পারেন নি বলেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে শুধু সুর-সংযোজন করেই ক্ষান্ত হন নি, জাতীয় সংগীতের রচনা ও প্রচারের দায়িত্বকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে' গানখানি আজ ভারতের সকল জাতির গৌরব-সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্রের জাতীয়-সংগীত মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথকেও 'বন্দেমাতরম্'-সংগীত করেছিলো উদ্দীপিত তা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথ দেশের ও জাতীর প্রাণের উদ্বোধনের জন্য রচনা করেছিলেন নূতন ধরনের স্বদেশী গান (১) 'অয়ি ভুবন-মনমোহিনী', (২) 'আজি এ' ভারত লজ্জিত হে' (৩) 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে', (৪) 'কে সে যায় ফিরে ফিরে' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরবর্তী নাট্যকার গীত-রচয়িতা ও সুরকারদের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিলো এবং সেই প্রভাব-প্রবাহকে কতকটা এড়িয়ে উঠতে পারেন নি এমন কি কান্তকবি রজনীকান্ত, কবি অতুলপ্রসাদ ও কবি নজরুল প্রভৃতি সে' কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙলার মধ্যে শুধু নয়, সারাবিশ্বে এনেছে এক নূতন আলোড়ন ও চেতনা। উচ্চাংগ সংগীতের আভিজাত্যের মতো তার মানও থাকবে চির-উন্নত হয়ে। রবীন্দ্রসংগীতের কাঠামো রাগসংগীতের উপর

প্রতিষ্ঠিত তা আগেই উল্লেখ করেছি, তাই রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের অবহিত হওয়া উচিত রাগরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের গান নূতনের পথচারী হলেও পুরাতনের বুকেই গড়ে তুলেছিলেন কবি তাঁর গানের সুদৃঢ় প্রাসাদকে। ব্যাকরণের বাঁধাধরা নিয়মের বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রসংগীত বাঙলার সমাজে গড়ে ওঠেনি সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুসন্ধানী মনোবৃত্তিকে তা দেয়নি কোনদিনই বিসর্জন। তাই পুরাতনের বুকে নূতনের ভিত্তিশিলা স্থাপিত হলেও নূতন যুগের মনোভাবকে বলিদান দিতে তিনি বলেন নি। সংস্কৃতিবান মনের সৃষ্টি স্বকীয়তার আশ্রয় নিয়েই আনন্দরসের সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের মনে এবং সে সৃষ্টি তাই অনুকরণ-বৃত্তিকে বর্জন করলেও অনুসরণ-নীতিকে গ্রহণ করে হয় মহীয়ান। এখানে 'সুর ও সংগতি' আলোচনা-পর্যায়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন: "বাঙলাদেশে সম্প্রতি সংগীত-চর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীত-রচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্তানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ' কিন্তু অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আছে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিষ্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। সে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারী তোড়ী, দরবারী কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন। সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নূতন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা, কেননা তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। * * এখনকার রচয়িতাদের গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় তাহলে তাতে করেই সেই সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে"।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথ চাইতেন সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, সংগীতে ও সকল বিষয়ে নব-নব যুগের আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধারা প্রবাহিত করতে, তাতে পুরাযুগের সৃষ্টির সঙ্গে নবযুগের মিলন না হলেও শিল্প বা সৃষ্টি-সার্থকতার ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের মধ্যে যেমন পাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তান্তরের সন্ধান, তেমনি তাঁর সংগীতের মধ্যেও পাই সুসঙ্গত একটি ক্রমবিকাশের ধারা। একদিনে বা কয়েকটিমাত্র দিনে বিশ্বের সৃষ্টিবৈচিত্র্য যেমন সার্থক হয় নি, সহস্র সহস্র বৎসর লেগেছিল তার বিকাশ পরিপুষ্ট হতে, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের যে বিরাট বিপুল মহীরুহ আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার সৃষ্টিও একদিনে হয়নি, ক্রমবিকাশের ধারা তার পিছনে অবশ্যই আছে। নিত্য-নূতন কতকিছু ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল মন রচনা করেছে সংগীতে বাণী ও সুরের অর্ঘ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার হয়েছে তাতে পূর্ণ।

কোন-কিছুর প্লাবন যখন আসে প্রচণ্ডতার বেগ নিয়ে, তখন তার মধ্যে থাকে না শুধু ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্যেরই লীলা, থাকে সৃষ্টির প্রসন্নতা ও উচ্ছল গতিও। সৃষ্টি ও ধ্বংস আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও একে অপরের পরিপূরক, একের বিলীনতা ঘোষণা করে বরং অপরের কল্যাণময় অভ্যুদয়। তাই সৃষ্টি ও বিনাশ, উত্থান ও পতন, জন্ম ও মৃত্যু— এ' দুটি দ্বন্দ্বধারা মৈত্রীর সন্ধানে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে, এক মুহূর্তের জন্যও তাদের বিরাম নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই আমরা অবিশ্রান্ত ভাঙাগড়ার দ্বন্দ্বস্রোত,—সৃষ্টি ও নাশের নৃত্যলীলা। বিদ্রোহের বহ্নিশিখা তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত না থাকলেও জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা তাঁর মধ্যে ছিল, এবং ছিল বলেই সৃষ্টিছন্দ হোত নিত্য-নূতন ভাবে তাঁর মধ্যে রূপায়িত এবং তারি জন্য তাঁর গান ও সুর নিয়েছে স্বকীয়তার রূপ। তাছাড়া আবির্ভাব ঘটেছিল কবির এমনি একটি যুগে যখন নূতনের ছদ্মবেশে পুরাতন সৃষ্টি করে চলেছে তার অচলায়তনের রূপ, গতানুগতিকতার ধারা করেছে পঙ্গু ও শক্তিহীন সমগ্র সমাজের কলেবর, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ-

লিপ্সা মানুষের স্বকীয় ও দেশীয় ভাবকে করেছে লাঞ্ছিত এবং মুঘল আমলের ধারা একাধিপত্য বিস্তার করেছে তার দরবারী মেজাজ ও রসহীন টেকনিক নিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই যেন নব-জাগরণের দূতরূপে বাঙলার শস্যশ্যামল মাটিতে, এবং নূতন অভিযানের বারতা ও সৃষ্টিশক্তি নিয়ে এসেছিলেন তিনি বাঙালী সংগীত-সাধকদের সমাজে।

পরিবর্তনময় সেই যুগের সকল প্রভাবের উন্মুক্ত আলো-বাতাসেই রবীন্দ্রনাথ অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর অনাবিল কৈশোর জীবন। যৌবনের পদার্পণে তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি পতিত হোল ভারতীয় সংগীতের মহান্ আদর্শের দিকে। নবচেতার জাগ্রত প্রেরণা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন তিনি সৃষ্টি-অভিযানের পথে। পূর্বেই বলেছি যে, কিন্তু তাই বলে পুরাতন কোন-কিছুকে অনাদরের- দৃষ্টি দিয়ে করেন নি তিনি বর্জন, কিংবা প্রতিভার নব-নব-উন্মেষশালিনী উন্মুখতাকে বলিদানও দিলেন না পুরাতনের পাদপীঠে। সংরক্ষণ, সংযোজন ও মিলন—এই তিনটি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হোল তাঁর গান-রচনার অভিযান। বিবর্তনী-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি চির-দিনই এবং একের মাঝে বৈচিত্র্যের নব-বিলাসের ছিলেন পরম-উপাসক। তাই ভারতের ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের প্রচলিত সংগীতধারাকে অকুণ্ঠ-ভাবে তিনি করেছিলেন অনুসরণ।

গান-রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তী জীবনে সে সৃষ্টিধারা হোল আরো উৎসারিত ও দিগন্তপ্রসারিত, এবং খুঁজে পেলেন তিনি সৃষ্টিতে এক মৌলিকতার রূপ। কথায়, সুরে, তালে ও নৃত্যভঙ্গিমায় দিলেন তাই নিজস্ব সৃষ্টির পরিচয়। আবার ভারতের সকল দেশের, বাঙলার সকল শ্রেণীর ও এমনকি বিদেশের সংগীতবৈশিষ্ট্যের করলেন মিলন-সাধন তাঁর সংগীত-রচনায়। স্বাধীন অথচ মিলনের বিকাশভঙ্গি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো তাই তার গান, তাঁর কথা ও সুরের মাধুর্য, তাঁর কাব্য সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি। রচনার পথও হোল নূতন দিকে উৎসারিত।

সাধারণত নূতন যা-কিছুর দৃষ্টি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন প্রাচীন-পন্থীরা। কিন্তু তার অর্থ এ' নয় যে, প্রাচীনের অভ্রান্ত আদর্শ ও সংস্কৃতির যাঁরা পথচারী তাঁরাই হন নূতন পথের প্রতিবন্ধক। বরং একথাই সত্য যে,

পুরাতনের তথা সনাতনের উদার, উন্নত ও কল্যাণময় সকল-কিছুই নূতনের পথকে করে সচল, সবল ও উজ্জ্বল।

মুঘল-দরবারের প্রভাবে পরিপুষ্ট পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের বিকাশ ভারতীয় সুরসৃষ্টির পথকে কোনদিনই করেনি বিকৃত ও মলিন; বরং মুঘলপূর্ব মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশী-সংগীতের কলেবরে আরব ও পারস্য উপাদানের মিশ্রণ ভারতীয় সংগীতকে করেছিল পরিপুষ্ট ও সবল। খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে ভুটান (ভোটান—ভোটদেশ) থেকে ভোট্ট বা বোট্টরাগ, কাবুল থেকে ককুভা, গান্ধার থেকে গান্ধার বা গান্ধারী, কর্ণাট থেকে কর্ণাটী (পরে কানাড়া), দক্ষিণদেশ থেকে দাক্ষিণাত্য, গুর্জর থেকে গুর্জরী প্রভৃতি দেশীয় ও জাতীয় সুরের মিশ্রণ বা সঞ্চয়ন অভিজাত দেশীগানকে মলিন না করে বরং করেছিল সতেজ ও প্রাণবান। তাছাড়া সমসাময়িক রুচি ও পরিবেশেরও আছে একটা সার্থকতা ও মূল্য। তাই প্রাচীনপন্থী বলতে আমরা বুঝি সংকীর্ণ ও অগ্রগতিহীন ধারার পরিপোষকদেরই, কেননা নূতন চলার পথকে করেন তাঁরা অবরুদ্ধ, লক্ষ্যের মধ্যে থাকে না তাঁদের কোন অভিনবতা ও স্বকীয়তার রূপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন গতিরুদ্ধতার পরিবেশের বিরুদ্ধে, নচেৎ সুন্দর আদর্শবাহী কল্যাণময় যা-কিছু প্রাচীন, তাদের মানকে সমুন্নত করেছিলেন তিনি শ্রদ্ধার সমাদর দিয়ে।

অগ্রগামী কালের নবসৃষ্টি ও বাংলাগানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন: "আগামী কালের নব-নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাৎ করে রেখে দেয়, খাঁচার পাখীর মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্য বাহবা দাবী করি। নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকলবাঁধা সাক্রেদী করতে পারব না। তানসেনকে সেলাম করে বলব—ওস্তাদজি, তোমার যে পথ, আমারও সেই পথ, অর্থাৎ নবসৃষ্টির পথ। বাঙলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী, তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাঙলাদেশে আজ নতুন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্তানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুল রক্ষা করতে

পারবে না—তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে"।

আসল কথাও তাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবসৃষ্টিপথের অভিযাত্রী, দাগাবুলোনোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি কোনদিনই। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে সকল দিকেই তিনি পেয়েছিলেন নূতন ইঙ্গিতের আহ্বান, অথচ পুরাতনের যা-কিছু সুন্দর সে-সকলকেও গ্রহণ করেছিলেন তিনি অভিনব সৃষ্টির আকুলতা নিয়ে।

এখন দেখা যাক্, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির ধারা রূপায়িত হয়েছিল কিভাবে ক্রমবিকাশের পথে। সকল জিনিসেরই আছে রূপায়ণ এবং সে রূপায়ণ সার্থক হয় ক্রমবিকাশের ভিতর দিকে ভাঙাগড়ার পথে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানতঃ পাঁচটি বিকাশের স্তরকে নিয়ে পরিপুষ্ট, এবং সেই পাঁচটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে তাঁর গান-রচনার ক্ষেত্র হয়েছিল প্রসারিত। পাঁচটি স্তরের ক্রমপরিণতি তাঁর রসসিঞ্চিত গান বা সংগীতকে করেছিল ফলফুলে শোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত।

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ঐ পাঁচটি স্তর কল্পনা করা হয় কবিগুরুর গান-রচনার ধারার বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন সময়কে উপলক্ষ্য করে, নচেৎ রচনা ও নবসৃষ্টির গতিরুচ্ছলতা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তাঁর লেখনীতে সচল ও মুখর হয়ে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাংগ হিন্দুস্তানী সংগীতদৃষ্টিসম্পর্কে আমাদের কিছুটা আলোচনা করা উচিত, কেননা উচ্চাংগ হিন্দুস্তানী সংগীতের পরিবেশের মধ্যে থেকেই তিনি নবসৃষ্টির প্রেরণায় বাংলাগান-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। হিন্দুস্তানী উচ্চাংগ সংগীতকেও তিনি ভালবেসেছিলেন অন্তর দিয়ে একথা সকলেই জানেন, কেননা হিন্দুস্তানী সংগীতের সুরচেতনাই তাঁর জীবনপ্রভাতে এনেছিল সাড়া এবং দিয়েছিল গান-রচনায় অনুপ্রেরণা। হিন্দুস্তানী সংগীতপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "হিন্দুস্তানী সংগীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি—আজ বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া উচিত।* * সুতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্তানী সংগীত যখন সত্যিই সংগীতের একটি মহৎ বিকাশ তখন সেটা

যদি তোমাদের কারও ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো—লাগল না, বোলো ও-রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করিনি বা করবার সময় পাই নি, নইলে লাগত নিশ্চয়ই"।

হিন্দুস্তানী সংগীতের অরসিকদের প্রতি এ' কটাক্ষ তাঁর সমজদারের মতোই কথা এবং ঐ সমালোচনা তিনি করেছেন তাঁর অন্তর দিয়ে। কেননা ভাল যা বা সুন্দর যা, চিরদিনই তা ভাল ও সুন্দর, সুতরাং তার অমর্যাদা হবার অপমানকে তিনি সহ্য করেন নি কোনদিনই। তাই তিনি আবার বলেছেন: "উৎকৃষ্ট হিন্দুস্তানী সংগীত আমি ভালোবাসি, বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে, কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে"। এই মোহমুক্তির কথাটির মধ্যে'আছে রবীন্দ্রনাথের উদার নবসৃষ্টির ইঙ্গিত। তিনি বারবারই বলেছেন যে, পুনরাবৃত্তির পথে কোনদিনই হয় না নূতন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত। তাই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে পুরাতন সৃষ্টিকেও আমাদের সমাদর দিতে হবে নূতন সৃষ্টির গতিকে বেগবান ও পরিপুষ্ট করার জন্য। এরই জন্য স্বকীয়তার দৃষ্টি থাকবে সকল-কিছু অনুশীলনের পিছনে এবং গতানুগতিক দৃষ্টি ও মনোবৃত্তি হবে নিবৃত্ত। হিন্দুস্তানী সংগীতের প্রসঙ্গে এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন: "তাজমহল আমার ভালো লাগে বলেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটিতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনই হতে পারে না! হিন্দুস্তানী সংগীত ভালো লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ' একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুব ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই বলে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়"।

পূর্বেই বলেছি যে, হিন্দুস্তানী সংগীত ও তার আদর্শকে ছোট করার দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে হিন্দুস্তানী সংগীতানুশীলন থেকে নিবৃত্ত হবার কথা বলেন নি, বলেছেন Renaissance বা নবজন্মের সার্থকতাকে সমাদর দেবার জন্যে। তারি জন্যে তিনি বলেছেন: "তবে প্রশ্ন ওঠে, অজন্তা থেকে তাজমহল থেকে হিন্দুস্তানী সংগীত থেকে আমরা কি পাব? না, প্রেরণা—ইনস্পিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না, নবসৃষ্টির"?

এই নবসৃষ্টির রূপায়ণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদা সচেতন। পুরাতনের পাশে নূতন, আবার নূতন হবে পুরাতন এবং সেই নূতন-পুরাতনের প্রেরণাই আনবে আরো নূতন সৃষ্টির আকুলতা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন : "আমিও এই কথাই বলে আসছি বারবার যে, নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক না কেন—মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই—বাঁধা-শড়ক গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরাগলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী—আর মুক্তি কেবল নবসৃষ্টির পথেই, গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ"।

তাই হিন্দুস্তানী সংগীতের মরমী ও একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি বর্তমান হিন্দুস্তানী সংগীতের ক্লাসিক রূপ ও গতিকে বলেছেন সর্বাঙ্গসুন্দরতার পারফেকশন, কিন্তু অচল প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা সৃষ্টির বুকে আনে না সচলতা, বরং আনে 'স্থিতির অচলায়ন'। তারি জন্যে হিন্দুস্তানী বীণাপাণির শবাসনকে তিনি চেয়েছেন টলাতে। নূতন ভাষায় নূতন গান রচনা করে সাহিত্যে ও সুরে আনতে হবে নূতন মিলনের চেতনা। তাই তিনি বলেছেন : "হিন্দুস্তানী বীণাপাণি শবাসনা,—তাঁর এ' আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দৃশ্য। সে মরমে বাংলা-গানে দেখ, হিন্দুস্তানী সুরই তো পনেরো আনা। কাজেই কেমন করে মানবো যে বাংলাগানের সঙ্গে হিন্দুস্তানী সংগীতের দা-কুমড়ো-সম্পর্ক। বাংলাগানে হিন্দুস্তানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে একথা ভুললে তো চলবে না। আমরা তো বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্তানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকার বিরুদ্ধে, তার আনন্দবোধের বিরুদ্ধে নয়,—কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্তানী গানের রাগ-রাগিণীদের প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। * * হিন্দুস্তানী সুরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন ?"

এরই জন্যে হিন্দুস্তানী সংগীতের একান্ত দরদী হয়েও রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্তানী গানের অনুকরণে ও অনুসরণে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের সহযোগ নিয়ে রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন উচ্চাংগ ধরনের বাংলাগান। রচনা করেছিলেন বাংলা ধ্রুবপদ, খেয়াল প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার প্রথম স্তরে পাই—ধর্মসংগীত, ধ্রুপদীঢঙের গান,

প্রাচীন বাংলাগান প্রভৃতি। এই স্তর বা যুগের লক্ষ্য ছিল, প্রচলিত ধারার অনুবর্তন করা—যাকে অনুকরণ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তানসেন, বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, বিলাস সেন, ধোঁধি খাঁ, অচরজ ও এমন কি নবলকিশোর প্রভৃতির রচিত প্রসিদ্ধ দরবারী ধ্রুবপদগানের ছন্দের অনুকরণে তিনি অনেক বাংলাগান রচনা করেছিলেন। রাগ ও তাসের অনুকরণও ছিল অব্যাহত। তখন রচনার মধ্যে তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার দিকে, তর্জমার দিকে ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথার মাধ্যমে সংগীতামোদীদের উচ্চাংগ তথা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের পরিবেশনের দিকে।

এরপর তাঁর রচনা পদার্পণ করলো সৃষ্টিবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে। এখানে তাঁর বিরাট সংগীতপ্রতিভার কথাই উল্লেখ করব সংক্ষেপে। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যেন অখণ্ড একটি যুগের অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক। তাঁর গান-রচনার দ্বিতীয় স্তরে এলো য়ুরোপীয় ধারার অনুকরণে ভারতীয় সুরের প্রবর্তন ও তা' রূপায়িত হোল কতকটা 'বাল্মিকীপ্রতিভা'-গীতিনাট্যে। আইরিস মেলোডিজ, তেলেনা ও গোলামনবীর টপ্পা এবং কিছু কিছু রাগদারী গানের মিশ্রণে সৃষ্টি হোল এই স্তরের গানরচনা। এখানে অনেকটা বাক্যানুসারী হোল সুর, অর্থাৎ সুরের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করলো কথা বা সাহিত্য। বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, জারি ও সারিগানের এখানে বিকাশ থাকলো অত্যন্ত কম, রামপ্রসাদী ও বিলাতী সুরের আধিপত্য থাকলো বরং একটু বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন নিত্য-নূতন আসর জমে উঠেছিল হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল দরবারী সংগীতের। আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জমায়েৎ হতেন খানদানী উস্তাদরা কলকাতার সহরে। বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বসতো আসর, সারা কলকাতায় সৌখীন-রুচির সমাজে সৃষ্টি হোত উৎসুক-আলোড়ন।

মুসলমান উস্তাদদের সঙ্গে সঙ্গে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি গুণীদেরও সুরের হাট বসতো জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। হুগলিজেলায় উস্তাদ রসুল-বক্সের শিক্ষকতায় স্বনামধন্য রামদাস গোস্বামী প্রভৃতি গুণীরা বাঙলায় দরবারী সংগীতের আসর জমিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে ও শ্রীরামপুরে। কিন্তু সে-প্রভাব পড়েনি রবীন্দ্রনাথের ওপর—যতটা পড়েছিল বিষ্ণুপুরের

প্রভাব। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যদুভট্টের পরম-অনুরাগী। জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে ধ্রুবপদের প্রাত্যহিক আসর তাঁর সংগীতচেতনায় কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি! বরং একথা বল্লে ভুল হবে না যে, তিনি মানুষ হয়েছিলেন একরকম দরবারী সংগীতেরই পরিবেশের মধ্যে, আর তারি জন্য গোড়ার দিকে হিন্দী-ধ্রুবপদের হুবহু বাংলা তর্জ্জমা বা তারি অনুকরণে রচিত বাংলা ধ্রুবপদগানের সৃষ্টি হোল কাব্যসৌন্দর্য ও রসানুভূতির পরিপূর্ণতা নিয়ে। ধ্রুবপদগানের কথায় শুধু সুরের প্রাধান্যই থাকলো না, থাকলো সাহিত্য ও কাব্যসুষমারও গরিমা।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের মামুলি ধারার অনুশীলন বিদ্রোহ সৃষ্টি করলো রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর গান-রচনার প্রথম স্তরে সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কলাবতী (কালোয়াতী) গানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য এবং দেশজ গান ও সুরের মাধুর্য তাঁর অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করলো এক অভিনব জাগরণ। বিলাতি কবি টমাস ম্যুরের (Thomas Moor) 1779—1852, আইরিস মেলোডিজ আনলো তাঁর প্রাণে নূতন সাড়া সেকথাও আগে বলেছি। বিলাত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইরিস গানের সৌন্দর্যানুভূতির পেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাই প্রথম স্তরে ধ্রুবপদগান-রচনার পর তিনি ভারতীয় বৈঠকিগান ও ভক্তিরসাত্মক রামপ্রসাদীর সঙ্গে বিলাতি সুরের করেছিলেন সংমিশ্রণ এবং তারই নিদর্শন বহন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যখানি[১] সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। তিনি বলেছেন: "এই দেশী ও বিলেতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাঁহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যদিকে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। * * সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেক গান বৈঠকিগানভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলেতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের

১। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ইংরাজি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়।

বৈঠকিগানের তেলেনা-অঙ্গের স্বরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে—এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে"।

বাল্মীকিপ্রতিভার পর 'মায়ার খেলা'[২] ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য জন্মলাভ করেছিল ঠিক একই ধারাকে অনুবর্তন ক'রে। 'কালমৃগয়া' আত্মনিবেদন করেছিল পরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা-র কাছে। 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটির প্রকৃতি ও ধারা ছিল একটু ভিন্ন রকমের, তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কালমৃগয়ায় নাট্য মুখ্য ছিল না, গীতই ছিল প্রধান। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের উপরে তার নির্ভর নয়, হৃদয়াবেগই তার প্রধান উপকরণ। মায়ার খেলা গীতিনাট্যটির মৌলিকতা বরং বেশী ছিল বাল্মীকিপ্রতিভার চেয়ে। এর পর 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' এবং বৈষ্ণব-পদকর্তাদের ছন্দ ও স্বরমাধুর্যের অর্ঘ্য নিয়ে[৩] আত্মপ্রকাশ করলো কবির 'ভানুসিংহের পদাবলী'। তাতে গানের ধারা হোল কিছুটা পরিবর্তিত। ক্রমবিকাশের পথ ধরে সে নিলো স্বকীয়তার রূপ নূতন পরিবেশের মধ্যে। বন্ধনমুক্ত স্বর ও দ্যোতনা কবিপ্রতিভাকে করলো মুগ্ধ ও আনন্দমুখরিত।

এখানে 'জীবনস্মৃতি' থেকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'কালমৃগয়া' নাটক বা গীতিনাট্যগুলির রচনসম্বন্ধে কবির নিজ বর্ণনার কিছু পরিচয় দেওয়া ভাল মনে করি। কবি 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-সম্পর্কে বলেছেন: "হার্বাট স্পেন্সারের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু স্বর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে স্বর থাকে।* * স্পেন্সারের এই

২। ইংরাজী ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মিসেস পি. কে. রায়ের অনুরোধে 'সখী-সমিতি' নামক মহিলা সমিতির জন্য এটি লেখা হয়েছিল। বেথুন কলেজে এর প্রথম অভিনয় হয়।

৩। 'রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব'-পর্যায়ে পরে এ'গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

কথাটা মনে লাগিয়াছিল। * * * বাল্মীকিপ্রতিভার গানসম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম 'কালমৃগয়া'। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই"।

এক্ষণে নাটক বা গীতিনাট্যের প্রয়োজনে গানের জন্মসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। * * সুরগুলো যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। * * এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা"।

গান-রচনার দ্বিতীয় স্তরের ক্রমবর্ধিত রূপে অথবা তৃতীয় স্তরে এলো পুরোপুরি বাঙলাদেশের প্রভাব। তখন গানে সুরের প্রাধান্য দিলো দেখা, আর কথা থাকলো যেন বাহক বা অনুচররূপে। বিষ্ণুপুরী ধ্রুবপদগানের প্রেরণাই গানের ধারাকে করেছিল তখন নিয়ন্ত্রিত।

চতুর্থ স্তরে সৃষ্টি হোল কাব্যধর্মী গান। কথা ও সুরের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তখন দেখা দিলো ভাবের প্রাধান্য। এটি নৃত্যনাট্য-রচনারও ছিল যেন শ্রেষ্ঠ যুগ। চিত্রবহুল গানের রূপায়ণও দেখা দিলো ঠিক এই সময়েই।

তৃতীয় স্তরের শেষের বা চতুর্থ স্তরের গোঁড়ার দিকে জাতীয় সংগীতের হোল অভ্যুদয়। আবার ঠিক এ'সময়েই ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য নিয়ে কথা ও সুরের মধ্যে সৃষ্টি হোল মিলনের আবেদন। বাউল, ভাটিয়ালী, জারি ও সারি গানের মন্দাকিনীধারা হোল উৎসারিত। সারিগান—'এবার

তোর মরাগাঙে বাণ এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরী,' বাউল—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে', ও ভাটিয়ালী—'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি। পদ্মানদীর পাগল-করা ঢেউরের উপর দিয়ে নৌকার দাঁড়ের তালে তালে ছল্ ছল্ সুমধুর শব্দছন্দ আজও যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে কবির রচিত সারিগানের মধ্যে।

'চিত্রাঙ্গদা'-নৃত্যনাট্যের রূপায়ণও হোল এই নবসৃষ্টির যুগে। চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যনাট্যে মিলিত হয়েছিল বিচিত্র নৃত্যছন্দের ভঙ্গিমা। এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে চয়ন ও অনুপাত ছিল বিচিত্র রকমের। নায়ক-নায়িকা ও পুঞ্জের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিল যথাক্রমে দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি, লক্ষ্ণৌয়ের একক-নৃত্য ও অসমীয়া-মণিপুরী নৃত্য। কিন্তু সর্বোপরি একথাই স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেছিল সকল দেশেরই নৃত্য-সৌন্দর্যের ছায়া। অথচ তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যে ছিল যথেষ্ট সংযমের ভাব। যে নৃত্যনাট্যে যে যে নৃত্যের সমাবেশ থাকা দরকার, সেগুলিকে বেছে নিতেন তিনি সূক্ষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় দিয়ে। তাই দেশী সেরাইখেল, রাইবেঁশে, গম্ভীরা, গাজন, কাজরী, চৈতী এবং জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যভঙ্গিমা ও সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পাশ্চাত্য নৃত্যছন্দের লালিত্যও তাঁর কল্পনালোককে সমৃদ্ধ ও সুষমায়িত করেছিল। 'চিত্রাঙ্গদা'-নৃত্যনাট্যের (ক) 'রোদনভরা এ'বসন্ত,' (খ) 'এ' বধু, কোন্ মায়া লাগলো চোখে' প্রভৃতি গানে অসমীয়া বন্‌গীত ও বড়্‌গীতের ছায়াস্পর্শকে অস্বীকার করা যায় না। তবে সব-কিছুকেই নিজস্ব করে নেওয়ার কৃতিত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। কোন গানে, নৃত্যে বা গীতিনাট্যে একঘেয়ে কোন ভাব ও প্রভাবকে প্রকাশ পাবার সুযোগ দেন নি তিনি কখনো। মিশ্রণে সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য-সৃষ্টির তিনি ছিলেন চিরদিনই পক্ষপাতী। তাই 'চণ্ডালিকা'-নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয়বারের অভিনয়ে তিনি তাঁর কতকগুলি গানে এনেছিলেন কিছুটা পরিবর্তন,—যেমন এনেছিলেন তাঁর বাংলা টপ্পাগানে গোলাম নবী ও নিধুবাবুর টেকনিক্‌কে ঠিক ঠিক অনুকরণ না করেও। তারপর 'চণ্ডালিকা'-র নৃত্যরূপে তিনি সংমিশ্রণ এনেছিলেন সত্য, কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য-দু'টির মতো সে মিশ্রণ নয়। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাটে মণিপুরীনৃত্যেরই ছোঁয়াচ ছিল বেশী, কিন্তু তাহলেও তার lightness বা হালকা ভাবগতিকে তিনি ঠিক আবার

মানিয়ে নিতে পারেন নি। তারি জন্যে নূতন রূপ-পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিলাভ করলো তাঁর লিখনীতে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। শ্যামায় তিনি সংমিশ্রণ এনেছিলেন প্রায় চিত্রাঙ্গদারই মতো। নানান্ দেশের নানান্ নাচের টেক্‌নিক হোল মিশ্রিত তাঁর 'শ্যামা'-নৃত্যনাট্যে। বিচিত্র চরিত্রের ভাব ও গতিকে পরিস্ফুট করার জন্যে তিনি অনুকরণও করেছিলেন দক্ষিণদেশীয় কথাকলি, ভরতনাট্যম্, এবং অসমীয়া-মণিপুরী ও কথক প্রভৃতি নৃত্যপদ্ধতি।

গীতি-রচনার পঞ্চমস্তরে দেখা দিল প্রধানতঃ শান্তরসাত্মক গান। 'সম্মুখে শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার' প্রভৃতি উদাস-করুণ অথচ শান্ত-রসপূর্ণ গানগুলি বিকাশ লাভ করেছিল ঠিক এই স্তরেই। কবির মন তখন রঞ্জিত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় লোকের অপার্থিব সুষমায়।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার সময়, বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি-অনুযায়ীই অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের আলোচক রচনার স্তর বিভাগ করেছেন। পূর্বেই প্রথম পরিচ্ছেদে 'রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিদগ্ধ সাহিত্য-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার চারটি স্তর বিভাগ করেছেন। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর গ্রন্থে চারটি স্তরভাগ স্বীকার করেছেন। শ্রীশুভগুহ ঠাকুরতা 'রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা'-গ্রন্থে তিনটি স্তরের পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "রবীন্দ্রনাথের ৬১ বছরের সমগ্র সংগীত-সৃষ্টি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, গঠন-বৈচিত্র্যের বিবেচনায় রবীন্দ্রসংগীতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বা যুগ প্রবহমান। * * ১৮৮১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়-কালকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ কাল।* * ১৯০০—১৯২০ সালের অন্তর্বর্তী সময়-কালকে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যযুগ বলা যায়। এই সময়কালের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করলেন মাত্র, অর্থাৎ হিন্দুস্তানী সংগীতের কেবল কাঠামোটি বজায় রেখে আতিশয্য ও অলঙ্কার-বাহুল্যকে বর্জন করলেন এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে ; গানের কাব্যাংশ যেখানে সুরকে প্রভাবিত করতে সুরু করেছে। * * ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পরবর্তী একুশ বছর হল রবীন্দ্রসংগীতের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শেষ যুগ। * * এই স্তরের রচনায় রবীন্দ্রনাথ মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন

করলেন,—যে রচনায় ওস্তাদীর চেয়ে অনুভূতিই হল প্রধান,—যে সংগীতে রাগ-রাগিণী ও কাব্যরসের হল গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম"।[১]

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত "রবীন্দ্র-সংগীতের ভূমিকা"-গ্রন্থেও আমরা রবীন্দ্র-সংগীতের রচনার তিনটি স্তরবিভাগ লক্ষ্য করি। তাঁরা 'রবীন্দ্রসংগীতের স্বরবিন্যাস' পর্যায়ে বলেছেন: "যদিও সূক্ষ্ম বিচারে রবীন্দ্রনাথের এই স্বরবিন্যাসকে পর্ব-বিভাগে নির্ভুলভাবে ভাগ করা যায় না, তবুও তিন যুগে মোটামুটিভাবে স্বর-বিন্যাসের তিনটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি"। "ধ্রুপদ ও খেয়ালে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর প্রথম যুগের গানে যে স্বর বসালেন তা তালে-মানে-লয়ে একেবারে শুদ্ধ। * * দ্বিতীয় স্তরের সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির মধ্যেই একটু নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করেছেন। * * তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় যুগের গানগুলির মধ্যে নানারকম রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের সঙ্গে কথার এবং ভাবের যথোপযোগী সমন্বয়, গতির ছন্দ,—সব জড়িয়ে এমন একটি জিনিস পেলাম যা নিত্যকালের সম্পদ হয়ে রইল"।[২] তাছাড়া সূক্ষ্মবিশ্লেষক শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীসুবিনয় রায়, শ্রীজয়দেব রায় প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীতের পথচারীরা রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র বিষয় নিয়ে সকল মতের করেছেন আলোচনা, এখানে সে সমস্তেরই আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবে একথা অতীব সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের স্বজনপ্রতিভার মনোবৈজ্ঞানিকী ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করেই তাঁর সংগীত-রচনার স্তরবিভাগ কল্পনা করা হয়েছে। আসলে কিন্তু স্তরবিভাগ কাল্পনিক, কেবল রচনার ধারা ও প্রকৃতিকে সহজ বুদ্ধিতে বোঝার জন্যেই বিভাগপদ্ধতিকে স্বীকার করা হয়েছে। আমরা এ'গ্রন্থে নানান্ দিক থেকে পাঁচটি স্তরবিভাগ কল্পনা করেছি পাঁচটি রচনাপ্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে। নচেৎ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-তে সাক্ষ্য পাই যে, যখন তাঁর সাত-আট বৎসর মাত্র বয়স, তখন থেকেই কবিতা-রচনার সৃষ্টিচেতনা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়। কিছু কিছু গান রচনাও তিনি করেছিলেন কবি ও সাহিত্যিক নামে প্রশংসিত হবার বহু পূর্বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি লিখেছেন, একবার

১। 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা' (১৩৫৯) পৃঃ ৩-৭

২। 'রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা' (১৩৬৫), পৃঃ, ২৯—৩৬

মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে তিনি অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে একটা গান—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। রয়েছে নয়নে নয়নে'। সে গান হারমোনিয়মের সঙ্গে শুনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবিকে পাঁচ-শ টাকার একটি চেক উপহার দিয়েছিলেন।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন পিয়ানো বাজিয়ে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করতেন তখন তিনি ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সেই সদ্যো-জাত সুরগুলিকে কথা দিয়ে বেঁধে রাখতেন। আর এ' বেঁধে রাখার অর্থই হোল রবীন্দ্রনাথ গান-রচনার কাজে ঠিক সে সময় থেকেই নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। নিজেও জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন : "গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল"। তারপর বিলাত যাবার আগে আমেদাবাদে শাহিবাগের প্রাসাদে যখন তিনি ছিলেন তাঁর মেজদাদার সঙ্গে, তিনি লিখেছেন, তখন "ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে"।

মোটকথা আমরা তাঁর গান-রচনার প্রথম স্তরে যে অনুকরণ ও অনু-সরণাত্মক নীতিতে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ ও ধর্মসংগীত বাংলাভাষায় রচনার আভাস দিয়েছি তার পূর্বেও যে বিচিত্র রকমের গান তিনি রচনা করেছিলেন একথা নিজেই 'জীবস্মৃতি', 'ছেলাবেলা' প্রভৃতি লেখায় স্বীকার করেছেন এবং সেগুলিকে আমরা কোন স্তরবিভাগের মধ্যে স্থান দেই নি। কবি নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য-রচনার প্রেরণায় পর্যায়ক্রমে যে সকল গান রচনা করেছিলেন নাটকের প্রয়োজনে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইচ্ছার ইঙ্গিতে ও নির্বাচনে, সেগুলিকেই আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি মাত্র স্তর-বিভাগের মধ্যে।

সুতরাং কবির গান-রচনায় ক্রমবিকাশের ধারা ফুটে উঠেছিল নূতনতা ও অপূর্বতার সরস ছন্দমাধুর্যকে নিয়ে, মামুলি চলাপথের অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে অচলায়তন সৃষ্টি করার জন্যে নয়। তাঁর গানে মিলিত হয়েছিল বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর ও বিচিত্র ছন্দের গতি। স্বাধীন মন নিয়ে রচনা করেছিলেন তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন প্রকৃতির গান—পূজা, প্রেম, আত্ম-নিবেদন, প্রণতি ও প্রাকৃতিক ঋতু-বিবর্তন—গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, শরৎ,

হেমন্ত ও বসন্ত প্রভৃতির অনুযায়ী। পূজার নিবেদন নিয়ে একটি গান, যেমন—"প্রভু, তোমার লাগি আঁখি লাগে"। নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েও রবীন্দ্রনাথ অবিরাম আনন্দানুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তাই তাঁর গানে অজানার অন্ধকারে ফুটে উঠেছে আশার, সৌন্দর্যের ও ভালবাসার আলোক, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি তাঁর প্রাণের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের প্রণতিও হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট। না-পাওয়া ও না-চাওয়ার অনাবিল আনন্দের স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়ার মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতো জগতে আরো কতজন আছে জানি না, তবে তাঁর সচল আদর্শ যেন সবল ক'রে রেখেছে আজিও বাঙলার শুধু নয়, ভারতের সমাজ-মন ও প্রাণকে। তিনি জগৎমন্দিরে বিশ্বপিতাকে আরতি জানাইয়াছেন বিশ্বজোড়া মন নিয়ে চন্দ্র-তারকার প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং সে দায়িত্ব নেবার দুঃসাহস ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বিরাট ও অকুণ্ঠিত ছিল তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা। তাঁর প্রাণের পূজা ও আরতি তাই পৃথিবীর চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকতে পারেনি, বিস্তৃত হয়েছে তা বিশাল বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গনে। তিনি উৎসারিত প্রাণ নিয়ে তাই গেয়েছেন,

> তাঁহারে, আরতি করে চন্দ্র তপন,
> দেব মানব বন্দে চরণ—
> আসীন সেই বিশ্বকারণ,—তাঁর জগত-মন্দিরে ॥

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন বর্ষার কবি—যদিও আরতি জানিয়েছেন তিনি সকল ঋতুকেই।

ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষার ঝর ঝর জলধারার গান কবির কাব্য-কল্পনালোকে বিরাট বেদনার আবেগ জানিয়েছিল। তাই বর্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কথা ও সুরের অর্ঘ্য সাজিয়ে গেয়েছেন,

> মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে,
> * * *
> পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।[১]

১। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'রবীন্দ্রসংগীতের দার্শনিকতা'-আলোচনায় তাব গানেব মর্মরহস্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মেঘের ঘনঘটার সমারোহে শাল-তাল-তমালের নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জকে কল্পনা করেছিলেন তিনি তাঁর উদাসভরা চিন্তাকে মধুময় ও রসসিঞ্চিত করার জন্যে। শুধু তাই নয়, ঝড়ের রাতে তিনি বিশ্ববিধাতার অভিসারকে সচেতন করেছিলেন ভীষণতার মধ্যে অপার্থিব কোমলতাকে ফুটিয়ে তুলে আলো-অন্ধকারের পারস্পরিক মিতালীর মতো। শীতের কাঁপন-দেওয়া বাতাসে মানুষের জীবন অবগুণ্ঠিত ও কুণ্ঠিত ছিল, তিনি তাকে নববসন্তের জাগরণ দিয়ে জাগ্রত করেছিলেন। পলাশফুলের মেলা বসিয়ে তিনি মানুষের দুঃখ ও রোদনভরা অন্তরের আনন্দ ও অনুরাগের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। কাব্যকানন ও সুরলোকের কী যাদুকরই না তিনি ছিলেন! সঙ্গীত-রচনার ক্রমবিবর্তনের পথে ভাব ও কল্পনার কত-কিছু বিকাশ যে তাঁর মধ্যে হয়েছিল তার ইয়ত্তা করা যায় না। ভাষা, ছন্দ ও কাহিনীর সংগে সংগে গান, সুর ও রস যেন তাঁর বিকাশশীল সচল রচনার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে সার্থক হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গানে পাই আমরা সার্বজনীনতার আকুতি ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তিনি ভালোবেসেছিলেন সমগ্র বিশ্বকে ; তিনি তাঁর প্রাণের অনুভূতি বিলিয়ে দিয়েছিলেন সকল দেশের সকল জাতিকে ; সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর বিশ্বজোড়া হৃদয়কে। তবুও রবীন্দ্রনাথের মুখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বাঙলা মায়ের প্রতি আকুল হৃদয়াবেগ, বাঙলাদেশের প্রতি নিবিড় অনুভূতি ও ভালোবাসার ভাব। তিনি গেয়েছেন,

> আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি,
> চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার
> প্রাণে বাজায় বাঁশি।
> —প্রভৃতি

রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গান-রচনায় ফুটে উঠেছে তাঁর স্বপ্ন ও সোহাগভরা বাঙলাদেশের,—বিশেষ ক'রে 'শান্তিনিকেতনের আশেপাশে পল্লীশ্রীর ছবি : সেখানকার গাছপালা নদনদী মাঠঘাট রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথ, আর শিলাইদহের পথঘাটের চিত্র এবং ইছামতী ও পদ্মাচরের ও পদ্মার দু'ধারেয় সবুজ ছবির স্মৃতিকথা। অথচ ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি সারা দুনিয়ার

দেশ এবং সকল দেশের সৌন্দর্যরেখা আঁকা ছিলো তাঁর হৃদয়ের স্মৃতিপটে। তাই বর্ণনায়: বিশ্বকবি হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আসলে বাঙলা মায়েরই সোহাগের সন্তান।

ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়েছেন কবি অকুণ্ঠিত চিত্তে। তিনি বলেছেন,

এ' ভারতে রাখো নিত্য প্রভু
তব শুভ-আশীর্বাদ।

ভারতের সর্বসাধারণের উপর কল্যাণ-কামনা তাঁর ছিল প্রাণের বস্তু। তাই ভগবানের অমোঘ আশীর্বাদ তিনি প্রার্থনা করেছেন বিশ্বশান্তির জন্যে সদা সর্বক্ষণই।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে মনুষ্য-জীবনের চাক্ষুষ পরিচয়ের কথা। কেবলি কলাচাতুর্যের একজিবিশান্ নয় তাঁর গান। দরবারী উচ্চসংগীতকে তিনি পরবর্তী জীবনে বরদাস্ত করতে পারেন নি শুধু তার প্রাণহীন বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্যে। তিনি বলেছেন, অলংকারের চাপে প্রাণের প্রতিমা স্বর-সরস্বতীর মূর্তিও ম্লান হয়। তিনি তাই অন্তরের পূর্ণরূপকে প্রকাশ করার ছিলেন চিরদিন পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রস ও ভাবসিঞ্চিত গানের চরমলক্ষ্য ও আদর্শের কথাই বলেছেন[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় সঙ্গীতের অধ্যাত্ম ভাবের মর্মকথা। সংগতিহীন পর্যাপ্ত তানের চাপে গানের প্রাণ ও ধর্ম কিভাবে নষ্ট হতে পারে তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করলাম—যা প্রকাশিত হয়েছে প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায়ের লেখনীতে। তাঁর 'বিগত দিন' আলোচনাটিতে উপেন্দ্রবাবু লিখেছেন,

"দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে জলসার আয়োজন। সুলেখক সুপণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সুগায়ক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি ভারতবিদিত। সমস্ত অভ্যাগতগণ জলসায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তান-বাঁট-সর্গম সহকারে রবীন্দ্রনাথের গান সাবেকি.খেয়ালি চালে গাওয়া চলে না—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। সেই মতের অভ্রান্ততার বিষয়ে পরীক্ষা হবে সেদিনের বৈঠকে।

১। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'রবীন্দ্র-সংগীতের মর্মবোধ ও আদর্শ'-সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

"উৎসুক শ্রোতার আসর পরিপূর্ণ। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরে সুরেন্দ্রনাথ দস্তুরমাফিক খেয়ালি চালে দুটি রবীন্দ্র-গীতি গাইলেন—'আমার পরাণ যাহা চায়' এবং 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। সমগ্র জনতা আত্মহারা হয়ে সে দুটি গানের অপূর্ব সুরবিন্যাস শুনলে।

"গান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেমন লাগল—বলুন?'

"আনন্দোজ্জ্বল মুখে রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন : 'চমৎকার'।

"হাসিমুখে সুরেন্দ্রনাথ বললেন : 'তবে?'

"রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন : 'প্রত্যেক গানের মজলিসে আপনি যদি খেয়ালিচালে আমার গান করেন, আমি খুশী হব সুরেনবাবু। কিন্তু সুরের তানের সঙ্গে গানের কল্পনার মিলন বজায় রেখে মাধুর্যের অবতারণা করতে পারে—আপনার মতো এমন সুর-রসিক কজন আছে বলুন? সুরের অসুর-দের হাতে পড়ে তানের চাপে আমার গান প্রাণ হারাবে—এই আমার দুশ্চিন্তা"।

মোটকথা, তাঁর গানের সহজ সরল আবেদনের উপর দিয়ে দরবারী ক্লাসিক্যাল গানের তান-বাঁট-অলংকারের রোলার চালানোর কবি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই নবসৃষ্টির পরিচয় পাই আমরা তাঁর সংগীতে এবং ক্রমবিকাশের পথে তাঁর সংগীত-রচনা বিচিত্র সুর, তাল ও ভাবব্যঞ্জনা নিয়ে অগ্রসর হলেও ক্ল্যাসিক্যালের কসরৎকে তিনি কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি এবং পারেন নি বলেই দরবারী গায়কদের সভায় তিনি যেন অপাঙক্তেয় হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সংগীত-সাধনার রাজ্যে তিনি সাদর সম্ভাষণই পেয়েছেন বলে আমরা মনে করি। তিনি নিজেও বলেছেন যে, সংগীতের আসল উদ্দেশ্য সুরের বাহাদুরী দেখানো নয়, পরন্তু গানে রস ও ভাব সৃষ্টি করাই তার লক্ষ্য। প্রকৃতির মর্মস্থলে যে গভীর জীবন-সমস্যার বীজ নিহিত রয়েছে, তাকে আবিষ্কার ক'রে ফল-ফুলে সুশোভিত করা ও অধ্যাত্মভাবের অনুভূতিতে পরমরহস্যময় সত্য-শিব-সুন্দর ভগবানের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করাই হলো গানের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর সংগীতে সরল হৃদয়াবেগের স্থান দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে। সংগীতে তাঁর এই আবেগ পার্থিব দুঃখকষ্টজনিত নয়—তা অপার্থিব ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি

ঐকান্তিকী আকুলতা ও বিশ্বাতীত ভাবের বেদনা। হৃদয়াবেগই মানুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, আর প্রাণে আসক্তি-রিক্ততার সংগে সরলতার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও গানের কথায় উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক বিলাসিতার স্থান নেই, বরং আছে প্রাণ ও মনের দুয়ারে কথা ও সুরের সমান সহানুভূতিপূর্ণ আবেদন। তারি জন্যে তাঁর গান পায় সবার অন্তরে সাড়া ; তাই তাঁর গান বিচিত্র রুচির সঙ্গে রচনা করে এক নিবিড় যোগসূত্র, আনে শান্তি ও সান্ত্বনা এবং সমাজের সমষ্টি দৃষ্টিকে করে আকর্ষণ। নির্বাচিত গুটিকয়েকের জন্যে তাঁর গানের আবেদনকে তিনি সৃষ্টি করেন নি। নিয়ম-শৃঙ্খলে ভারাক্রান্তও নয় তাঁর সংগীত ; বন্ধনমুক্তির আকুলতা ও মিলন-মৈত্রীর আকুতি নিয়েই বরং তা আত্মপ্রকাশ করেছে সর্বসাধারণের দরবারে।

আনুমানিক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঠিক ঠিক ভাবে নৃত্যপ্রচেষ্টার সুরু হয় শান্তিনিকেতনে,—যদিও এর আগে থেকে তার প্রেরণা ছিল সুপ্ত রবীন্দ্রনাথের মনে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : " 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়-কালে বালকদলের গানের সঙ্গে আনন্দে নাচ ও অন্ধ বাউলের বেশে গানের সঙ্গে গুরুদেবের নিজের নাচ শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের নাচের কয়েকটি ভাল উদাহরণ"। রবীন্দ্রনাথও নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে ভারতের ও এমনকি বাইরেরও কিছু কিছু নৃত্যছন্দের মিশ্রণে শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে প্রচেষ্টাকে নিজের মধ্যে জাগ্রত রেখেছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর থেকে একজন নর্তক আনানো হয় ও তাঁর নাম নবকুমার। 'নটীর পূজা' অভিনয়ে মণিপুরী-নৃত্যের থাকলো সহযোগ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশ ও জাপান-ভ্রমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীও তাঁর মনকে আকৃষ্ট করে। গিয়েছিলেন জাভা, বলি প্রভৃতি বৃহত্তর-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে এবং সেই সেই স্থানের নৃত্যছন্দও তাঁর সৃজনশীল মনে স্পন্দন সৃষ্টি করে-ছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর (৩রা পৌষ ১৩৩৩) তিনি য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন শান্তিনিকেতনে। ১২ই মাঘ মাঘোৎসবের পরদিন কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' অভিনয় হোল। কবি স্বয়ং উপালির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ও শ্রীমতীর ভূমিকায় গৌরীদেবীর নৃত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাছাড়া নটীর পূজার নৃত্য-গীতসমন্বিত সাধনা তাঁর "মনকে

গভীর তত্ত্বালোকে লইয়া চলিল"। ক্রমশঃ "কবির পূজা পৌঁছিল নটের গুরু নটরাজের সৌন্দর্য-লীলা-নিকেতনের উৎসব-বেদীমূলে। নটীর পূজার পর নটরাজের ধ্যানারম্ভ। ইহাই হইল কবির নূতন সাধনা"।

এভাবে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নটরাজ' ঋতুরঙ্গশালার হোল সৃষ্টি। শ্রদ্ধেয় প্রভাত বাবু লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ নটরাজ-সম্বন্ধে যে বিরাট কল্পনাকে সাহিত্যে রূপ দিলেন, তাহার প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মূর্তি ও দক্ষিণী নটদের নৃত্য দেখিয়া বহু পরিমাণে উদ্বোধিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। মণিপুরী নৃত্যছন্দ 'নটীর পূজা'-য় ও ভরতনাট্যম্ নটরাজের মধ্যে মূর্তি লইয়াছে। মাধুর্যে বীর্যে উভয়ই সুন্দর"।[১]

তিনি পুনরায় লিখেছেন: "এই সময় হইতে কবির একশ্রেণীর গান বিশেষভাবে নৃত্যাশ্রয়ী হয়; আর নৃত্যও হয় সংগীত-অপেক্ষী। সেই দিক হইতে 'নটরাজ' রচনা (১৩৩৩ ফাল্গুন) বাংলাসাহিত্যে বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে"।[২] 'নটরাজ'-গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন: "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম"। রবীন্দ্রনাথ এভাবে নটরাজ-পালাগান বা নৃত্যসম্বলিত গীতিগ্রন্থরচনার মর্মকথা প্রকাশ ক'রে ভারতীয় নৃত্যধারার অন্তরের কথাই প্রকাশ করেছেন। তারি জন্যে তিনি বলেছেন: 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া', 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু; পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জিরে বাজিল চন্দ্রভানু'।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষ্যকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত বসু এ'প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন: "প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন ও মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সমস্ত জড় ও প্রাণের মধ্যে কোথাও ছেদ নাই। পুরাতন'ও জীর্ণকেও সে বহন করিয়া চলে না। নূতনকেও অমর করে না। মুক্তি ও বন্ধন অলখসূত্রে বাঁধা:

১। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড (১৩৫৯) পৃ: ২০৫

২। ঐ, পৃ ২০৬

'প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্যসূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে'।

"এই দৃষ্টির আলোকে কবির চক্ষে ঋতুর প্রবহমানতা (continuity) —গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের পুনরাবর্তন। * * বর্ষা-মঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঋতুর বন্দনা গান হইয়াছে। 'নটরাজ' ঋতুরঙ্গশালায় সকল ঋতুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি-গতি, বন্ধন-মুক্তির পারম্পর্যের মধ্যে সমন্বিত করিয়া মুক্তিতত্ত্বরূপে কবি দেখিতেছেন। * * 'ফাল্গুনী'-র সময় হইতে নানা ফুল-ফল-নদী-গিরির মাধ্যমে কবি গান গাহিয়াছেন; 'বসন্তে' ঋতুপূজার বিকাশ ও 'নটরাজ' তাহার পূর্ণতা। 'ঋতুরঙ্গশালা'-র পর হইতে 'বৃক্ষবন্দনা'—ক্রমে পরিপূর্ণ 'বনবাণী'-রূপে উদ্‌গীত হইল"।[১]

গানের সঙ্গে নৃত্যের সহযোগ ক্রমে নিবিড় হোতে থাকে শান্তিনিকেতনে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যান ইংলণ্ডে এবং সেখানে ব্যালে-নৃত্য শুধু উপভোগ নয়, তার করণ-কৌশলের কিছু কিছু করেছিলেন অনুশীলন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে কবি প্রত্যাবর্তন করেন ভারতে এবং শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় শুধুই বিদেশী নৃত্যের কারণ-কৌশল নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত নৃত্যের ও লোক-নৃত্যের ঘটালেন সংমিশ্রণ। সিংহলীয় নৃত্যকলার সহযোগও বাদ পড়লো না শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা থেকে। মোটকথা নাটক ও অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনভাবে যেমন গান রচনা করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন নৃত্যসম্বলিত গান রচনা। তাঁর গানের সঙ্গে নৃত্যের প্রয়োগমাধুর্য ও আবেদন ছিল সচল ও প্রাণবান।

১। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ ২০৬-২০৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধ্রুবপদ-ধামার গান এবং রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদগান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদগানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা, আর এক-দিকে আত্মদমন, সংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা"। সত্যই সাধক রবীন্দ্রনাথ কলাবতী ধ্রুবপদগানের মহত্ত্ব ও মাধুর্যকে প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করেছিলেন, কেননা তাঁর গান-রচনার গোড়ার দিকে তিনি ধ্রুবপদগানেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন : "ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্তানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি"।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বিচিত্র উৎসবের আয়োজন লেগে থাকত অনবরত, সে সব উৎসব-অনুষ্ঠানে সময়োচিত গান রচনা করা হোত এবং বেশীর ভাগ ধ্রুবপদ ও ধামার গানই ছিল সে সকল উৎসবানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। রসবিলাসী রবীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেমেয়েদের দলে গলা মিলিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতেন সেই সব উচ্চাঙ্গের গান। মোটকথা ধ্রুবপদগান গাওয়া ছিল যেন তখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের জলবায়ুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদানি-করা ধ্রুবপদগান বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের পরিবেশ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ও পরে তার বিকাশক্ষেত্র বোধহয় বাঙলাদেশেরই মর্যাদার কৃতিত্ব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। এখনও সেই স্বকীয়তা বাঙলাদেশ বজায় রেখেছে বললে অসংগত বলা হবে না।

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের ভিতর দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুস্তানী-সংগীতের পথচারী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। তাঁর রচিত (১) বিহগড়ারাগে (তাল সুরফাক্তা)—"ব্রহ্ম সনাতন, তুমি হে নিখিলপালন,

নিখিলতারণ নিখিল-জন-মঙ্গলকারণ" (২) [illegible]রাগে (ঝাঁপতাল)—"বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব-সুন্দর, অরূপ সে রূপ হেরি, আনন্দে হও মগন"; (৩) সিন্ধুড়ারাগে (চৌতাল)—"কেন আনিলে গোঁ এ' ঘোর সংসারে জগতজননি, দূর কর ভয়, ভীত যে আমি"; (৪) সিন্ধুবিজয়রাগে (রূপক)" "ঐ দেখা যায় আনন্দধাম, দিব্য-শোভন, ভব-জলধির পারে—মহাজ্যোতিস্মান" প্রভৃতি গান বাংলা ধ্রুবপদগানের ভাণ্ডারে এখনো অমর হয়ে আছে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের নটনারায়ণরাগে (চৌতাল)—"হৃদয়চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তিদাতা; শান্তি-পীযুষবারি হে বরিষ বরিষ"। হেমেন্দ্রনাথের শঙ্করাভরণরাগে (চৌতাল)—"আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি, হৃদাকাশ মাঝে কত চন্দ্রমা বিরাজে,"। সত্যেন্দ্রনাথের খাম্বাজরাগে (তাল-ফেরতা)—"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান-মন-প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান" প্রভৃতি গান ক্ল্যাসিক্যাল তথা কলাবতী সংগীতরুচিরই সাক্ষ্যদান করে। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ভক্তিরসাত্মক ধ্রুবপদাদি সংগীতের একান্ত সমঝদার। উপাসনা ও উৎসবে রচিত তাঁর গানগুলি আজও সাধকের মানস-মন্দিরে দেদীপ্যমান রয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গ ও সহায়তা লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে জীবনে। 'গঙ্গাতীর'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন: "বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। * * আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গাজলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম-যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পুরবী-রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত"।

এ'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনাকর্মের পরিচয়াংশ হ'লেও তাঁর সংগীত-জীবনের উপাদান। বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র পরিবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সংগীত-রচনার প্রেরণা। তা ছাড়া বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতির কাছে সংগীতশিক্ষায় পেয়েছিলেন প্রেরণা সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সংগীতজ্ঞানী বিষ্ণু চক্রবর্তী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সংগীতজ্ঞানী হিসাবে মর্যাদা দিতেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও বিষ্ণুপুরের যদু ভট্টকে। বাঙালার তানসেন যদু ভট্ট-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন: "বাঙলা-দেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি অরিজিন্যালিটি (originality) ছিল—যাকে আমি বলি স্বকীয়তা"। রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্ যদু ভট্টের এমনই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, অন্যান্য প্রসিদ্ধ হিন্দুস্তানী সংগীত-রচয়িতাদের মতো যদু ভট্ট তথা রঙ্গনাথের[১] বাহাররাগে হিন্দী ধ্রুবপদ-ভজনটিকে অনুসরণ ক'রে একখানি বাঙালা গান রচনা করেছিলেন। যদু ভট্ট তথা রঙ্গনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এ' দু'জনের রচনার মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য ও ছন্দ-মাধুর্য ছিল। যেমন—

(১) অজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর
বসন্ত মেঁ;
হর-মকুর-পর যুথ মধুপ মদহর
নিরত কর রব কুঞ্জমেঁ॥

প্রভৃতি—(রঙ্গনাথ)

(২) আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ,
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,
চাহে—তোমারি পানে আনন্দে হে॥

প্রভৃতি—(রবীন্দ্রনাথ)

প্রাচীন হিন্দী ধ্রুবপদ ও ধামার গানের অনুকরণ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন এবং তাতে ক'রে

১। যদুভট্ট, 'রঙ্গনাথ' নাম সম্পর্কিত ক'রে অনেক ধ্রুবপদগান রচনা করেছিলেন। এর নিদর্শন দেওয়া আছে এ'গ্রন্থে।

বাঙলাভাষাভাষী শ্রোতা ও শিল্পীদের কাছে ধ্রুবপদগানের ভাষাগত অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করার পথকে যে শুধু তিনি সুগম ও সচল করেছিলেন তা নয়, বিশুদ্ধ ও উচ্চাংগ সংগীতের বাণী-রচনায় তথা কাব্যলোকে এক অভিনব রসানুভূতির ধারাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। গানের কথার সঙ্গে সুরের পারস্পরিক একটা মিতালীর সম্বন্ধ অবশ্যই থাকে, সুতরাং শ্রোতা ও শিল্পী দুজনেরই উচিত সেই সম্বন্ধকে জানা ও বুঝা এবং তবেই সংগীতের বিকাশ ও রূপায়ণ হয় সার্থক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কথা ও সুর এদুটি সংগীত-বিহংগের যেন দুটি পাখা। পাখা-দুটির সাহায্যেই সংগীতের গতি হয় উচ্ছল, নচেৎ একটির অভাবে অপর পাখা শুধু নয়, সংগীত-বিহংগই হয় পঙ্গু। হিন্দীগানের বাণী-রচনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে দৈন্যের নিদর্শন,—রচনা যেন কাব্য-সরস্বতীর দিব্য-আশীর্বাদ লাভ থেকে থাকে বঞ্চিত। সৌন্দর্যসেবী রবীন্দ্রনাথ সেখানে করেছেন নূতন দিকদর্শন! কথার বা রচনার দৈন্যকে করেছেন তিনি ছন্দসম্ভার দিয়ে ঐশ্বর্যময়, তাতে বাঙলা-ভাষার মান ও মহিমা হয়েছে চিরসমুন্নত ও উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষ্ণুপুরধারার অনুবর্তী। বিষ্ণুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরাণায় সংগীতের ছিল একটি নিজস্ব ঢঙ্ ও একটি নিজস্ব গতি। রাগে ও বিকাশভঙ্গিতে ছিল একটু পৃথক ও বিশিষ্ট ভাব,—যদিও তার সৃষ্টির উৎস ছিল পশ্চিমী ঘরাণার সংগীত। রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে অসংখ্য গান রূপায়িত হয়েছে বাঙলার বিভিন্ন শিল্পী ও কবির লেখনীতে এবং এখনো সে রচনার ধারা রয়েছে অব্যাহত। কিন্তু একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গানে সুর-যোজনায়ও হয়েছে বিচিত্রতার সৃষ্টি, তালও করেছে সে বিচিত্রতাকে অনুসরণ। কাজেই সুর তথা রাগ ও তালের প্রকাশভঙ্গির বিচিত্রতায় সকল সংগীতে হয়েছে ঘরোয়ানা বা ঘরাণার সৃষ্টি। বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতিসম্পন্ন সমাজে এ'ধরনের বৈচিত্র্য দেখা দেওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। সম্রাট আকবরের সময়ে কেন, তার পূর্ব থেকেই চার রকম বাণীর মাধ্যমে ধ্রুবপদ চার রকম গায়কীপদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গৌড়ীহার বা গোবহার, ডাগুর বা ডাগর, খাণ্ডার ও নওহার চারটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা অঞ্চলের শিল্পীরত্নের মাধ্যমে প্রকাশ পেলো চারটি

গায়কী ঢঙ্ বা গায়কীপদ্ধতি। অবশ্য এর সংগে রীতি, বৃত্তি, রসাদিরও সম্পর্ক ছিল। বৈদর্ভী বা বৈদর্ভিকা, পাঞ্চালিকা, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি, কৈশিকী, আরভটী, সাত্ত্বত্যভিখ্যা প্রভৃতি বৃত্তি এবং শান্ত, শৃঙ্গারাদি রস পদ্ধতিবৈচিত্র্যের সৃষ্টির পক্ষে কতকগুলি কারণ বটে। তবে বিভিন্ন স্থানের বা শিল্পীর বিকাশভঙ্গির পার্থক্যই ঘরোয়ানা-সৃষ্টির পিছনে মূলকারণ। মোটকথা গানের জগতে গুরু ও শিষ্যপরম্পরা ধারারও স্থান আছে, আর তাই থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব-ঘরোয়ানা বা গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা ষ্টাইল। দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র, বুন্দি, অযোধ্যা, রেওয়া, লক্ষ্নৌ প্রভৃতি অঞ্চলে হোত উচ্চাংগ সংগীতের বিশেষ অনুশীলন। তানসেনের পুত্র ও কন্যা-বংশীয়েরা দিল্লীর দরবার ছেড়ে ছড়িয়ে পড়লো ক্রমে ভারত ও বাঙলার বিভিন্ন দিকে। পূর্ব ও পশ্চিম সীমানায় উপস্থিত হয়ে একই দরবারী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হোল প্রধান দুটি ভাগ। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশ এবং জলবায়ু গানের বিকাশে নিয়ে এলো কিছু কিছু ভিন্নতা। বাঙলাদেশেও এলো পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন গুণী, তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন বিষ্ণুপুরে, কৃষ্ণনগরে, কলকাতায়, হুগলীতে, শ্রীরামপুরে, মুর্শিদাবাদে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে। পশ্চিমী সংগীতের ধারা বাঙলার মাটিতে পেলো এক নূতন রূপ ও জীবন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গদাধর চক্রবর্তী, শ্যামচাঁদ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতগুণীদের নাম বাঙলার সমাজে আজ সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ প্রভৃতি গুণীরা দরবারীগানের আসর জমাতেন, আর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতে তাঁদেরই গানের অনুরণন বেজে উঠতো আনন্দের উচ্ছ্বাস ও ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে।

গান-রচনার গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের কবি-মন ধ্রুবপদ ও ধামারের দিকেই একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল ও তারি জন্যে দরবারী হিন্দীগানের অনুকরণ ক'রে এবং স্বাধীনভাবেও কাব্যসুষমামণ্ডিত অসংখ্য বাঙলা ধ্রুবপদ ও ধামার-গান তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য 'ধ্রুবপদ' বলতে সাধারণভাবে আমরা যেমন চৌতাল, সুরফাঁকতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি সম ও বিষম তালের গানগুলিকে গ্রহণ করি, রবীন্দ্রনাথও সে ধারারই অনুসরণ করেছিলেন

—যদিও ধ্রুবপদগান বলতে একমাত্র চৌতালের গানকেই গ্রহণ করা সমীচীন। বাকী তালের গানগুলি পাখোয়াজের সঙ্গে গাওয়া হোত বা হয় বলে তারাও ক্রমশঃ ধ্রুবপদগানগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ গানের সব-কিছু বিষয় বিষ্ণুপুরী গায়কী-পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছেন এবং একথাও উল্লেখ করেছি যে, বিষ্ণুপুর-সংগীতপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে ঋণী পশ্চিমী শিল্পী-সম্প্রদায়ের কাছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, বিষ্ণুপুরের অনেকগুলি রাগ-রাগিণীর রূপে বা কাঠামোয় এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাঙলাদেশের মাটি ও জলবায়ুই সে পরিবর্তনের জন্য দায়ী কিনা প্রাচীন বৈষ্ণব-পদকর্তারা বোধহয় এ'কথার উত্তর দিতে পারতেন। বাঙলাদেশে স্বকীয় প্রতিভা ও সৌন্দর্য-রুচির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক-কিছু অভিনবত্ব সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির বসন্ত, ভৈরব, রামকেলী, পুরবী, বেহাগ, ললিত, আশাবরী প্রভৃতি রাগ বাঙলার বুকে নিয়েছে এক নূতনতার রূপ, অথবা বাঙলার রসানুভূতি ও মৌলিক দৃষ্টিই করেছে তাদের মধ্যে সত্যকার রহস্যের উদ্‌ঘাটন। বাংলা ধ্রুবপদ ও ধামার গান-রচনার বেলায় রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন সুরে ও ঢঙে সোজাসুজিভাবে বাঙলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। তাই বসন্তরাগে দিয়েছেন তিনি শুদ্ধধৈবতের সমাবেশ, ভৈরবের অবরোহণে দিয়েছেন কোমল-নিষাদের মৃদুস্পর্শ, রামকিরি বা রামকেলীতে বর্জন করেছেন তীব্র-মধ্যমের ছোঁয়াচ, পুরবীকে প্রকাশ করেছেন শুদ্ধ-ধৈবত ও কোমল-ঋষভের মাধ্যমে, বেহাগের কারুণ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিহঙ্গড়া বা বেহাগড়ার কোমল-নিষাদ দিয়ে।[১] ভাব ও রসের অনুভূতিই অবশ্য চাক্ষুষ ও নিবিড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সকল রকম গানে। সারল্যের ভিতর দিয়ে অপার্থির গাম্ভির্যের অনুভূতিই হয়েছে তাঁর গানের প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্য। ধ্রুবপদ ও ধামার-গান রচনা করেছেন তিনি অনেকাংশে ক্ল্যাসিক্যালের ঢঙ্ ও কাঠামোকে বজায় রেখে বটে, কিন্তু অলংকারের জাঁকজমক ও বাঁটের আতিশয্য, আলাপের বাহুল্য ও ব্যাকরণের বাঁধাধরা শাসন সেইসব গানের মধ্যে রাখেন নি। অ্যারিস্টোক্রেটিক আদবকায়দার পরিবর্তে মানুষের অন্তরে সহজে ও সোজাসুজিভাবে সাড়া আনার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের গান

১। এ'সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

নিয়েছে যেন দায়িত্ব। তাতে ক'রে তাঁর ধ্রুবপদ ও ধামার-গানে সত্যকারের গতিকৃচ্ছ্রতা, সরলতা ও গাম্ভীর্য থেকেছে অক্ষত শরীরে বজায়, অথচ পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয়নি অচলায়তনকে সৃষ্টি ক'রে।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার-গানের পূর্বপরিবেশ ও অন্তরবাহ্ প্রকৃতির আলোচনাই করা হোল এতক্ষণ। এখন তাঁর রচনার চাক্ষুষ কিছু নিদর্শন দেবার চেষ্টা করবো সংক্ষেপে। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার-গানের কতকগুলির নমুনা। যেমন,

॥ কবি-রচিত ধ্রুবপদগান ॥

(১) ভৈরবী—চৌতাল

কেমনে ফিরিয়া যাও, না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির-অন্ধকারে ॥—ইত্যাদি

(২) মিশ্রকেদারা—চৌতাল

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে, কোন্ জনে করে বঞ্চিত।
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা অন্তরে আছে সঞ্চিত ॥—ইত্যাদি

(৩) বড়হংস-সারঙ্গ—চৌতাল

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব, বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বকারণ তাঁর জগত-মন্দিরে ॥—ইত্যাদি

(৪) নটমল্লার—চৌতাল

চিরদিবস নব-মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে,
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।—ইত্যাদি

(৫) বাহার—চৌতাল

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী নিশিদিন সুখে শোকে।—ইত্যাদি

(৬) হাম্বীর—চৌতাল

আনন্দ রয়েছে জাগি' ভুবনে তোমার,
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।—ইত্যাদি

(৭) ছায়ানট—চৌতাল

তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে।
চিত্তমাঝে দিবারাতে আদেশ তব দেহ নাথ ॥—ইত্যাদি

(৮) শঙ্করা—চৌতাল

আমারে করো জীবন-দান।
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥—ইত্যাদি

(৯) সুরট - চৌতাল

এ' ভারতে রাখ নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ,
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত-বাণী—ইত্যাদি

(১০) কানাড়া—চৌতাল

হে মহাপ্রবল'বলী,
কত অসংখ্য গ্রহ-তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু—ইত্যাদি

(১১) বেহাগ—চৌতাল

স্বামী তুমি এসো আজি অন্ধকার হৃদয়মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।—ইত্যাদি

(১২) ইমনকল্যাণ—চৌতাল

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে—ইত্যাদি

(১৩) আড়ানো—চৌতাল

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা।—ইত্যাদি

(১৪) ইমন—চৌতাল

শক্তিরূপ হের তাঁর আনন্দিত অতন্দ্রিত,
ভোলাতে ভুবলোক বিশ্বকাজে চিত্তমাঝে দিনে রাতে।—ইত্যাদি

(১৫) কেদারা—চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংসার হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে; নূতন জনম দাও হে।—ইত্যাদি

॥ কবি-রচিত ধামারগান ॥

(১) দেশ-মল্লার—ধামার

গরব মম হয়েছে প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ।

কেমনে মুখ সম্মুখে তব তুলিব আমি আজ।—ইত্যাদি

(২) হাম্বীর—ধামার

হরষে জাগো আজি, জাগোরে তাঁহার সাথে

প্রীতিযোগে, তাঁর সাথে একাকী।—ইত্যাদি

(৩) বাহার—ধামার

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,

জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।—ইত্যাদি

(৪) বেহাগ—ধামার

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়-মাঝারে,

সকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে।—ইত্যাদি

(৫) নায়কীকানাড়া—ধামার

সুধা-সাগর তীরে হে এসেছ নরনারী সুধারস-পিয়াসে।

শুভ-বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী

নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।—ইত্যাদি

(৬) পুরবী—ধামার

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।—ইত্যাদি

(৭) বেহাগ—ধামার

জাগো নাথ জ্যোৎস্না-রাতে, জাগো রে অন্তর জাগো

তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধপ্রাণে

নিমেষ-হারা আঁখিপাতে।—ইত্যাদি[১]

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ আড়াচৌতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, রূপক প্রভৃতি তালেও অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। তাঁদের ধ্রুবপদ ও

১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই গানগুলির মধ্যে কোন কোনটির মধ্যে ভিন্ন রাগ ও তালের প্রচলন আছে। তাছাড়া এগুলির মধ্যে অনেক গান হিন্দুস্তানী গানের অনুকরণে ও অনুসরণে রচিত। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ছন্দ ও রচনা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

ধামারের সংখ্যা অনেক, সুতরাং সকলগুলির অন্তর্নিবেশ করা এখানে অসম্ভব।[২]

ধ্রুবপদগানের আদিপুরুষ প্রবন্ধগান বা সূঁড়প্রবন্ধগান। 'সূড়' বলতে দেশী গীত তথা বিভিন্ন ধাতু, পদ, তাল, বর্ণ, রস প্রভৃতি সমন্বিত দেশী প্রবন্ধগান। ধ্রুবপদের ইতিবৃত্তের অবতারণা করে রচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না[৩], তবে রবীন্দ্রনাথ যে ধ্রুবপদ ও ধামার-গানের একজন দরদী রচয়িতা, সার্থকশিল্পী ও সমঝদার ছিলেন এ'কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় তাঁর ধ্রুবপদ ও ধামার গান-রচনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগের নিদর্শন দেখলে। রবীন্দ্র-সংগীতের যারা ধারক ও পরিবেশক তাঁরা যদি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের মতো তাঁর ধ্রুবপদ ও ধামার-গানগুলিকেও সর্বসাধারণের দরবারে রূপায়িত করে তোলেন তাহলে মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের পরিপূর্ণ সার্থকতা রক্ষিত হয়। ধ্রুবপদ ও ধামার-গানগুলিতে রাগ-রাগিণীদের রূপ ও সৌন্দর্য বেশ সুষ্ঠু ও সাবলীল, তাই রাগরূপের সংগে সঠিক পরিচিতি লাভের জন্যেও রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার গানগুলির অনুশীলন করা উচিত। তা ছাড়া সকল শ্রেণীব সংগীত-শিল্পীদেরও রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার-গানগুলির সাধনা ও সমাদর করা উচিত, কেননা সেগুলি ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতশ্রেণীরই অপরিহার্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার গানগুলিতে রাগরূপ, রস, ভাব, গাম্ভীর্য ও লালিত্য পুরোমাত্রায়ই বজায় আছে, যদিও প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। সহজ সরল আবেদনও তাদের মধ্যে যথেষ্ট। ভারতের সংগীত-চেতনা আবার নূতন ক'রে ক্রমশঃ উদ্দীপিত হোতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামার-গানগুলি অনাগত ভবিষ্যতের বুকে তাদের সমাদর ও শ্রদ্ধার আসন যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এতে আর সন্দেহ কি।

২। এ'সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩। এ' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের A Historical Study of Indian Music ইংরাজী গ্রন্থে ধ্রুবপদের জন্মকথার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশীগান, বাউল ও কীর্তন-রচনায় রবীন্দ্রনাথ

বাউল-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'-গ্রন্থে (২য় খণ্ড) 'স্বদেশীসংগীত—বাউল' আলোচনায় যা বলেছেন তার এখানে উল্লেখ করি। কেননা প্রতিটি রকমের (শ্রেণীর) গীতি-রচনার পিছনে থাকে রচয়িতার অন্তরের নির্দিষ্ট কোন ভাব এবং সে ভাবের প্রেরণায়ই তিনি গান রচনা করেন। তবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাও। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু লিখেছেন: "'অবস্থা ও ব্যবস্থা'-শীর্ষক প্রবন্ধপাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরিয়া গেলেন। বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন লইয়া তখন দেশময় উত্তেজনা, তাঁহার তরঙ্গ কবিকেও উতলা করিয়া তুলিল"।[১]

"বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার বাল্যকালে 'সঞ্জীবনী-সভা'-র উত্তেজনায় তিনি যে গান রচিয়াছিলেন * *, সে গানের মধ্যে এই স্বদেশী যুগের অরুণাভার দীপ্তি ছিল; গানটি সুপরিচিত—'তোমারই তরে মা সঁপিনু দেহ' (ভারতী, ১২৮৪ আশ্বিন)। কিন্তু ইহারও পূর্বে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'এঁকসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। যাহা হউক, ইহার পর প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কবিকে সময়োপযোগী তথাকথিত 'জাতীয়' বা 'স্বদেশী' সংগীত রচিয়া দিতে হইয়াছে। কলিকাতায় প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয় ১২৯৩ সালে (১৮৮৬); সভার উদ্‌বোধন-সংগীত হয় 'আমরা মিলেছি—আজ মায়ের ডাকে'; রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করিয়া স্বয়ং সভায় গাহিয়াছিলেন। এই গানটির সুর সম্পূর্ণ দেশীয় রামপ্রসাদী"।[২]

বিশেষভাবে স্বদেশীগানের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু লিখেছেন: "স্বদেশীযুগের এই গানগুলির অধিকাংশই হইতেছে বাউল সুরে বাঁধা। বাউল সুর বাঙলার নিজস্ব সুর—সম্পূর্ণরূপে লোকসংগীতধর্মী। আমরা পূর্বে

১। 'রবীন্দ্রজীবনী'', ২য় খণ্ড, ১৩৫৫ সাল, পৃষ্ঠা ১২৩

২। ঐ

বলিয়াছি—স্বদেশী-সংগীত সাধারণের সুরে গেয়; সে সুর হইতেছে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারিগানের সুর।[৩] সর্বসাধারণের কাছে ইহার বাণী সহজে পৌঁছায়, গানের সুরও সহজে মর্মকে স্পর্শ করে। * * ইতিপূর্বে দুই একটি গানে বাউলাদির সুর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশীগানের অধিকাংশই হইল দেশী লৌকিক সুরে বাঁধা। * * এই স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটি হইতেছে বঙ্গমাতার সৌন্দর্য-বর্ণনা, যেমন 'আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি'। কয়েকটি দেশ-বন্দনা, যেমন 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল'; কিন্তু অধিকাংশই হইতেছে তেজোদৃপ্ত সংগীত, যাহা জীবনের নানা সংগ্রামে ব্যবহৃত হইতে পারে"।[৪] এর পর শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু 'ভাণ্ডার' (১৩১২ ভাদ্র, আশ্বিন) পত্রিকায়, 'বঙ্গদর্শন' ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যার এবং 'বাউল' পুস্তিকায় প্রকাশিত কতকগুলি সারি, বাউল, রাখী প্রভৃতি সংগীত একা, মাতৃমূর্তি, প্রয়াস, বিলাপী-সম্পর্কিত গানের নিদর্শন দিয়েছেন।[৫]

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর (১৩১২।৩০শে আশ্বিন) বঙ্গচ্ছেদ-আইন ঘোষণা করেন তদানীন্তন ভারত-সরকার। মহামতি গোখলে কিছুদিন পরেই বারাণসী-কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি-রূপে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেছিলেন তাতে পাঁচ শতাধিক বাঙালী সমর্থন জানিয়েছিলেন। লর্ড কর্জন সে প্রতিবাদকে অসার প্রতিপন্ন করেন। মহারাজ স্যর যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ-প্রমুখ বিদগ্ধ নাগরীকরা প্রতিবাদ-আন্দোলনে যোগদান করেন। সে সময়ে সমগ্র বাঙলাদেশের জীবনে যেন এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল; সে যেন এক নবজাগরণ। সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ-রচিত রাখি-বন্ধনের গান 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই', 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' প্রভৃতি স্মরণীয় এবং স্মরণীয় সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত তাঁর নবরচিত গান,

---

৩। বাউল গান বা গীতিরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এখানে স্বদেশী সুর বলতে ঠিক বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী বা সারি-শ্রেণীর গীতিরীতিযুক্ত গানকে বুঝায় না।

৪। 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৩৫৫ সাল, পৃষ্ঠা ১২৫

৫। ঐ পৃষ্ঠা ১২৫

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে……
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে……
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

এর পর আর একটি গানের কথা মনে পড়ে,

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।
মোদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান।
—প্রভৃতি।[১]

রবীন্দ্রনাথের লেখনী বাঙলার সেই অগ্নিময় দিনে মাতৃভূমি ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বহু স্বদেশী গানই সৃষ্টি করেছিল এবং বাঙলার ইতিহাসে সে স্মৃতি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মনে হয়, বাউলগান কীর্তনের চেয়ে প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকের বাঙলাদেশে সহজ বা মানবীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরীয় অপার্থিব প্রেম-আস্বাদন-সাধনার ধারা বর্তমান ছিল। দ্বিজ চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর প্রেম-সাধনার ইতিকথা নিয়ে আজও পণ্ডিতদের ভিতর মতদ্বৈধ আছে সত্য,[২] কিন্তু 'সহজ' ভগবানের সাধক দ্বিজ চণ্ডীদাস যে পরকীয়া সাধনায় প্রেমের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ বাঙালাদেশে কেন—সমগ্র বিশ্বের দরবারে রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। চণ্ডীদাস বলেছিলেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। উনবিংশ শতকের লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অন্যভাবে এ-কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন: 'যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। সীমায়িত মানবচৈতন্য বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যেরই

১। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৭

২। চৈতন্য-পূর্ব যুগে পদাবলী-সাহিত্যের অবদান যে সকল বৈষ্ণব মহাজনগণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাসের নাম স্মরণযোগ্য। কিন্তু 'চণ্ডীদাস' নামধারী পদ-রচয়িতা ও সাধক একজন ছিলেন না। আমরা মোটামুটিভাবে তিনজন চণ্ডীদাসের নাম পাই: বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। (১) বড়ু চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা, বাসলিদেবীর উপাসক ও ছাতনার অধিবাসী; (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস 'রামী' রজকিনী-প্রেমিক সহজধর্মসাধক—বীরভূমজেলায় নান্নুরের অধিবাসী; (৩) দীন চণ্ডীদাসও বৈষ্ণবপদ-রচয়িতা এবং ঐ দু'জন চণ্ডীদাসের পরবর্তী। অবশ্য এ'নিয়েও যে মতভেদ নাই' তা নয়।

অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদীর মধ্যে ভাসমান কুম্ভের জল নদীর জল থেকে পৃথক কেবল কুম্ভের দ্বারা সীমায়িত বলে, আবরণ ভেঙে দিলে কুম্ভের জল মিশে যায় নদীর স্রোতধারারই সঙ্গে। সহজসাধক বাউলরা ভগবানের প্রেমে পাগল; তারা সান্ত দেহের মধ্যেই অনন্ত ভগবানের ধ্যান-ধারণা করে সীমার ভিতর দিয়ে অসীমের আনন্দকে আস্বাদন করতে চায়। তারা সাকারের করে পূজো, কিন্তু নিরাকারকেও করে না অস্বীকার, কেননা তারা জানে যে, সাকারের পাশেই থাকে নিরাকার, ছায়ার পাশেই থাকে কায়া। কায়া-সাধনের তারা পক্ষপাতী। তাই অনেক সময় কায়ায় যথার্থ অর্থের ভাব গ্রহণ করতে না পেরে তারা জাগতিক জড় কায়ার মোহে আবদ্ধ হয়। উপমা বা রূপকের ছায়া কিন্তু বাউলদের কাছে রক্ত-মাংসের কায়া বলেই প্রতীত। তবে আসল কথা এই যে, কায়ার তারা সাধনা করে অসীম ভগবানকে লাভ করার জন্যে।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমের সাধক; বাউলরাও তাই। তাই অনেকে বলেন, শ্রীচৈতন্য বাউলমতেরই ছিলেন পরিপোষক। আচণ্ডালকে প্রেম দিয়েছিলেন তিনি মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের মধ্যে ভগবানের অপরূপ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ক'রে। বাউলদের মধ্যে যেমন জাতের বালাই নাই, মহাপ্রভুর মধ্যেও তেমনি উচ্চ-নীচ—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলে কোন পার্থক্য ও বর্ণবৈষম্য ছিল না। তাঁর লীলাপার্ষদ ও অনুচরবর্গের মধ্যেও তাই। অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ ছিলেন তাই বাউল সাধনার সমর্থক।

বাউলমতের আলোচনায় আমরা বাউলকে সাধারণভাবে বলি বাঙলার বাউল।[৩] অবশ্য বাঙলাদেশ বাউলমতের জন্মস্থান হলেও বাঙলার বাইরেও যে বাউলমতের যথেষ্ট প্রচার ছিল আলাউদ্‌-দীন খল্‌জি ও গোপাল নায়কের সময়ও। বৈজু বাওরাই তার চাক্ষুষ নিদর্শন। 'বাওরা'-শব্দ বাউল বা বাতুলেরই অপভ্রংশ। বাউলরাও 'পাগল' অর্থে কায়ারূপ সহজ-ভগবানের জন্যে পাগল। মুসলমানদের মধ্যে সুফী-সম্প্রদায় বাউলদের মতোই পাগল বা আত্মভোলা সাধক। বাউলদের মতোই তাদের অনেকটা বেশভূষা। বাউলদের মতোই তারা নৃত্য ক'রে ভগবদ্‌সাধনা করে। মহারাষ্ট্রের সাধক জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানদেব, একনাথ এঁদের নামও উল্লেখযোগ্য।

৩। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'বাঙলার বাউল' আলোচনার প্রামাণিক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অনেকে বলেন, মহারাষ্ট্রের সাধকরা ছিলেন নাথমার্গী, সুতরাং তাঁরা যোগী। কিন্তু কায়ার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না অথবা চন্দ্র-সূর্য-বহ্নে'র সাধক বাউলরাই কি যোগমার্গী ছিলেন না?

বাউল-সাধনার আর এক নাম 'উল্‌টাসাধন'। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে অনন্তকাল ধরে যে প্রাণীমাত্রের জন্ম-মৃত্যুর চক্র পরিবর্তিত, তারই বিপরীত দিকে মুক্তির আনন্দকে আস্বাদন করার নাম 'উল্‌টাসাধন'। বাউলরা একদিক থেকে তাই যোগ ও তন্ত্র-সাধনার পথচারী। তন্ত্রে কামকলা বা কুলকুণ্ডলিনী-সাধনার কথা সুপরিচিত। মূলাধারে স্বয়ম্ভু-শিব কুণ্ডলিনীমূলে নিদ্রিত, তাঁকে নিম্নগামী না করে উর্ধ্বপথে পরিচালিত করে সহস্রারপদ্মমূলে অমৃতপান করানোর নাম ষট্‌চক্র-সাধনসিদ্ধি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ত ও মুসলমান সুফীদের ভিতরও এই সাধনার অভাব নাই সেকথা আগেই বলেছি। নাথযোগীদের উল্‌টাসাধনের কথা ভারতবর্ষের ধর্মসেবীমাত্রেই জানেন। সাধক গোরক্ষনাথ বলেছেন: 'ব্রহ্মনালে উজানে সুধিবে সুনিশ্চিত'। কাশ্মীরীয় ত্রিকদর্শনে স্পন্দবাদের মর্মকথাও তাই। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না —চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই ত্রিকোণ ও ত্রিধারার সাধনাই পরমাত্মার উপলব্ধির পথে প্রধান সহায়। ত্রিকদর্শনে পশু, পাশ ও পতি বাঙলার তন্ত্রবাদে শিব, শক্তি ও বিন্দু কথারই প্রতিধ্বনি। এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয়ে মোক্ষ লাভ হয়। বাউলদের সাধনরহস্যও তাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাউল-মতবাদেরও পক্ষপাতী এবং মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের দরদ ও অফুরন্ত ভালোবাসা। গীতাঞ্জলিতে তিনি তাই বলেছেন,

> ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্‌ পড়ে।
> রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।

মন্দিরের বেদীমূলে যদি দেবতা না থাকেন তো তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের অন্তরে, অর্থাৎ মানুষের হৃদয়-সিংহাসনেই তাঁর আসন পাতা আছে। বিশ্বজোড়া অন্তর নিয়ে বিশ্বকবি তাই আবার বলেছেন,

> তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।

—প্রভৃতি

তাঁর মতে, বিশ্বের সংগ্রামশীল ব্যথিত মানুষের অন্তরবেদীমূলেই ভগবানের সিংহাসন পাতা আছে। নিশ্চেষ্টতার সুপ্তি কোনদিনই জাগরণ আনে না, চলার পথেই মেলে লক্ষ্যের সার্থকতা। অগণিত নরনারীর দেহসীমার মধ্যে তাই রবীন্দ্রনাথ অসীমের প্রতিষ্ঠাকে উপলব্ধি করেছিলেন, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির আস্বাদন, বিচিত্র-সৃষ্টির মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন অখণ্ড ভগবানের বিকাশ। দেহতত্ত্ববাদী বাউল-সাধকরা ছিল তাই তাঁর কাছে পরমপ্রিয়। বাউলমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর *The Religion of Man* পুস্তকে বলেছেন : 'The Bauls do not believe in aloofness from, or renunciation of, any person, or thing, their central idea is *yoga*, attachment to and communion with the divine and its manifestations, as means of relization'। তিনি আরো বলেছেন : 'I have mentioned, in connection with my personal experience, some songs which I had often heard from wandering village singers, belonging to a popular sect of Bengal, called Bauls, who have no images, temples scriptures, ceremonials, who declare in their songs the divinity of Man, and express for him an intense feeling of love'। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে দূরে আকাশে মেঘলোকে কিংবা বৈকুণ্ঠের শাশ্বত সিংহাসনে দেখার পরিবর্তে নিকটে—অতিনিকটে ও প্রতিটি মানুষের অন্তর্বেদীতলে প্রেমের সম্পর্কে অতি-আপনার জন বলে উপলব্ধি করার পথনির্ণয় করেছে বাঙলার বাউলধর্ম।

সুতরাং একথা বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের প্রেম-সাধনার ছিলেন একান্ত পক্ষপাতী ; কিন্তু মনকে নিরুদ্ধ করে সীমাবদ্ধ ঘরের কোণে বসে মুক্তিলাভ করাকে তিনি বরং অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতেন। তিনি বলেছেন : 'রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার'। তিনি তাই চেয়েছিলেন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির নায়ক তাঁর জীবনদেবতাকে প্রিয়তম বলে ভালোবাসতে, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মহিমময় স্রষ্টার অফুরন্ত মাধুর্যকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে। তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে তিনি তাই বলেছেন,

যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে শুধুই বাউল বা কীর্তন কেন, বাঙলার ও অন্যান্য দেশের সংগীতধারারও মিলন ঘটেছিল। তাঁর গানের ও সুরের সার্বভৌমিক দরবারে সকল শ্রেণীর গান ও সকল রকম সুরের আদর বা সমাদর ছিল অব্যাহত।

বাউলগান যে ১১শো—১২শো বছর ধরে বাঙলার শ্যামল বুকের ওপর তার উৎসারিত ধারার প্লাবন সৃষ্টি করেছিল, বাঙলার ইতিহাস সেকথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করে। বৌদ্ধযুগোত্তর বাউলসাধনার মূল-উৎসের সন্ধান পাই আমরা ১০ম—১১শ শতকের অধ্যাত্মগোচরা বৌদ্ধ চর্যাপদের গানে ও বজ্রগীতির মধ্যে। বজ্রযান এবং সহজযান বৌদ্ধসাধকদের ভিতরও শ্রেণী ও জাতির কোন বিচারভেদ ছিল না। যে কোন লোকই সাধকরূপে 'সহজ'-সাধনার মধ্যে স্থান পেত। সহজযানী সাধকরা দেহতত্ত্বের গান করতেন সন্ধ্যাভাষায়। অনেকের মতে, চর্যা ও বজ্র-পদগীতির সন্ধ্যাভাষাই ছিল উল্‌টাসাধনার ভাষা। সুতরাং একদিক থেকে উল্‌টাসাধনসিদ্ধ বাউলদের ভাষার তা পূর্বপুরুষ ছিল বলা যায়।[১] সিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যরা যে সকল গাথা, পদ বা দোঁহা গান করতেন তাতে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর সমাবেশ থাকত, যদিও তাদের গঠন আজকালকার রাগ-রাগিণীদের থেকে বেশ একটু স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। বৌদ্ধ বজ্রযানী ও সহজযানীরা ছিলেন তন্ত্রাচারী। অনেকের মতে, বৌদ্ধ-তন্ত্রবাদ হিন্দুতন্ত্রের কাছে ঋণী। অবশ্য এর ঠিক বিপরীত মতবাদেরও প্রচলন আছে। কিন্তু সে হলো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিচারের কথা। মোটকথা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে অবশ্যই একজন অপরের কাছে ঋণী ছিল। তবে হিন্দুতন্ত্রের প্রাচীনতা বড় কম নয়। অথর্ববেদের অভিচারিক অংশ বাদ দিলে তান্ত্রিকতার বীজ

১। অবশ্য এ' সিদ্ধান্ত যে বাদানুবাদ-নিরপেক্ষ তা বলা যায় না। তবে সহজযানী বৌদ্ধদের সাধনাই যে বাঙলায় সহজিয়া-সাধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়।

তার মধ্যে নিহিত আছে। তাছাড়া অগ্রবর্তীর কাছেই পরবর্তীর ঋণ থাকে নির্ধারিত। তন্ত্রের সাধনায়ও জাতির বিচার নাই তা আগেই বলেছি। তন্ত্রেও যোগসাধনের কথা আছে। মূলাধারাদি ষট্চক্রের সাধন দেহকে বাদ দিয়ে কোনদিনই সম্ভব নয়। বাউলদের কায়াসাধনের মর্মকথা তন্ত্রের মধ্যেও নিহিত। পরবর্তী বাউলমতবাদে যোগের মতো তন্ত্রের মূলসাধনা ও সঙ্গে সঙ্গে মহাযান এবং সহজযান বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবমতও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ বজ্রযানশাখা সহজযানই ভিন্নরূপ নিয়ে বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল। সহজযানের মূল-সাধনের সংগে তাই বৈষ্ণবধর্মোক্ত সাধনার মিল আছে। বাঙলার বাউল, কর্তাভজা, গুরুসত্য প্রভৃতি সাধনাকে তাই বৌদ্ধ-সহজযানেরই রূপান্তর বলা যায়। ঐতিহাসিকরাও একথা স্বীকার করেন যে, বাঙলার বৌদ্ধধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাউলমতের মতো বৈষ্ণবমতেরও সমর্থক ছিলেন। বেদ, উপনিষৎ ও মুসলমান সুফী মতবাদগুলির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। কবির সাহিত্য ও কাব্যের রসধারা সেই মতবাদগুলিকে আরো পরিস্ফুট, আরো চাক্ষুষ ও আরো রসসিঞ্চিত করেছিল। তাঁর মধ্যে তার সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্য-দৃষ্টিরও সমাবেশ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গান তাই এতো সরস, এতো প্রাণস্পর্শী ও এতো আবেদনপূর্ণ। তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও গান জন্মলাভ করেছিল এই পৃথিবীর মাটিতে, তাদের ভাষা, ভাব ও সুরও ছিল বিশ্বগতই, কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণের বাস্তব আনন্দকে নিয়ে তারা ছিল আসলে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের মনে যে বাউলগানের পূর্ণস্পর্শ লাভ করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁরই কথার মধ্যে স্পষ্টভাবে। অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে আশীর্বাণী হিসাবে কবিগুরু যে পত্রখানি লিখেছিলেন, অধ্যাপক তাঁর 'হারামণি'-র গোড়ায় প্রকাশ করেছেন ও তা থেকে কবির অন্তরের আকর্ষণ বাউলগানের ওপর কি ধরনের ছিল তা বোঝা যায়। তাতে তিনি লিখেছেন: "* * মহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। * * আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল-

পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে—তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের সহযোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে—'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুরপরিব্যথা:',—যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে সে মরণ-বেদনা।* * 'অন্তরতম হৃদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল"।

বাউলদের ধর্মের সমন্বয়-মতের উল্লেখ করে কবি আবার লিখেছেন: "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। * * বাউল-সাহিত্যে বাউল-সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ' জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্যে এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল-গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়"।

দর্শনসম্রাট ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সঙ্গে একদিন আলোচনায়

সময় রবীন্দ্রনাথ সংগীতের কথাপ্রসঙ্গে বাঙলার বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় মুখর হোয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "* * সুরে ও বাণীতে অপূর্ব শিব-শক্তির মিলন চিরদিনই বাঙলাগানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি। কীর্তনে বা বাউলগানে ভাবের মন্দিরে এখানে (বাঙলায়) যে অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল মিলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্য রচনা করা হয়েছে। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বাঙলাদেশের সাধকরা প্রয়োজন মতো নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সংগত করেছেন"।

বাঙালীর বাউলগান বাঙলাদেশের সমাজের সুখ-দুঃখ ও সমাজবাসী মানুষেরই অন্তরের আনন্দ ও বেদনার মর্মকথা। ভগবান-পাগল বাউল মনের আনন্দে গান গায় এবং সাধনার ইঙ্গিত তার ভাষার ছন্দে ছন্দে অনুস্যূত। সে নাচে গায় সহজ সরল মরমী মানুষের মতো নিজের কায়ার মধ্যে আনন্দের লীলাবৃন্দাবন রচনা ক'রে। বাঙলার বাউলগানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মরমী সাধক রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাউলগান রচনা করেছিলেন স্বদেশ, সুখ-দুঃখঘেরা মানুষ ও ভগবান-পাগল অধ্যাত্ম পথিককে উদ্দেশ্য ক'রে। বাউলগানের সুর তথা রাগ-রাগিণীতে বাঙলার মৌলিকতাই স্থান পেয়েছে,—যেমন পেয়েছে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানে ও পরবর্তী কবি, তর্জ, পাঁচালী, গম্ভীরা, ভাটিয়ালী, জারি, সারি প্রভৃতি গানে। ক্ল্যাসিক্যাল তথা উচ্চাঙ্গ দরবারী সংগীতেও বাঙলার নিজস্বতার যে ছাপ পড়েছিল তা ঐতিহাসিকমাত্রেই জানেন। বিষ্ণুপুরে রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সংগীতের দরবার বসলো, বাঙলার কৃতীরা সংগীত আয়ত্ত করলেন, কিন্তু রাগ-রাগিণীদের রূপে ও পরিবেশনভঙ্গিতে দেখা দিল কিছুটা পরিবর্তন। বাঙালীর মস্তিষ্কই মনে হয় সকল পুরাতনের মধ্যে নূতনের দেয় পরিচয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এক প্লাবনের সৃষ্টি করেছিলেন। বাঙলার লোকগীতিকে শ্রদ্ধার সম্মান দিয়ে ভারতীয় অভিজাত সংগীতের সঙ্গে তিনি মিতালী পাতিয়েছিলেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে এবং সেই প্রেরণা ও প্রাণপ্রবাহকে ধরে আজও তাই বাঙলার শুধু নয়, সমগ্র ভারতের বুকে রবীন্দ্রসংগীত তার আসন পেতে বসেছে।

কবিগুরু বাউলগানের আলোচনা করেছেন তাঁর ***The Religion of Man***

ও বাঙলার কাব্য-পরিচয়ে, বঙ্গবীণায় ও ***Creative Unity : An Indian Folk Religion (Cal. 1928)*** নামক প্রবন্ধে। তাঁর গান-রচনার মধ্যে গোড়ার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন ক্রমবিকাশের কতকগুলি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিচিত্র রকমের রচনাশৈলীরও সন্ধান মেলে। তাঁর : (১) 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', (২) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে,' (৩) 'এবেলা ডাক পড়েছে', (৪) 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা', (৫) 'আমি কান পেতে রই', (৬) 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', (৭) 'আমি তারেই খুজে বেড়াই' প্রভৃতি বাউলগান বাঙলার গীতিভাণ্ডারে অপূর্ব সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের বাউলগানের কথায় যেমন কাব্যসম্পদ আছে, তেমনি আছে সুরের মাধুর্য ও লালিত্য। তিনি বাউলগানের ভাব নিজের জীবনের অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন যেমন বিলাস-মাধুর্যের দিক থেকে সম্রাট, তেমনি ছিলেন ত্যাগের দিক থেকেও মহাতপস্বী। দীন-দরিদ্রের ব্যথা-বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝতেন, আর বুঝতেন বলেই প্রেমে পাগল-করা বাউলগানকে করেছিলেন জীবনের অন্যতম সহায় সম্বল। বাউলদের কত গান তিনি শুনেছেন ও গুণগুনিয়ে সে সুরের নকল করেছেন, আর তারি জন্যে মরমীর জীবন নিয়ে তিনি রাজার রাজা পরমেশ্বরের—তাঁর জীবনদেবতার করুণা-ভিখারীরূপে ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর প্রাণের যেমন ছিল অসীমতা, তেমনি ছিল গভীরতা।

বাঙলাদেশের কীর্তনগানের রসধারাও কবির অন্তরে প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। বাঙলাদেশের কীর্তনের ইতিহাস অবতারণা করার এখানে প্রয়োজন নাই, কিন্তু একথা ঠিক যে, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের যুগ থেকেই কীর্তনের ধারা বাঙলার বুকে প্রবাহিত হয়েছিল।[১] সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব নামকীর্তনের প্রবর্তন করেন ও পরবর্তীকালে ঠাকুর নরোত্তম খেতরীর মহোৎসবে গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে লীলা বা রসকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বরূপ-দামোদর, মুরারিগুপ্ত, রায় রামানন্দ এঁরা ছিলেন তদানীন্তনকালে উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী। গম্ভীরার রুদ্ধ গৃহে রাগ-রাগিণীর

১। গ্রন্থকারের লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'পদাবলী কীর্তনের ঐতিহাসিক আলোচনা' দ্রষ্টব্য (—'বিশ্ববাণী' পত্রিকা, ১৩৬৪ ফাল্গুন-সংখ্যা থেকে)।

সমাবেশ নিয়ে সকলে পদকীর্তনের সুরধনীধারার সৃষ্টি করতেন। মহাপ্রভু নিজে গাইতেন ও পার্ষদেরা করতেন সেই গানকে সুরে ও ভাবে সমৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীরও আলোচনা হোত এবং মহাপ্রভু ভাবসমাধিতে সমাহিত হতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কীর্তিগাথা'-গানের নিদর্শন আছে। শ্রীভগবান বা কোন মহামনীষীর কীর্তি-সংবলিত উচ্চৈঃস্বরে গীত স্তুতিগানই পরে কীর্তনগানে রূপায়িত হয়েছিল। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাই শ্রীভগবান বা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক স্তুতিগানকে 'কীর্তন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর নরোত্তম কীর্তনগানকে অভিজাত রূপে প্রচার করেছিলেন। মোটকথা ঠাকুর নরোত্তমদাসের অভ্যুদয়ে কীর্তনগানের পরিসর হয়েছিল আরো প্রশস্ত। বাঙলার চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে কীর্তনগানের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল দিল্লী, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ বাদশাহী-সংগীতের পীঠস্থান-গুলিতেও ভিন্নরূপে। বিচিত্র তালের ভঙ্গিমা কীর্তনগানের কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছিল ও ছন্দায়িত করেছিল তার সুরকে। বাঙলাদেশের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে কীর্তনগানের রস ও ভাব হয়েছিল অনুবিদ্ধ। বাঙ্গালী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো কীর্তনগানের মর্যাদাকেও দিয়েছিলেন সমাদর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে কীর্তনগানও পেলো সমান মর্যাদা। বৈষ্ণব-পদকর্তাদের ভাব-গরিমাকে তিনি সম্মান দিয়েছিলেন অকুণ্ঠভাবেই। তিনি মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তাঁদের রচনা-লালিত্যকে এবং তাঁদের রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টির নিপুণতাকে। কীর্তনের উপর কবির যে কী নিবিড় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল তা শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত দুখানি পত্র থেকে জানা যায়। প্রথম পত্রখানিতে কবি লিখেছেন: "বাঙলাদেশে কীর্তনগানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্তানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্তানী রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রলয়রূপে সত্য হওয়া চাই"। আবার দ্বিতীয় পত্রখানিতে (২৯।৭।১৯৩৬) তিনি লিখেছেন: কীর্তন-সংগীত

আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন-সংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। * * কখনো কখনো কীর্তনে ভৈঁরো প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু মেজাজ গেছে বদলে—রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতিভার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্তানী গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে, এতে সুর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্তানীপদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সংগীতের স্বরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগ-রাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্তানী-সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র"।[১]

'আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনপ্রসংগে আবার যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বাঙলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান; এই জন্তেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এইজন্যে বাঙলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন"।

"এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ। কিন্তু সংগীত যুগ্মভাবে গড়া,—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবে এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র সে-সইতেই পারবে না"।

এরপর দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি কীর্তনসম্পর্কে আবার বলেছেন: "বাঙলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্তানী গানের প্রবল

১। 'সাঙ্গীতিকী', পৃ° ৯৭, ১০৫

অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান"।

"কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যে জন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না, দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত সেইটিই তার দেখবার বিষয়; * * মোটকথা হচ্ছে, কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর স্রোতের মতো নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র। ডোবা বা পুকুরের মতো একটি ঘের-দেওয়া পাড় দিয়ে বাঁধা নয়। কীর্তনে এই বিচিত্র বাঁকা ধারার পরিবর্তমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল"।

"কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐ ঐতিহাসিক কারণেই। বাঙলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্ম-সাধনায় বা ধর্ম-রসভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভায় আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাঙলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল। এটা বাঙলাদেশের ভূমি-প্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু নদী এক সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার জাল তৈরী করে দিয়েছে। * * কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে তুচ্ছ বলবে কে?"

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা 'ভানুসিংহের পদাবলি' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" বৈষ্ণবকাব্যের হুবহু অনুকরণ নয়, তবুও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই পদ-রচনার ছন্দ-লালিত্যের মধ্যে পাই এক সুসংগত বৈষ্ণব-কাব্যরসলোভী মনের একান্ত আকুলতা। স্বতঃস্ফূর্ত বৈষ্ণব-ভাবোচ্ছ্বলতাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি এবং পারেন নি বলেই তাঁর কয়েকটি রচনার ভঙ্গি বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচনা-সৌন্দর্যকে হুবহু অনুসরণ করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদ-নিদর্শন :

নাম সমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ ৫।১০-১১

এই পদের শব্দ-ঝঙ্কার নিয়ে কবি তাঁর নিপুণ লেখনী দিয়ে বাংলাভাষায় রচনা করেছেন—

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য,
কলয়তি মলয়ে, সুবিজন-নিলয়ে, বালা-বিরহ-বিষণ্ন।
তৃষিত নয়নে, বনপথপানে, নিরখে ব্যাকুল বালা
দেখন পাওয়ে আঁখি ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুল মালা॥
—প্রভৃতি

তেমনি গোবিন্দদাসের পদ—

আজু বিপিনে, আওত কাণ মুরতি-মুরতি কুসুমবান,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর-মোহিনী।

—ইত্যাদির মতো রবীন্দ্রনাথ লঘু-চৌপদীতে রচনা করেছিলেন,

গহনকুসুম-কুঞ্জমাঝে, মৃদুল-মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে, সজনী আও আওলো। ১

এ' ধরনের বহু রচনাসাদৃশ্যের উদাহরণ দেখানো যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'উর্বশী', 'ঋতু-সংহার', 'কুমারসম্ভবগান', 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'ভাষা ও ছন্দ', 'কথা ও কাহিনী' প্রভৃতি রচনা থেকে। চণ্ডীদাসের "কানুর পিরীতি মরণ অধিক" প্রভৃতি গানটির কথা ও ভাব-মাধুর্যকে অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো" প্রভৃতি গানটি রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়', 'শ্যামরে নিপট কঠিন মন তোর' গানগুলি বৈষ্ণব-পদগানেরই প্রতিধ্বনি। আর না হবেই বা কেন? বৈষ্ণবভাবামৃত তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, যার জন্যে তাঁর কবিতায়, গানে, সাহিত্য-রচনায় ও নাটকে সকল জায়গায় বৈষ্ণব ভাব-গাম্ভীর্যের

১। এ'সম্বন্ধে পরে আলোচিত হয়েছে 'রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব'-প্রসঙ্গে।

স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। তাছাড়া বৈষ্ণবদের বারমাস্যা তথা বারমাসের সুখ-দুঃখভরা কবিতার মতো রবীন্দ্রনাথও তাঁর ঋতুরঙ্গনাটকে ছ'টি ঋতুকে সাবলীল ছন্দে বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনগানে আখর যোজনাও করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষ ক'রে তাঁর 'ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ' গানখানিতে। তিনি তাঁর কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে নিজেও ঐ গানখানি গাইতেন। তিনি গেয়েছেন—

ওহে জীবনবল্লভ,
ওহে সাধন-দুর্লভ,
আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথা কিছু নাহি কব
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।

এরপর ভাবের আবেদনকে সমৃদ্ধ করার জন্যে তিনি এতে আখর যোজনা করেছেন এই বলে—

(১) দিনু চরণতলে—
(২) কথা যা ছিল দিনু চরণতলে—
(৩) প্রাণের বোঝা বুঝে লও—দিনু চরণতলে।
আমি কি আর কব!

কীর্তনগানে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের আবেগ ও সুরের করুণ আবেদন কি রকম ছিল, যাঁরা তাঁর নিজ কণ্ঠে গান শুনেছেন তাঁরাই জানেন। কত দরদী —কত মরমী আপনভোলা সাধকই না তিনি ছিলেন! 'ওহে জীবনবল্লভ' কীর্তনগানখানির শেষে তিনি নিজের উদ্দেশ্যেই যেন বলেছেন—

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার।
মৃত্যু আঁধারভব।

'ভবের খেলা সাঙ্গ হলে' ভগবানের চরণে তাঁকে ঠাঁই দেবার জন্যে তিনি আকুল প্রাণে তাই আবেদন জানিয়েছেন। এই নাহোলে কি আর বাঙলার দরদী কবি হওয়া যায়!

কীর্তনগানের সুর অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গান আরো অনেক আছে। তাঁর আর একখানি গান—

আমি—সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি, আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি—সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।—প্রভৃতি
তেমনি—

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি
দিবস কাটে বৃথায় হে······

'কবির পূজা ও প্রার্থনা'-পর্যায়ে এ'ধরনের অনেক কীর্তনগানের অনুকরণে রচিত গান আছে যাদের সত্যই তুলনা নাই।

কবির বাউলরূপের রেখাচিত্র এঁকেছেন সার্থকশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। নৃত্য, বেশভূষা ও ভাবের অভিব্যক্তি শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা হোলেও কবির সত্যকারের বাউল-জীবন যে তাতে রূপায়িত ও চাক্ষুষ হোয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবি সর্বজনপরিচিত বিশ্বকবি হোলেও আসলে ছিলেন বাঙলারই মরমী কবি, আর তারি জন্যে বাঙলার সরল স্বচ্ছ পরিবেশ ও শ্যামলসৌন্দর্য নিয়ে তাঁর লেখনীতে প্রাণবান হয়ে উঠেছিল বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন, জারি, সারি প্রভৃতি গানের প্রাণস্পর্শী আবেদন। সার্থক কবির কাব্য ও সুর-কল্পনা! বাঙলার শুধু কেন, ভারতের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে বিশ্বের দরবারে তাঁর গানের আবেদন সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ পাগল ও প্রেমমুগ্ধ করেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সম্পদের উপর নিজস্ব মন্তব্য ও ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনি এবং তাঁর সংগীত-মানসের অনুশীলন ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত-আলোচনার আর একটি সুষ্ঠু ও প্রামাণিক দিক আছে যেটি হোল রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে ও বিচিত্র মানসপ্রস্তুতি নিয়ে যে সব সংগীতপ্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে, পত্রিকায় প্রকাশের জন্মে এবং চিঠিপত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়ে, সেগুলিকে সমবেত ক'রে তাদের সার-নিষ্কাষণ করা। মনে হয়, সেই রস-নির্যাস রবীন্দ্রসংগীত-জ্ঞানলিপ্সুদের কাছে আদরণীয় হবে এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তাবিষয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের বোঝার পক্ষেও সহজ সরল হবে।

'রবিচ্ছায়া'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক জীবনে আমরা দেখি যে, তাঁর সংগীত-প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতসম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা জন্ম লাভ করেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংগীতপ্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলেন যেগুলি থেকে সহজেই আমরা তাঁর সংগীতচিন্তা ও ধারণার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁর সুচিন্তিত 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক আলোচনার মধ্যে 'সংগীতের সৃষ্টি ও উপযোগিতা', 'সংগীত ও কবিতা', 'সংগীতের মুক্তি', 'আমাদের সংগীত', 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান', 'কথা ও সুর', 'সংগীতবিষয়ে আলাপ ও আলোচনা', 'বাউল-গান' প্রভৃতি সংগীত-নিবন্ধ ছাড়াও পাই শ্রীদিলীপকুমার রায়, স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতির সঙ্গে সংগীতপ্রসঙ্গে কবির তথ্যপূর্ণ বিচিত্র আলাপ-আলোচনা। এসব ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রন্থ লেখা, কথোপকথন ও অভিভাষণদান-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংগীতবিষয়ে অনেক আলোচনাই করেছিলেন। মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রবীন্দ্র-শতবার্ষিক-উৎসব-উপলক্ষে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-গ্রন্থের চতুর্দশ খণ্ডে ৮৭৩ থেকে ১০১৫

পৃষ্ঠায় সে সমস্ত সংগীত-আলোচনার অন্তর্নিবেশ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনাক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন, এই 'রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা' আলোচনা ঐ সমস্ত প্রকাশিত প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েই রচিত হোল এবং সেজন্যে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-সংসদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

(এক)

ঐ আলোচনার প্রথম নিবন্ধটির নাম 'সংগীত ও ভাব'। এটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত হয়েছিল বেথুন-সোসাইটিতে উদাহরণের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে। এ' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বক্তব্য বেশ স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। তখন বাঙলার সমাজে সংগীতশিক্ষা ও সংগীতানুশীলনের এক নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে। সে জাগরণ গাঢ়সুপ্তি থেকে জাগরণ না হোলেও শৈশবের জাগরণ বলা যেতে পারে এবং সে জাগরণ ইতিহাসকে অনুসরণ বা আশ্রয় করেই সংঘটিত হয়েছিল। ভারতের সংগীত-ইতিহাস অতীব প্রাচীন। বৈদিক যুগেরও পূর্ব থেকে সংগীত-ইতিহাসের হয়েছে যাত্রা সুরু এবং ইংরাজ-রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত ছিল তার চলমানতা অক্ষুণ্ণ। অবশ্য সে চলমানতার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতকে নিয়েই শুধু নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশী সংগীতকে নিয়েও। তবে বাঙলা-দেশের সংগীতবিকাশের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র, কেননা বাঙালীজাতি চিরদিনই স্বাতন্ত্র্যের পূজারী। নিজস্ব দান ও প্রতিদানের সামগ্রীসম্ভারেই তার আপন সম্পদের হয়েছে সৃষ্টি,—তা সে সংগীতই হোক, সাহিত্য কাব্য দর্শনই হোক, আর সভ্যতা ও সংস্কৃতিই হোক।

বাঙলার সংগীতের নবজাগরণ-যজ্ঞকে আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রের বদ্ধজালে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু দিন দিন সংগীত-শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সংগীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন

হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ' বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না"।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের জাগরণ বা সংগীতশিক্ষায় নবজাগরণের কারণ নির্দেশ করেছেন সংগীত-বিষয়ে বিভিন্ন মতের আলোচনার আন্দোলনকে লক্ষ্য ক'রে শুধুই অনুকুলে নয়, ঐসব মতামতের অভ্যুদয়ের প্রতিকূলেও। সংগীত-বিষয়ে ভাল-মন্দের তর্ক-বিতর্ক বা ঘাত-প্রতিঘাত না থাকলে তার প্রাণবস্তুর জাগরণ সম্ভব নয়। সংগীতশিক্ষার গতানুগতিক ধারা অচলায়তন সৃষ্টি করে ও শাস্ত্রের নির্দেশে নিজেকে তা আবদ্ধ রাখে সংকীর্ণতার মধ্যে, সুতরাং তার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল মন প্রতিবাদ জানাতে বিরত হয়নি। তাঁর গোড়াকার দিকে গান-রচনায় ও সুর-যোজনায় যে পুরাতনের আবৃত্তি বা অনুসরণ ছিল একথা অনুশীলকমাত্রেই জানেন। কিন্তু সেই অনুকরণ ও অনুসরণ-নীতির মধ্যেও ছিল নূতন এক সৃষ্টির আকুলতা। সেই নূতন সৃষ্টির দু'কূল-ভাঙা প্রতিভাই তাঁর পরবর্তী জীবনকে স্বাতন্ত্র্য-মহিমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

স্বাধীন চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্যে বলেছেন: "এ' বিষয় (সংগীত-বিষয়) লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-দ্বতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না"। এখানে রবীন্দ্রনাথ সংগীতশিক্ষার উন্নতির মূলেও সমালোচনার উপকারিতা স্বীকার করেছেন। আবেগ ও আঘাত যতই প্রবল হয়, উন্নতির গতিবেগও তত দ্রুত হয় একথা সর্ববাদীসম্মত। সংগীতশিল্পীদেরও মনে রাখা উচিত যে, সংগীত-শিক্ষারূপ সাধনার পিছনে যদি ভাল-মন্দ সমালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত না থাকে তবে দ্রুত উন্নতির পথ হয় মন্থর অথবা অবরুদ্ধ। তাই শিক্ষা ও সমালোচনা (অবশ্য গঠনোপযোগী বা কন্‌সট্রাক্‌টিভ সমালোচনা) পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও উন্নতির সহায়ক।

সংগীতের প্রাণবস্তুই রাগ-রাগিণী। এই রাগ-রাগিণীর গঠন হয় স্বর-সজ্জায়। বিভিন্ন স্বরের একত্র সমাবেশেই রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টি। তবে রাগ-রাগিণীর যথার্থ রূপ কেবলি স্বরের একত্র সমাবেশকে নিয়ে সার্থক নয়,

তাদের পিছনে থাকা চাই এক নির্দিষ্ট ও ধ্রুব উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এ' প্রসঙ্গে বলেছেন : "রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ ব্যতীত আর ত কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনই সুরের উচ্চ-নীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। * * সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র"।

রাগ-রাগিণীদের ভাব-প্রকাশের পিছনে থাকে এক তত্ত্ব বা রহস্য। সংগীতশাস্ত্রীরা বলেন, সাংগীতিক স্বরগুলি যে সূক্ষ্মস্বরের সমবায়ে গড়ে ওঠে, সেই সূক্ষ্মস্বররূপ শ্রুতিগুলিই আসলে রসসঞ্চারী ও ভাবের পরিবাহক। নাট্যশাস্ত্রে ও অলংকারশাস্ত্রে যে শৃঙ্গারাদি আট কিংবা শান্তকে নিয়ে নটি রসের কথা ও তাঁদের প্রকৃতির বর্ণনা আছে, সেই শৃঙ্গারাদি আট কিংবা নব রসই সংগীতিক সূক্ষ্মস্বররূপ শ্রুতিতে এবং শ্রুতির সমবেত রূপে গঠিত ষড়্জাদি সাত স্বরে লীলায়িত থাকে এবং রাগ-রাগিণীরা ঐ রসসিক্ত স্বরের আরোহণ-অবরোহণ-সজ্জায়ই গঠিত, সুতরাং তারাও রসসঞ্চারী। রস ভাবের প্রকাশক। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন, রসের রূপই আস্বাদন, অর্থাৎ রসের অনুভূতিই রসসত্তার প্রকাশক। এই আস্বাদনের অপর নাম ভাবের অনুভূতি। ভাব প্রকাশ পাওয়ার অর্থই রস-নিষ্পাদনী বেদনার সঞ্চার, এবং আনন্দ, শোক, হর্ষ, জুগুপ্সা, ঘৃণা প্রভৃতি ভাবের বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে অন্তরের অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন 'রাগ-রাগিণীরা ভাবের প্রকাশক', তার অর্থই তাই যে, মানুষের ও সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থ বিচিত্র ভাবকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে সংগীত। কিন্তু আজকাল সংগীতশিল্পীরা সংগীতের এই ভাব-পরিবহনের তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ অনাদরের দৃষ্টিতে দেখেন বলে অন্তর্দৃষ্টিসেবী রবীন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদঘর্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন ও ভাব-বেচারীকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড় কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরিউক্ত ওস্তাদের সহিত আর একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', আর একজন বলেন 'নীরস তরুরুহ

পুরতো ভাতি'।" এখানে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা গঠনমূলক অর্থাৎ constructive, কেননা সে সমালোচনা সৌন্দর্যদেবতার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণপ্রসূ।

রবীন্দ্রনাথ সংগীতে ভাবের সার্থকতা-সম্পর্কে আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণীতে কি কি সুর (স্বর) লাগে না-লাগে তাহা ত মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না; এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কি কি রাগিণীতে কি কি ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন"। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ যে হয় নি তা নয়। কেননা খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের নারদীশিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে এ'চেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্পষ্ট এবং সে চেষ্টা যে একসময়ে ব্যবহারিক সাধনায় প্রযুক্ত হোত তার প্রমাণেরও অভাব নেই। সার্থক সংগীতশিল্পীদের জীবনে তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। একমাত্র পাওয়া যায় না বর্তমান সংগীত-সাধনার ক্ষেত্রে, সেখানে সাধনা আছে, কিন্তু প্রাণের পরিচয় নাই। প্রাণস্পন্দন ব্যতীত প্রাণদেবতার সাক্ষাৎ মেলে না। রবীন্দ্রনাথ এরই জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতীয় ভাব-সাধনার একজন সার্থক পথিকৃৎ। ভারতীয় সাধকরা কেবল কথায় বা শাস্ত্রে সন্তুষ্ট না থেকে তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সুতরাং বর্তমান সংগীত-সাধকরা একদিক থেকে বলা যায় উদ্দেশ্যবিহীন। সংগীতের ভাবসন্ধানী ও রস-পিপাসু তাঁরা নন; কেবল প্রাণহীন, রসহীন ও ভাবহীন সংগীত-কঙ্কালেরই তাঁরা উপাসক। এ' ধরনের রসহীন ও ভাবহীন সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং সেই বিসদৃশ মনোভাব ও রীতির বিপক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীদের অন্তরগত রস ও ভাবসত্তার কিছুটা নিদর্শন দিয়ে বলেছেন: "এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে

বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। * * প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলিরও, অর্থাৎ সে সুরের (স্বরের) মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, সে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক"। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূলকথা হোল উন্মীলন ও নিমীলন-প্রকৃতিই রাগ-রাগিণীগুলির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তপ্রর্কৃতির মধ্যে এক স্বতন্ত্রসত্তা ও রসসত্তা সৃষ্টি করে এবং তারই জন্যে এক রাগ বা রাগিণী অন্য রাগ বা রাগিণী থেকে ভিন্ন প্রকৃতিধর্মী ও ভিন্ন রস-ভাবদায়ী মনে হয়। সংগীত-রত্নাকরের অন্যতম টীকাকার চতুর কল্লিনাথ রাগ ও রাগিণীর পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকটা এ'ধরনের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, রাগ-রাগিণীদের রসগত ও ভাবগত পুরুষপ্রকৃতি ও স্ত্রীপ্রকৃতি-নির্ণয়ের কারণ হোল তাদের অন্তর্গত স্বরসজ্জার আবির্ভাব ও তিরোভাব গতি। রবীন্দ্রনাথ ও কল্লিনাথের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও বক্তব্যের রীতি বা প্রকৃতিনির্বাচনী বিশ্লেষণভঙ্গী প্রায় একই রকমের। রবীন্দ্রনাথ স্বরসমবায়ে গঠিত রাগ-রাগিণীগুলির রস ও ভাব-প্রকৃতির নির্ণয়প্রসঙ্গে স্বর ও সুরগুলি কোন্‌টি দুঃখের ও কোন্‌টি সুখের তার একটি দীর্ঘ বিচারপ্রণালীর আভাস দিয়েছেন 'সংগীত ও ভাব'-নিবন্ধের আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথ তালকেও বলেছেন ভাবের প্রকাশক। তবে সংগীতের ক্ষেত্রে সুর ও তালকে বলেছেন গৌণ এবং ভাবপ্রকাশকে মুখ্য। তারি জন্যে সংগীত-শিল্পীদের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন এই বলে: "এই সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন তেমন করিয়া ঠিক একস্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট"। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এটি ব্যক্তিগত বক্তব্য ও অনুভূতির কথা। ভারতীয় সংগীতে 'সম্‌'-এর উপকারিতা স্বীকৃত নিছক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রেও। কেননা একমুখীনতা অথবা কেন্দ্রগতিই ভারতবর্ষীয় সাধনার মর্মকথা। এরই জন্যে বিচিত্র বিকাশ

থেকে কেন্দ্রে অর্থাৎ বাহির থেকে অন্তরে ফিরে যাওয়ার রীতি সংগীতক্ষেত্রেও স্বীকৃত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভাবকেন্দ্রীক, সুতরাং কেন্দ্রাভিমুখীনতা থেকেও তা বঞ্চিত নয়। তিনি সংগীতে ভাবের পূজারী, রস-আস্বাদনেরই ভিখারী। তারি জন্যে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন: "তেমনি সংগীত কৌশল-প্রকাশের স্থান নহে, ভাব-প্রকাশের স্থান; যতখানি ভাব-প্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম"। এখানে তাই আমরা ভারতীয় সংগীতের পথচারীমাত্রকে—তিনি ক্ল্যাসিক্যালগোত্রীরই হোক আর দেশী ও আধুনিক-পন্থীই হোন,—অনুরোধ জানাই সংগীত-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের পরমলক্ষ্য-নির্দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে। কেননা সংগীত কেবলই কলানৈপুণ্য-বিলাসী কর্মকৌশল নয়, পরন্তু পরম ভাবাদর্শবিলাসী। সংগীত-সাধকমাত্রেরই তাই ভাবের সাধক ও রসগ্রাহী হওয়া উচিত, কেননা একমাত্র রস ও ভাবই সংগীতের যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন করে শান্তি দান করতে সক্ষম।

তারি জন্যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে আবার বলেছেন: "তাঁহারা (শিল্পীরা) গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথা-গুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য"। রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা এবং উপদেশও সংগীতশিল্পীমাত্রেরই অনুধাবন-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন ও তাতে সুর যোজনা করেছেন তাঁরই অনুভূত আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তারি জন্যে তাঁর গানের কথা ও সুরের মধ্যে বিপ্লবের দ্বন্দ্ব নাই, বৈষম্যও নাই, বরং আছে পূর্ণসহযোগীতা ও পরমমৈত্রীর ভাব। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও ভাব' নিবন্ধের উপসংহার করেছেন এই বলে: "উপসংহারে সংগীতবেত্তা-দিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কি কি সুরে কিরূপ বিন্যাস করিলে কি কি ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কি কি সুর (স্বর) বাদী আর কি কি সুর (স্বর) বিসংবাদী তাহার প্রতি মনো-যোগ না করিয়া দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কি কি সুর (স্বর) বাদী ও কি কি সুর (স্বর) বিসংবাদী, তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত

হউন। মূলতান, কেদারা প্রভৃতিও মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখ-দুঃখের রাগ-রাগিণী কৃত্রিম নহে। * * * আমাদের সংগীত-বিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগ-রাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে। সেখানে রাগ-রাগিণীর ভাবশিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক"।

অতীতে ভারতবর্ষীয় সুর-সাধনার ক্ষেত্রে যে ভাব-পূজার একনিষ্ঠা অব্যাহত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এবং তারই জন্যে অতীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি বর্তমান সমাজের রীতি ও আদর্শসম্বন্ধে সমালোচনাও করেছেন যথেষ্ট। তিনি বলেছেন: "আমাদের সংগীত যখন জীবিত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোন দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। * * যখন আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?" ভাবের একান্ত পুজারী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মভাবনিজাত ভারতবর্ষের সংগীতাদর্শ যে প্রাণচঞ্চল হোয়ে আবার প্রকাশ পাবে তাতে আর সন্দেহ কি!

(দুই)

রবীন্দ্রনাথ সংগীতের উৎপত্তি এবং তার উপযোগিতার কথাও বলেছেন সংগীতসন্ধানী সকলের কল্যাণের জন্যে। তিনি এ' নিবন্ধের আলোচনা সুরু করেছেন হার্বর্ট স্পেন্সরের The Origin and Function of Music প্রবন্ধটিকে লক্ষ্য ক'রে। তিনি বলেছেন, স্পেন্সারের সংগীত-সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্পেন্সরের মতে, বিভিন্ন স্বরবিকাশ বিচিত্র মনোবৃত্তি অনুসারে শরীরেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র। মনের বিচিত্র বৃত্তিই যে শরীরে স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং সেই স্পন্দন যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুযায়ী শরীরে প্রচেষ্টা বা কর্ম সৃষ্টি করে একথা সকল দেশের মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা স্বীকার করেন। মোটকথা হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, মানসিক ভাবের উচ্চ-নীচ তরঙ্গমালাই সৃষ্টি করে স্বরের উচ্চ-নীচ ও কোমল-তীব্র প্রকাশ। Signs of ideas-ই signs of feelings-এর প্রকাশক।

অবশ্য সকল প্রকাশেরই মূলে থাকে আবেগ বা প্রেরণা। সেই আবেগ বা emotion আবার মনেরই উপাদান বা বৃত্তিবিশেষ। আবেগ মানুষমাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রী। সেই আবেগ বা মানসিক প্রেরণাই সংগীতের কথা ও সুরকে করে সাবলীল, পূর্ণ ও বিচিত্রমুখী। সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানও দৈহিক ও মানসিক সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে emotion বা ভাবাবেগেরই পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করে। ভাবাবেগ ইচ্ছা বা বাসনার আকারে মনঃসমুদ্রের প্রকাশ পায় এবং সেই প্রকাশই সৃষ্টি করে কর্মকৃতি বা কর্মপ্রবৃত্তি কারণের আকারে। সংগীতে রাগ বিচিত্র স্বরের সমন্বয়ে গঠিত। স্বরের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে থাকে বিচিত্র রস এবং সেই রসধারাই সৃষ্টি করে ভাবসমষ্টি। আবেগ ভাবেরই কার্যাকারে বাস্তব রূপ। সুতরাং ভাবের সঞ্চরণশীল রূপই আবেগ বা emotion। আবেগে শক্তি থাকে এবং সেই শক্তিই শিল্পীর সাধনার রূপ সৃষ্টি করে।

স্পেন্সারের আসল কথাই তাই যে, স্বাভাবিকতার স্বচ্ছল প্রকাশই সংগীতের সুষ্ঠু রূপ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাভাবিকতা বা স্বভাব-সুন্দরের একান্ত উপাসক; সুতরাং কৃত্রিমতা বা যান্ত্রিক বিকাশ তাঁর চক্ষে ছিল চিরদিন অবজ্ঞাত। স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতাকে তুলনা করা যেতে পারে ফটোগ্রাফ ও তৈলচিত্রের প্রতিফলনের সঙ্গে। ফটোগ্রাফ মানুষ বা যে কোন প্রাণী বা জিনিসের হুবহু নকল প্রতিফলন, আর তৈলচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমগ্র জীবনের প্রতিফলন। কাজেই ফটোগ্রাফে থাকে গতানুগতিকতার রূপ এবং তৈলচিত্রে থাকে নবসৃষ্টির রূপ প্রতিভার মূল্যকে স্বীকার ক'রে। সংগীতের বেলায়ও তাই। শাস্ত্র-নির্দেশিত কিংবা আচার্য-নির্দিষ্ট গমক, মূর্ছনা প্রভৃতি অলংকার-সমন্বিত রাগের হুবহু প্রতিফলন যেন ফটোগ্রাফ। তাতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ থাকে একমাত্র রাগের হুবহু প্রকাশে, নবসৃষ্টির উচ্ছলতা সেখানে থাকে না। হুবহু ও গতানুগতিক প্রতিফলন যেন কঙ্কাল, আর সেই কঙ্কালে কথা, রস ও ভাবের রক্ত-মাংস ও কমনীয় কান্তির সমাবেশ নিয়ে গঠিত হয় তৈলচিত্র। প্রতিভার বিকাশ উভয়ের মধ্যে থাকলেও নবসৃষ্টির পথে প্রতিভার দীপ্তি আরও প্রখর। কথাটাকে আরো পরিষ্কার ক'রে বল্লে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, মানুষের রুচি লৌহখণ্ডের মতো চির-অবিকৃত অনমনীয় নয়,

কেননা রুচির মধ্যে নিত্য-নূতন পরিবর্তন আছে এবং সেই পরিবর্তন বা বিবর্তনই প্রাণের লক্ষণ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বুকে বাস করেই মানুষ সৃষ্টি করে তার সমাজ এবং বৈচিত্র্যের হয় উপাসক। সমাজেরও বিবর্তন আছে দৃষ্টি ও মানসিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তারি জন্যে মানুষ যদি পুরাতন জীর্ণতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে জীবনধারণের পথে, তবে তার সৃষ্টিকর্ম হয় ব্যর্থতার পর্যবসিত, নূতন সৃষ্টির পথ হয় অবরুদ্ধ এবং সেখানে কৃতিত্ব-অর্জনের চেয়ে অকৃতিত্বের অভিশাপ বহন করাই হয় সার। মাষ্টার মশায়ের লিখে দেওয়া অক্ষরের উপর শিশুরা দাগা বুলায় বটে, কিন্তু শিশুদের তাতে নিজেদের কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। শরীরকর্ম ও মনঃসংযোগই সৃষ্টিকর্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়,—যদি সে সৃষ্টিকর্মের পিছনে নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বা প্রতিভার প্রকাশ না থাকে। রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন একটু ভিন্নভাবে। তিনি বলেছেন: "সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজ-বৃক্ষের শাখায় শুষ্কমাত্র অলংকারস্বরূপ সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখীতে তাহার উপর বসিয়া গাহে না। গাছের আর কিছু উপকার করে না, কেবল শোভাবর্ধণ করে"।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের পাতায়ও বিভিন্ন যুগের রুচির অনুপাতে রাগের কাঠামোয় ও রূপের বিকাশে বিভিন্ন পরিবর্তনের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং পরিবর্তন সকল যুগে সকল সময়েই হয়েছে; আর এই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়েই নূতন সৃষ্টির পথ উৎসারিত হোয়ে চলে। তবে অশিক্ষিত ও অনিপুণ শিল্পীর হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব পড়লে অনর্থ সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; কেননা পুরাতন সংস্কারের মোহই তাকে গতানুগতিকতার পথে চালিত করে। তাই বিজ্ঞান ও যুক্তিবিচারের আলোকপথ ধরে শিল্পসৃষ্টির পথে অগ্রসর হোলে সার্থকতার সম্ভাবনাই বেশী।

(তিন)

এবার রবীন্দ্রনাথের 'সংগীত ও কবিতা'-নিবন্ধ আমাদের তৃতীয় আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এ' নিবন্ধে সংগীত ও কবিতাকে 'যমজ ভাই' বলে আখ্যা দিয়েছেন, কেননা মনের ভাবপ্রকাশের শক্তি উভয়ের মধ্যেই সমান, পার্থক্য একটির কথায় ও অপরটির সুরে। কবি বলেছেন: "কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে"। রবীন্দ্রনাথ দুটির তুলনা করতে গিয়ে 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন —যার অর্থ দুটির মধ্যে কিছু-না-কিছু পার্থক্যের ধারণা সৃষ্টি করে। তার কারণও তিনি দেখিয়ে বলেছেন: "এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে, একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে"। কিন্তু তাই বলে কথার আসন যে সংগীতের আসনের নীচে নির্দিষ্ট হবে, এমন কোন কথা নাই এবং একথা স্মরণ করিয়েই তিনি আবার বলেছেন: "অতএব ভাব-প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে"।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে, সংগীত ও কবিতা উভয়েই ভাব-বিনিময়ের জন্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে। "তবে কবিতা ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই"। কিন্তু তাহলেও রবীন্দ্রনাথের মতে, সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। উভয়েই ভাবের বাহক।

(চার)

এক্ষণে সংগীতকে ব্যষ্টি-জীবনের নির্বাচিত কয়েকটি স্তরে বা গণ্ডিতে সীমায়িত ক'রে রাখলে সে সংগীত সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তাই সর্বসাধারণের জন্যে গণ্ডীর বন্ধনে মুক্তির প্রয়োজন। 'সংগীতের মুক্তি'-র অর্থই হোল সর্বসাধারণের মধ্যে তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত বা বিস্তৃত করা। উস্তাদজী অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গানের পরিবেশন করেন আনন্দের বিষয়, কিন্তু উস্তাদজীর গান-পরিবেশন যখন নির্দিষ্ট কয়েকজনের জন্যে

নির্বাচিত হয় তখনই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ একথাটি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: "সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা, তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ-বিলাস হয় তবে তাহাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। * * এই জন্যে ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে"।

'সংগীতের মুক্তি'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এই তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গানসম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়াল্া। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগ-রাগিণী। সেটা গানকর্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস-পাসের আইন খাটে না"।

এ'ব্যক্তব্যের পর রবীন্দ্রনাথ গান-রচয়িতা ও গীতশিল্পীর সৃষ্টিশক্তিকে একই মানুষে প্রকাশের রূপকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বলেছেন। অবশ্য দুটি শক্তির একত্র সমাবেশ প্রায় একই ব্যক্তিতে ঘটে না, কিন্তু ঘটলে সৃষ্টিশক্তির বিকাশ সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে ওঠে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

ক্ল্যাসিক্যাল বা অভিজাত হিন্দুস্তানী সংগীতের প্রাণ রাগ। অবশ্য দেশীগানের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রসসঞ্চারী সুরই দেশীগানের কথা বা সাহিত্যকে প্রাণবান করে। এখন রাগ-রাগিণীর সত্যকারের রস কি—তার উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাগ'-শব্দটির অর্থ ও সার্থকতার প্রসঙ্গে বলেছেন: "রাগ-শব্দের গোড়াকার মানে রঙ। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরাজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ

দুইই বোঝায়। •ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রঙ, সেই রঙটা রাঙা। ওটা রক্তের রঙ, হৃদয়ের নিজের আভা"।

'রাগ'-শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেকথা বলেছেন, ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অর্থবিশ্লেষণভঙ্গীও অনেকটা তাই। রাগকে সংগীতশাস্ত্রকারর৷ একটি 'শক্তিবিশেষ' বলেছেন এবং সে শক্তির নাম 'রঞ্জনাশক্তি'। সেশক্তি একপ্রকার সংস্কার সৃষ্টি করে,—যে সংস্কার মনোরম, সুখদায়ী এবং আনন্দরসসঞ্চারী। সেই সংস্কাররূপ শক্তি অথবা শক্তি থেকে সৃষ্ট সংস্কার যেমন আনন্দরস সৃষ্টি করে, তেমনি সৃষ্টি করে দুঃখরসও, বিস্ময়রসও এবং নির্বেদরসও। মোটকথা রাগ তথা রাগ-রাগিণী তার রঞ্জনাশক্তি দিয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি করে বিচিত্র রস ও রস-পরিণতিরূপ ভাব এবং সেই বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তিই মানুষকে দেয় দুঃখ বা আনন্দ—শোক বা শান্তি। এজন্যে রাগ-রাগিণীরা একদিক্ থেকে হৃদয় বা অন্তরের আভা বা প্রাণদীপ্তি। সেই আভা বা দীপ্তি অনির্বচনীয় এবং বিশ্বরসের স্রষ্টা। এ'প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "অর্থাৎ আমাদের মতে, রাগ-রাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেই জন্যে আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রদীপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিঃশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন"। এখানে রাগ বা গানের সুর সতত প্রাণচঞ্চল, আবার রাগই কোন-না-কোন ভাবের উদ্দীপক এবং সে উদ্দীপনা শক্তির পরিচায়ক। ভারতবর্ষের সংগীত তাই মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্ব-রসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে।

এ'প্রসঙ্গ বা বিচার রবীন্দ্রনাথের গভীর সংগীতজ্ঞানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রের বাঁধন-কষণের তীব্র সমালোচনা করলেও শাস্ত্রের নীতি ও কল্যাণ-নির্দেশের কোনদিনই নিন্দা করেন নি, এবং করেন নি বলেই 'রাগ'-শব্দের বিশ্লেষণও যেমন করেছেন সুনিপুণভাবে, তেমনি করেছেন

সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির গাণিতিক নির্ধারণ না হোলেও তার সার্থকতার মর্ম-বিশ্লেষণ। তিনি বলেছেন: "বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাতটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম স্বরগুলি লইয়া, যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম-স্নায়ুতন্ত্র। ইহারি যোগে এক স্বর কেবল যে আরেক স্বরের পাশাপাশি থাকে.তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে"। অনেকে শ্রুতিকে স্বর-পর্যায়ের অন্তর্গত করতে নারাজ, কিন্তু সংগীতশাস্ত্রকারদের মতো রবীন্দ্রনাথও শ্রুতিকে 'স্বর'-ই বলেছেন, তবে সূক্ষ্মস্বর বা অতিসূক্ষ্ম স্বররূপে স্বরের বীজ বা কারণ-স্বর হওয়াই স্বাভাবিক। বটবীজ থেকেই বিশাল বটবৃক্ষ জন্মলাভ করে। তবে তারা শ্রুতি কিনা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বর। সাত স্বরের প্রতিটির ব্যবধানে বা প্রতিটির মধ্যে সূক্ষ্মস্বরের সংখ্যা অনেক বা অসংখ্য। কিন্তু তারা শ্রবণযোগ্য নয়, সুতরাং ব্যবহারের অনুপযোগী বলে সাধারণত তাদের স্বর বলে গণ্য করা হয় না। প্রাচীন ও নবীন সংগীতশাস্ত্রকাররাও শ্রবণযোগ্য শব্দ-কম্পনকেই স্বর বলেছেন এবং ষড়্‌জাদি সাত স্বরও অনেকগুলি শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের সমষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মস্বররূপ শ্রুতিগুলির মধ্যে একটি সাম্য ও ঐক্যের সন্ধান লক্ষ্য করেছেন, যেমন ভারতের বেদান্তদর্শনকাররা মাধ্যমিক বৌদ্ধদের চলমান জ্ঞানধারার মধ্যে অসংখ্য পৃথক পৃথক জ্ঞানবিন্দুসত্তা স্বীকার করেছেন। বেদান্তদর্শনকাররা বলেন, অসংখ্য মণিকে একটি সূতায় গেঁথে যেমন হার তৈরী করা হয়, তেমনি জ্ঞানধারার মধ্যে একটি অনুস্যূত জ্ঞানসত্তা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। তেমনি অসংখ্য শ্রুতিসজ্ঞার মধ্যে যদি একটি ঐক্যসূত্র না থাকত, তবে একটি গানের সামগ্রীক অখণ্ড রূপ কখনই আমাদের কাছে প্রতিভাত হোত না। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধযুক্ত ঐক্যসূত্রকে 'নাড়ির সম্বন্ধ' বা নাড়ির যোগ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই সম্পর্কে হাল-ফ্যাসানের কন্সার্ট ও তেলেনা-গানের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "যে-কোন তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহার স্বরগুলিকে কাটাকাটা রাখিলে একই রাগিণী দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়-ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু স্বরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তাহা হইলে হৃদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে"। কাটা কাটা বা পৃথক

পৃথক স্বরের সঞ্চারে একটি অখণ্ড রাগ জন্মলাভ ক'রে যেমন বিচিত্র হৃদয়-ভাব বা হৃদয়াবেগের স্থষ্টি করে, তেমনি পরস্পরসম্পৃক্ত স্বরের মাধ্যমে রাগ তার সাধারণ কেন—নিজস্ব ভাব ও স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে। সাধারণ মানুষ বৈচিত্র্যের উপাসক, বিচিত্র সামগ্রীকে নিয়েই সে ডুবে থাকে, কিন্তু বিচিত্র স্বর ও বিচিত্র ভাব যখন কেন্দ্রগত ও একীকৃত হয় তখন তারা নিটোল একটি রূপে পরিণত হয় এবং সেই অখণ্ড রূপ হয় অনির্বচনীয় ও প্রাণবান। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই অখণ্ড রূপের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন স্বরের সমীকরণপ্রসঙ্গে।

কিন্তু বিচিত্র স্বরের সমীকরণে স্থষ্ট একই রাগের বিশেষ বিশেষ রূপের যেমন বিকাশ আছে, তেমনি আছে শাস্ত্র-ছাড়া ও নিয়ম-বাঁধন-বিহীন এক নির্বিশেষ রূপের সত্তা। এই নির্বিশেষ অনির্বচনীয় রূপই সংগীতের নিজস্ব রূপ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রাগের এই নিজস্ব অপার্থিব রূপেরই পূজারী এবং তারি জন্যে তার সংগীতের মধ্যে দেখি আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সুর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র-ছাড়া ব্যাপার। * * এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। * * তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কীর্তন-গানের তেমনি অনাদর ঘটিয়াছে"। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কীর্তনের এ' অনাদর রবীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করতেন না। শুধু কীর্তন কেন, বাঙলার নিজস্ব সামগ্রীর অন্যতম বাউলগানের মাধুর্যকেও তিনি অন্তরের সঙ্গে সমাদর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কীর্তন ও বাউল-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল-আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর[১] আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন

১। এখানে 'রাগিণী'-শব্দটি রাগ ও রাগিণী এই উভয় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক রাগের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে হবে।

ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁসিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগ-রাগিণী যতই চোখ রাঙ্গাক্, সে কিসের কেয়ার করে"।

এখানে নিছক ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের একটু ধীর-মস্তিষ্কে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বক্তব্যগুলিকে অনুশীলন ক'রে দেখতে অনুরোধ জানাই। বাঙলার বাউল ও কীর্তন বাঙালীর প্রাণনিষ্ণাত অনির্বচনীয় রসের সামগ্রী। এ' সামগ্রীর তুলনা অপর কোন দেশের সংগীতসামগ্রীর সঙ্গে মেলে না। বৈষ্ণব-পদকর্তারা ছিলেন গভীর রসানুভূতির পথচারী। রাধাকৃষ্ণের অনাস্বাদিত অপার্থিব প্রেমরস-আস্বাদনে থাকতেন তাঁরা বিভোর হোয়ে। রসানুভূতি ছিল তাদের প্রগাঢ়। কীর্তনের মতো সকল রকম সংগীতের মর্মকথাও তাই। ভাব ও রসানুভূতিকে বাদ দিলে সংগীতের সুরের তথা রাগ-রাগিণীদের গঠন কঙ্কালমূর্তিরই পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। কেবলি কতকগুলি তান, গিটকিরি ও স্বর-বিস্তারের সীমায় সংগীতকে আবদ্ধ রাখলে সংগীতের প্রাণস্পন্দন হয় নিস্তব্ধ। মৌণ-গম্ভীর ভাবসত্তায়ই সংগীতের প্রতিষ্ঠা। কাজেই রসহীন ভাবহীন সংগীতের অনুশীলন গতানুগতিক যান্ত্রিক রূপায়ণেরই সমগোত্রীয়। ক্ল্যাসিক্যালপন্থী উস্তাদদের বেশীর ভাগই আজ হয়েছেন প্রাণহীন গতানুগতিতার অনুসারক। যান্ত্রিক ধারার অনুবর্তনই যেন তাঁদের জীবনের আদর্শ হোয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই শান্তিরসের আস্বাদন থেকে হয়েছেন তাঁরা বিমুখ। মনে রাখা উচিত যে, অধ্যাত্ম রস-সাধনার পথ থেকে বঞ্চিত হোলে সংগীত শুধু কেন, সকল রকম শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও সংস্কৃতির আদর্শই হয় লাঞ্ছিত। আধুনিক ক্ল্যাসিক্যাল সংগাতশিল্পীদের তাই আমরা আহ্বান করি পশ্চাদবলোকনের জন্যে। অতীত ভারতের সংগীত-সাধনার আদর্শকে তাঁরা স্মরণ করুন এবং রবীন্দ্রনাথের এই সরল সাবলীল প্রাণবাহী সংগীতের আদর্শের কথাও উপলব্ধি করুন।

একান্ত নূতন না হলেও একটি অভিনব স্বাধীন চিন্তারই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ সংগীতের পথচারীসমাজে এবং সেটি হোল ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের হার্মনি বা স্বরসংগতির অন্তর্নিবেশকরণ-প্রসঙ্গ। আমরা সকলেই জানি যে, পাশ্চাত্ত্য সংগীত হার্মনিপ্রধান ও প্রাচ্য

বা ভারতীয় সংগীত মেলাডিপ্রধান। মেলাডির অর্থ করি আমরা 'রাগ', আর হার্মনি হোল 'স্বরসমন্বয়'। কিন্তু বিচক্ষণ সংগীতশাস্ত্রীমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, পাশ্চাত্ত্য সংগীতের 'মেলাডি' ঠিক ভারতীয় রাগের সমশ্রেণীভুক্ত নয়। ভারতীয় সংগীতের 'রাগ'-শব্দটি পাশ্চাত্ত্য সংগীতের 'মেলাডি'-বস্তু অপেক্ষা আরও অনেক ব্যাপক অর্থের বোধক। যাই হোক পাশ্চাত্য সংগীতের হার্মনিকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রগত করার অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি হোল: "কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে একথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্মনি যদি দেশ বিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটা সত্যবস্তু, ইহার সম্বন্ধে দেশ-কালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে"।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের গতিপথকে সচ্ছল করার জন্যে বিপুল তান-কর্তব প্রভৃতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য হার্মনির অন্তর্নির্বেশ ঘটানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তারি জন্যে তিনি বলেছেন: "আমাদের সংগীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে; এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক কাল হোক এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে"। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিরদিন আশাবাদী এবং এই আশার দীপকে প্রজ্জ্বলিত রেখেই তিনি জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

সকল দেশের সংগীতেই তাল ও ছন্দের লীলায়ন অব্যাহত সেকথা পূর্বেও আলোচনা করেছি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শাস্ত্রী। তিনি নাটকের সৌকর্যে সংগীতের আলোচনাকেও নাট্যশাস্ত্রে স্থান দিয়েছেন। রাগ ছিল তখন বীজাকারে। অর্থাৎ ভরতোত্তর সকল রাগেরই বীজ যে জাতিতে তথা জাতিরাগে নিহিত তা তিনি তার বিস্তৃত পরিচয়

দিয়েছেন। নৃত্যছন্দ এবং তালের পরিচয়ও তিনি নাট্যশাস্ত্রে দিয়েছেন। তালকে তিনি বলেছেন 'কাল' বা কালধারার প্রতিটি বিন্দু। ভারতীয় দর্শনে এই কালই আবার মহাকাল নামে পরিচিত—যার বুকে আবর্তিত হচ্ছে এই বিশ্বচরাচর। বিশ্বের এই আবর্তন-মুখেই সৃষ্টি হচ্ছে বিচিত্র ছন্দ এবং সেই ছন্দের সঙ্গেই সম্পর্কিত আমাদের জীবনছন্দেরও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বছন্দের সকল সামগ্রী। নৃত্য-গীতও বিধৃত সেই ছন্দে। তাল সেই ছন্দেরই বাস্তব ও সুষ্ঠু রূপ বা পরিণতি। তাল তাই সংগীতের সহকারীই শুধু নয়, দ্যোতক এবং প্রাণবস্তুও। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন: "সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। * * তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সেকথা বলাই বাহুল্য"। তবে আলাপের কথা স্বতন্ত্র। আর এরই জন্যে নাট্যশাস্ত্রকার থেকে আরম্ভ ক'রে সকল শাস্ত্রীই সংগীতকে ভাগ করেছেন সতাল ও অতাল এই দুভাগে। তবে একথাও অতীব সত্য যে, অতাল আলাপেও ছন্দের সাহচর্যকে অস্বীকার করা হয় নি, কেননা আলাপের সংগত লীলায়নকে নিয়মিত করে ছন্দ। আলাপের এই ছন্দই মানুষের তথা শ্রোতার জীবনছন্দে আনে দোলা এবং সেই দোলার সচলতাই প্রমাণ করে সকল প্রাণীর প্রাণ বা জীবনসত্তা।

ছন্দ ও তালের সার্থকতা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম"। এর পর তিনি সম ও বিষম এ'দুটি ছন্দে রচিত দুটি কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি প্রসঙ্গ তুলেছেন লয়ের এবং বলেছেন: "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি—গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে লয়ের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই"।

এরপর রবীন্দ্রনাথ সংগীতের প্রসঙ্গে জীবনসত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এই জীবনসত্যের উপলব্ধিতেই মানুষের সত্যকারের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে অবশ্য বাহুল্যের বা বৈচিত্র্যের পূজারী,

একত্বের নয়। অসীম বাহুল্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি সকলকে আনন্দ-সত্যের কল্যাণময় রূপ দর্শন করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন: "বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্যে নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য—যাহাতে আত্মা আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে, কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোন্ সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো-লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। এই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য"।

রবীন্দ্রনাথ এমনটিভাবে সংগীতপ্রসঙ্গে সংগীতদর্শনের (philosophy of music) তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন। কোন জিনিসের বিচিত্র বিকাশই বাহুল্য ও প্রাচুর্যের রূপ। সঙ্কোচে এই বাহুল্যের রূপ নষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত সীমায়িত প্রকাশে সামগ্রীক বস্তুর অঙ্গহানি ঘটে। তাই সমষ্টিগত হওয়া উচিত সর্ব সামগ্রীর বিকাশ। সংগীতের ক্ষেত্রেও এই এক কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ-বিলাস হয় তবে তাহাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই করা গান্‌কে আমাদের সকলের মান্য করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে"।

(পাঁচ)

'আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে সংগীতশিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য; হিন্দুস্তানী সংগীতকলার তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যেসব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা

আপনি জমে উঠেছিল। রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা-সম্বন্ধে যাঁরা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না ; অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি-সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি ; কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস-সম্বন্ধে একটা অসাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল"।

এ' থেকে প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু চক্রবর্তী বা শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে রীতিমত ভাবে ছাত্র মনোবৃত্তি নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত শিক্ষা করেন নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন দেশের উস্তাদদের গানের যে নিত্য নিয়মিত মজ্‌লিস বসতো ও কলাবন্তী (কালোয়াতী) গানের সুরে ভরপুর হোয়ে থাকত ঠাকুরবাড়ির দরবার একথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা তাঁর শোনা অভ্যাস ছিল (লেখা অভ্যাস ছিল নয়) তা থেকে তাঁর মনে একটা কালোয়াতী গানের সংস্কার গড়ে উঠেছিল ও সেই সংস্কারই দিয়েছিল তাঁর জীবনে বিচিত্র রকমের গান-রচনাব ও সুর-যোজনার প্রেরণা। তাছাড়া একথা তিনি স্বীকার করেছেন : "আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি বরে সে দেখা দিল"।

এ' প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মন যেমন আকৃষ্ট হয়েছিল অভিজাত কলাশ্রয়ী সংগীতের উপর, তেমনি হয়েছিল বাঙলাদেশের নিজস্ব সকল রকম সংগীতের উপর। এ' সম্পর্কে তিনি সংগীতকে বিশুদ্ধ ও কাব্যাশ্রিত এই দু'ভাগে ভাগ কবেছেন এবং সে ভাগ-দুটিকে তিনি বলেছেন, এরা মানুষের দুটি আন্তর প্রকৃতির অনুযায়ী। এর উদাহরণ দেবার বেলায় তিনি হিন্দুস্তানী সংগীতের বাণীকে বলেছেন 'ছায়েবানুগতা' ও বাংলা-সংগীতের বাণীকে বলেছেন 'অনুচর না হোক, সহচর বটে'। ভাষা সংগীতকে করে মুখর তার ভাবকে বোঝানোর জন্যে, আর সেদিক থেকে দেখা যায়, হিন্দুস্তানী সংগীত তাব বাক্য বা সাহিত্যকে করেছে গৌণ, আর বাংলা সংগাত তার কথাকে দিয়েছে যথাযথ মূল্য।

হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগাতের কাব্যমাধুর্য ও সাহিত্যসম্পদ যে অতীব কম একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগাতালোচনার অনেক জায়গায়ই স্বীকার করেছেন। কথা ভাবের প্রকাশক এবং সুর কথার অনুসঙ্গী। সুতরাং কথা

ও সুর যে সম-আদর পাবার অধিকারী একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া কাব্যমাধুর্য সংগীত-সাহিত্যেরও একটি অমূল্য সম্পদ এবং সে সম্পদহীন কথা বা সাহিত্য কোনদিনই নিজের ও সুরের রসবাহী হোতে পারে না। 'পদাবলী'-কীর্তনগানের রসসিক্ত ব্রজবুলি বা ব্রজভাষারই এখানে উদাহরণ দেওয়া যাক্। কবি অনন্ত বসন্তরাস-বর্ণনায় বলেছেন,

সরস বসন্ত সময় বন শোহন
মোহন মোহিনি সঙ্গ।
অপরূপ রাস বিলাসহি নিমগন
দুঁহু দুঁহু অঙ্গহি অঙ্গ॥
দেখ সখি রাস বিলাস।
কত কত যন্ত্র তন্ত্র সমারত
কতহু রাগ পরকাশ॥

বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ, বাসুদেব ঘোষ, শ্রীরূপ গোস্বামী, যদুনাথ দাস, যদুনন্দন, কবিশেখর, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, নরোত্তমদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি মহাজন-রচিত পদাবলীনিহিত সাহিত্যের তুলনা নাই। কবি বিদ্যাপতিব বসন্তবিহার বর্ণনার একটি অংশের নিদর্শন যেমন,

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নবল-কিসোর[১]
কালিন্দি-পুলিন-কুঞ্জবন-সোভন[২]
নব নব প্রেমবিভোর॥—প্রভৃতি

রচনায় পদের লালিত্য ও রসায়িত ভাবের তুলনা নাই। এ' যেন রস-নির্ঝরিনীর উদ্বেল তরঙ্গমালা। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার এই রস-সাহিত্যের প্রাণ-মুগ্ধ বাণী বা সাহিত্যসৌন্দর্যের উল্লেখ ক'রে তাই বলেছেন: "বাণীর প্রতিই

১। কিশোর।
২। শোভন।

বাঙালীর অন্তরের টান, এই জন্যে ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু এক বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না,—এই জন্যে বাঙ্‌লাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন"। বাঙালী ও মৈথিলী বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচিত কীর্তনের পদগুলিসম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের গানের সাহিত্যও স্বচ্ছন্দ, সুন্দর ও রসসমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সকল গানের সাহিত্য-সম্পদের তুলনা ও নিদর্শন দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়, তবে তাঁর ভাষা যে কত স্বচ্ছল, সাবলীল ও ছন্দসমৃদ্ধ তার সামান্য একটি নিদর্শন যেমন,

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে !
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে !
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে !
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে।
এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াই হে,
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে !
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে !
দাঁড়াও সেখানে বিরহী এ' হিয়া
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে।[১]

শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর পরিবেশসেবী এই গান। এ গান মানুষের হৃদয়কে নিয়ে যায় অজানা নিস্তব্ধ একদেশে এবং সেই দেশ ধ্যানের ও চিরনীরবতার, কিন্তু আনন্দের। গানের প্রতিটি কথাই যেন ভাবমুখর ও রস-সমুজ্জ্বল। কবির

১। বেহাগ—তেওরা

সকল গানের কথা ও ভাষা তাই মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আনে এক অনির্বচনীয় দোলা, আনে প্রাণচঞ্চল স্পন্দন।

আর একখানি সরল সাবলীল গানের রচনা যেমন,

> তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই
> কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।
> মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
> তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
> হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
> নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই।
> অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
> জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।[১]

স্বচ্ছন্দ ভাষা ও ভাবের যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সরল রচনা, কিন্তু হৃদয়স্পর্শী তার ভাব। তারি জন্যে কথায় দৈন্যকে তিনি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বরের দ্বন্দ্বরূপের মাঝেও এনেছে অখণ্ড মিলনের সার্থকতা। অসংখ্য এ' ধরনের গান; সুতরাং গীতি-রত্নাকরের দু' একটি মাত্র রত্নই দেবে সমগ্র রচনাসৌন্দর্যের সার্থকতার নিদর্শন।

'পদাবলীর 'পদ' অর্থে গানকে বোঝালেও রবীন্দ্রনাথ 'পদ'-শব্দে বুঝিয়েছেন সুর-রস-সম্পৃক্ত সাহিত্য বা কথাকে। বাঙলাদেশে কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, রসনায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঙালার সকল শ্রেণীর গানের সাহিত্যে আসন অধিকার ক'রে রয়েছেন, বাঙালার প্রায় সকল গানে সে রকম সাহিত্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। মোটকথা বাঙলাদেশের গানে কথা ও সুরের হরগৌরী-মিলন।

অনেকে ও বিশেষ ক'রে প্রাচীনপন্থীদের অভিমত যে, কথাকে সুরের উপর একাধিপত্য করতে দিলে সুরের স্বচ্ছল বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এরই জন্যে সুরকে (রাগ-রাগিণীর বিকাশকে) দেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন, আর কথা থাকে তার অনুগত হোয়ে। এ'বিশ্বাসের পরিণতিও আমরা দেখেছি হিন্দুস্তানী সংগীতের গান-রচনার ভিতর। গানের কথা

১। বেহাগ—কাওয়ালী।

সেখানে কাব্যহীন ও অলংকার-বিহীন হোয়ে সুরের অধীনে থেকে আত্ম-প্রকাশ করে। এই আত্মপ্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন, 'বাঙ্‌লাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক বিকাশ সাহিত্যে'। সাহিত্যের মধুচক্র সৃস্টি হয়েছে সত্যিকারভাবে বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে। তাই কথার অধিকারকেও স্বীকার করতে হবে সুরের অধিকারের সঙ্গে। কথা ও সুর মিলিত চেষ্টায় মানুষের রসানুভূতির ক্ষেত্রকে সচল করে।

বাঙলার সুর ও সাহিত্যক্ষেত্রের এই সচল গতির ধারা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলেছেন: "এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাঙলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগ-রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না; যেমন কীর্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ্‌ কিছু কিছু না ছাডলে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়"। রবীন্দ্রনাথ এই কথা ও সুরের মিলন-সাধনাব্রতকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন এই বোলে: "অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে"।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী সংগীতশিল্পীদের অন্ধধারণার তাই প্রশংসা করেন নি কোনদিন। তিনি বলেছেন, পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয়-সাধনে অধিকার জন্মে; নিয়মকে স্বীকার করেও নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন সেখানে স্বাতন্ত্র্যসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে সংযত ও সুসংগত জীবনেই আসে স্বাতন্ত্র্যবোধ। এ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন: "স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এই জন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়"। কথাও তাই যে, সুর ও কথার মধ্যে মিতালী বা মৈত্রীসম্পর্ক-স্থাপনের কৌশল লাভ করতে গেলে শিক্ষা ও সংযমশক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

কেননা শিক্ষা ও সংযমশক্তিই একমাত্র অন্ধবিশ্বাস ও চিরাচরিত কুসংস্কারের বিলোপ-সাধন ক'রে নূতন সৃষ্টির পথে মানুষকে প্রেরণা দেয়।

কথা ও সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' (১৯৩৭ খ্রীঃ) এবং 'প্রবাসী' (১৯৩৯ খ্রীঃ) পত্রিকা-দুটিতে। এই আলোচনায় তাঁর বিচারদৃষ্টি ব্যাপক ও তীক্ষ্ণ। তিনি সংগীতে কথা ও সুরের বিচারে শাস্ত্রনির্দেশ মেনেছেন সত্য, কিন্তু সে শাস্ত্রের পরিধি অনেক বিস্তৃত। সে শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শুধুই সংগীতকলা নয়, কাব্যকলাও। সেই শাস্ত্রের নাম ললিতকলাশাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের সমদৃষ্টিতে সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সকল দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ বাক্য ও অর্থের একত্ব-সম্পর্কে কালিদাসের নামোল্লেখ করেছেন এবং অভেদসম্পৃক্তি-সম্বন্ধে আলোকপাতও করেছেন অভিনবভাবে। তিনি বলেছেন: "কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন—বাক্য এবং অর্থ একত্রে সংপৃক্ত। কিন্তু যে-বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ ক'রে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনয়ীকে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে"। এখন প্রশ্ন হোতে পারে যে, কথা ও সুরের একত্বসাধন তাহলে কিভাবে হোতে পারে! রবীন্দ্রনাথ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন: "কথাকে পদে পদে আড় ক'রে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের যাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সংগীতের সমজাতীয়। এই সংগীতরসপ্রধান কাব্যকে ইংরাজীতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতায় এই সম্মিলিত সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণ্য হত, বৈদিক কালে যেমন সামগান"।

বৈদিকযুগে সামগানকে অনেকে আবৃত্তিমূলক গান বা চাণ্ট (chant) বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু চাণ্ট বা সুরে আবৃত্তি ও গানের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় অনেক। প্রাতিশাখ্য[১] ও শিক্ষাগুলিতে[২] সামগানকে সংগীত-

১। প্রাতিশাখ্যগুলিকে একদিক থেকে বেদের প্রতিশাখার ব্যাকরণ বা নিয়মশাস্ত্র বলা যেতে পারে।

২। 'শিক্ষা' অর্থে স্বরশাস্ত্র।

শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কেননা সামগানে ছিল মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন সপ্তক এবং ছন্দাত্মক তাল প্রভৃতির সমাবেশ। নারদীশিক্ষায় সামগানের প্রসঙ্গে নারদ স্বরমণ্ডলের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানা একোণপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্ ॥

এই শ্লোক থেকে প্রথমাদি সাতটি বৈদিক স্বর এবং ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, তিন গ্রাম (ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার), একুশ মূর্ছনা, উনপঞ্চাশৎ তানের উল্লেখ পাই। স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা ও তানের যে প্রচলন ছিল বৈদিক যুগে, তার পরিচয় পাই 'তানরাগস্বরগ্রামমূর্ছনানাং তু লক্ষণম্' কথাগুলিতে। অবশ্য বৈদিক গানরূপ সামগান গাওয়া হোত তিন থেকে পাঁচ স্বরে। কৌথুমীয় শাখায় সাত স্বরেরও প্রচলন ছিল। অবশ্য গ্রাম, মূর্ছনা, তান প্রভৃতির বিশেষভাবে প্রয়োগ হয় বৈদিক কালের পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল যুগে। শিক্ষাশাস্ত্র নারদীশিক্ষা বৈদিক গানের আলোচনায় নিয়োজিত থাকলেও বিশেষভাবে আলোচনা করেছে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের (৬০০-৫০০ খ্রীঃপূর্ব) গান্ধর্ব-সংগীতকে নিয়ে। তবে একথা অতীব সত্য যে, একেবারে গোড়ার দিকে সামগানে প্রয়োগ করা হোত যখন তিন বা চারিটিমাত্র স্বর (সামিক বা স্বরান্তর), তখনও সামগান ছিল সংগীতমূলকই, কেবলি আবৃত্তিমূলক নয় (অবশ্য সুরে আবৃত্তি করা হোত নির্দিষ্ট কতকগুলিমাত্র মন্ত্র, আর বেশীর ভাগ মন্ত্রই গান করা হোত স্বরযোগে)। সুর তখন ছিল না বটে 'রাগ' নাম নিয়ে, কিন্তু সে সুরপ্রবাহে থাকত বর্তমান রাগনাম-সার্থকতার মতোই রঞ্জনা ও আকর্ষণী-শক্তি এবং সুর ও স্বরসজ্জাকে প্রেরণার সামগ্রী জোগাত বাক্য তথা অর্থসম্পৃক্ত কথা বা সাহিত্য। সুতরাং বাক্য ও সুরের মিলন শুধু আধুনিক যুগেই নয়, বৈদিক যুগপ্রবাহেও বর্তমান ছিল। বৈদিক যুগে মন্ত্রের প্রকাশ ছিল তিন রকমভাবে: (১) পাঠ,—যাতে সুরের বা স্বরের কোন সংস্পর্শ থাকত না, (২) আবৃত্তিমূলক উচ্চারণ বা চাণ্ট্ (chant)—যাতে স্বর-সমাবেশে সুরের থাকত সহযোগ, আর (৩) গান—যাতে তাল, লয়, স্বর ও ছন্দের সঙ্গে মন্ত্রের ছিল সুরে লীলায়ন মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে। সুতরাং বাক্য বা মন্ত্রের

সুরবিহীন পাঠ ও সুরসম্পৃক্ত গান এই দু' রকম রীতিরই প্রচলন ছিল অতীতের যুগে এবং এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : "সুর-সম্মিলিত কাব্যের যুগল-রূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্র রূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে মন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হল"। খ্রীষ্টীয় ৫ম—১১শ শতকের সমাজে তাই দেখি আলাপ ও গানের অভ্যুদয়। আলাপে থাকে মাত্র স্বর-সঞ্চারণ, কাব্যময় কথার থাকে না তাতে সহযোগ, কিন্তু থাকে অর্থহীন বা সংকীর্ণার্থিক বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ, আর গানে থাকে কাব্য বা কথার সংস্পর্শ তাল, লয়, মূর্ছনা, অলংকার প্রভৃতি উপকরণকে নিয়ে। সুতরাং কথা ও সুরের দ্বন্দ্বরূপ-প্রচলনের ইতিহাস অতীব প্রাচীন।

কিন্তু নিরর্থক বা সার্থক বিচারের দিকে কর্ণপাত করে আর ক'জন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন : "সাংগীতিক চরক-সংহিতার মতে, তাকেই বলে সংগীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায়। কিন্তু ওস্তাদদের সাগরেদরা বলে সেটাই সংগীত সেটা গাওয়া হয় হিন্দুস্তানী-কায়দায়। ঐ কায়দার বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওরা বলে স্বৈরিণী, সাধু-সমাজের সে বার। সমঝদারের খাতায় যারা নাম রাখতে চায়, অন্যশ্রেণীর গানে রস পাওয়াই তাদের পক্ষে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ! কিন্তু আমরা চরক-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বলব—গানের রস যেখানে পাই সেখানেই সংগীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাকে বা না থাকে"। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের মতে "কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তাহলে কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হতে পারে বলে" মনে করা যায় না।

গানের সুরে ও কথায় শিবশক্তির সমরস-সংগতি রাখার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি বেশ স্পষ্ট ও পক্ষপাতিত্বহীন। তাঁর মতে, যাঁরা বলেন কথার অনুগত হোলে সুরের গতি আড়ষ্ট হয় এবং অলংকরণরূপ তান-কর্তবের সচলতার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর হোল যে, একদিকে কথার অতি-আক্রমণ দিয়ে স্ফূর্তি-স্বচ্ছলতার সামঞ্জস্য ভঙ্গ করা কলারীতির যেমন অভিপ্রায় নয়, তেমনি কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা-মিলন ভঙ্গ ক'রে সুরেরই কেবল একাধিপত্য স্থাপন করা যুক্তিসংগত নয়। সুরের যেমন রস ও ভাব সঞ্চার করার দায়িত্ব আছে, কথারও তেমনি। সুতরাং সংগীতে

রসসৃষ্টির ভার এককভাবে নয়, কথা ও সুরের সম্মিলিতভাবেই নেওয়া উচিত। উভয়ের দ্বৈতপ্রচেষ্টার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য ও সাম্য রক্ষা করা অসম্ভব নয়, বরং সত্যকারের কুশলী কলাকার যিনি, তাঁর পক্ষে সম্ভবই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথা ও সুরের দ্বন্দ্বপ্রচেষ্টায় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার সম্ভাবনা-সম্পর্কে বলেছেন: "অধিকাংশ ধ্রুপদগানে বাক্যের ঠাস-বুনানির মধ্যে অলংকারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার গৌরব বাড়িয়াছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব"।

এ'প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলাগানে কথা ও সুরের মধ্যে মৈত্রীভাবের কথারও উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আধুনিক বাংলাগানেও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীত কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি নিতে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্তানী কায়দা আপন পুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায়নি বাংলা কীর্তনগানে। তৎসত্ত্বেও বাংলাগানের নূতন ঠাট বাংলার বাইরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি আনন্দ দিয়ে থাকে এ' আমাদের পরীক্ষিত। দেয় না তাদেরই—সংগীত-ব্যবসায়িকতার বাঁধা বেড়ার মধ্যে যাঁদের মন সঞ্চরণে অভ্যস্ত"।

এখানে রবীন্দ্রসংগীতের কথাই ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের সমাদর আজ বাঙলার চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে শুধুই ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের সকল সুসভ্য দেশের নরনারীর অন্তরে সে তার আসন পেতে বসেছে। ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গানের ছক্ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের ছক্ বা কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন হোলেও আজ তা নিজস্ব একটি ছক্ সৃষ্টি ক'রে সকল মানুষের দরবারে সমাদর পেয়েছে। আনন্দরস সৃষ্টি ও বিতরণ করার সমান অধিকার লাভ করেছে রবীন্দ্রসংগীত হিন্দুস্তানী ও বাংলা অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতেরই মতো। তা ছাড়া তার নিজস্ব আবেদন বোধহয় আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে বেশী বই কম নয়।[১]

১। এ'প্রসঙ্গে 'সুর ও সংগতি' আলোচনাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে সংগীত-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাংলাগান বা বাঙলাদেশের গানের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছিলেন তাও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বাঙলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান ক'রে রাখতে হলে হিন্দুস্তানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে, প্রাণের দিকে

গানে কথা ও সুরের সহাবস্থাননীতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কথা বলেছেন। ছোট ও বড় এই তর্কের অবসর থাকে না—যদি অতীতের ইতিহাসের দিকে আমরা একবার অবলোকন করি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন: "চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে,—সুর বড় কি কথা বড় ঐ তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয়, তাহলে আমি বলব, এক্ষেত্রে সংগীতই স্বামী,—ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে। এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করেছে আনন্দের সঙ্গে"।

মধ্যযুগে ভারতের বিশিষ্ট সংগীতসাধকদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, তানসেন, স্বামী হরিদাস ও আরো কতশত হিন্দু ও মুসলমান সংগীত-সাধকরা ধ্রুবপদগান রচনা করেছেন বাক্য বা কথার সম্ভার দিয়ে, যদিও তাদের সকলগুলি গানের সাহিত্যে কাব্য-সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সামান্য দুএকটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে,

যেমন তানসেন-রচিত গান (ভৈরব—চৌতাল),

তুম হো গণপত দেব বুধদাতা,
শীষ ধরে গজশুণ্ড।
জোই জোই ধ্যাবত, সোই সোই ফল পাবত,
চন্দন লেপ কিয়ে ভুজদণ্ড ॥—প্রভৃতি

বৈজু বাওরা-রচিত গান (ভৈরবী—চৌতাল),

নিরঞ্জন নিরঙ্কার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর,
একহি অনেক হোয়ে ব্যাপো বিশ্বম্ভর।

ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি"। তারপর আবার একথাও বলেছেন: "বাংলাগানে হিন্দুস্তানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিলবে না দেখে পণ্ডিতরা যখন বলেন সংগীতের অপকর্ষ ঘটেছে তখন তাঁরা পণ্ডিতী স্পর্ধা করেন, সেই স্পর্ধা সবচেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্তানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, সেএ' সৃষ্টি প্রাণবান্, গতিবান; এ' সৃষ্টি সৌখীন বিলাসীর নয়—কলাবিধাতার"। 'সত্যই বাঙলা-দেশে শ্যামাসংগীত, টপ্‌খেয়াল, উমাসংগীত, নিধুবাবুর বাংলা টপ্পা, পদাবলীকীর্তন নূতন প্রাণচাঞ্চল্যেরই স্বাক্ষ্য দান করে।

অলখ জ্যোতি অবিনাশী জ্যোতি রূপ জগতারণ,
জগন্নাথ জগতপতি জগজীবন জগধর ॥—প্রভৃতি

স্বামী হরিদাস-রচিত গান (ভীমপলশ্রী—তেওরা),

নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট,
অমিত মনমথ মদ-বিমর্দন মৃদুল অভিনব
জলদ সুন্দর অঙ্গ।
তন দিপত দামিনী দূরকারী মুখ সুধাকর মনহারী,
কুটিল-দৃষ্ট কটাক্ষ-সংযুত চপল নয়ন কুরঙ্গ ॥—প্রভৃতি

নায়ক গোপাল-রচিত গান (মারবা—চৌতাল),

গ্রাম শ্রুতি মূরছনাকো ব্যোর জান
গাবে নব রস লিয়ে।
শুদ্ধ সালঙ্ক সঙ্কীরণ, ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ,
নিরখ করকে লিত সুর ধর হিয়ে ॥—প্রভৃতি।

বাক্য বা কথাবহুল তানসেন-রচিত গান (দেশ চৌতাল),

মুরারে ত্রিভুবনপতে ইন্দ্র সুরপতে
শোষনাগ-ফণাপতে।
বরুণ-সলিলপতে কৌস্তভমণি রতননপতে,
দিনকর দিননপতে, বিষ্ণু কমলাপতে।
শশিউড়গণপতে, হনুমান বলনপতে,
নারদ ভক্তনপতে, বীণাসাজতপতে।
চির-চিরজীবো শাহ অকবর নরনপতে
তানসেন-তাননপতে ॥

এ'রকম অসংখ্য ধ্রুবপদগান ও খেয়ালগানের নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে যাদের মধ্যে সাহিত্য-সম্পদের জৌলুস নাই, কিন্তু সুর আছে ও তাল আছে। তানসেনাদি বিদগ্ধ গান-রচয়িতাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : "আমাদের দেশে সাহিত্যসঙ্গবর্জিত সংগীত কণ্ঠের বা বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের আলাপে প্রকাশ পায়। * * তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কণ্ঠে পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে যুগপ্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরী আশ্রয় ক'রে। অনেক স্থলেই সে তরী সামান্য ডিঙি বা ভেলা। কাজ চালাবার জন্যে যাঁরা

সে তরী বানিয়েছেন তাঁরা যদি সে তরীকে অকিঞ্চিৎকর না ক'রে শিল্পভূষিত করতে পারতেন তাহলে বাহনের উৎকর্ষে আরোহীর সম্মানের লাঘব হতই সে তা কেমন ক'রে বলব? তানসেন প্রভৃতির গানে সাহিত্যের উৎকর্ষ যে সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে—তাও তো সত্য নয়। একথা মনে রাখতে হবে, সংগীতের সেবকতায় বাক্যকে গৌণভাবে আশ্রয় করলেও বাক্য আপন ধর্ম সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না, তার অর্থের জীর্ণচীরের মধ্য দিয়েও সাহিত্যের কুলশীল বেরিয়ে পড়ে"। আবার তানসেন প্রভৃতির রচনাকে সমর্থন ক'রে রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন: "নিরর্থক শব্দ আশ্রয় ক'রে সংগীত তেলেনা সারগম সৃষ্টি করেছে। গীতকলায় তাদের স্থান উচ্চশ্রেণীর নয়।[১] তানসেন প্রভৃতি গুণীদের রচনা সাহিত্য-ভাষা অবলম্বনেই আজ-পর্যন্ত টিকে আছে। সে ভাষা সাহিত্যের কো'ঠায় সব সময় উচ্চাসনের অধিকারী হয় না। তবু তাদের অভাবে রসের কিছু অভাব যদি না ঘটত তাহলে সংগীতে দেখা দিত তেলেনা-বর্গেরই আধিপত্য"।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের মতে, গানে কথা ও সুরের প্রায় সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কথা ভাবের বাহক হোয়ে শ্রোতার অন্তরে যোগায় অর্থের ও ভাবের ব্যঞ্জনা, আর সুরও রসের বাহক হোয়ে অর্থ ও ভাবকে করে রসায়িত এবং প্রতিষ্ঠিত করে গানে অনির্বচনীয়তার অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এভাবে না বললেও প্রকারান্তরে একথার সমর্থন ক'রে বলেছেন: "বস্তুত অকিঞ্চিৎকর হলেও গানে সাহিত্য গৌণ নয়। সূর্যের আলো মেঘের স্তর পেলে বাষ্পপুঞ্জে আপন রঙ ফলিয়ে দেয়। অতি সামান্য বাক্যকেও রঙিয়ে তোলবার সুযোগ পায় গান। * * সূর্যকিরণ যে তুচ্ছ মেঘের বাষ্পকেই মহিমা দেয় তা নয়, তাজমহলকেও ক'রে তোলে অপরূপ"।

'আমাদের সংগীত'-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগীতদর্শনের আদর্শেরও পরিচয় দিয়েছেন—যা প্রতিটি সংগীতশিল্পী ও সংগীতরসিকের পক্ষে অনুসরণীয়। তিনি চেয়েছেন, সংগীত-সাধনা এই সুখ-দুঃখপূর্ণ পৃথিবীর বুকেই চিরন্তন অমৃত-লোকের প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি বলেছেন: "সংগীত সেই আনন্দরূপ,—সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত বলেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের;

১। যদিও বিদগ্ধ হিন্দুস্তানী সংগীতের শিল্পীদের অভিমতে তেলেনা-ত্রিবট-সরগম প্রভৃতি ক্ল্যাসিক্যালশ্রেণী গীতরীতির সম্মান অন্যান্য শ্রেণীর গীতরীতির মতোই সমান।

রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন"। * * "কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবী কালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে, আফিস আদালতে কলে কারখানায় নয়। উপনিষদ্ বলেছেন, জন্মেছে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেছে অমৃতাস্তে ভবন্তি। * * অসীমের উপলব্ধিতেই সংগীত"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতে কণ্ঠ ও স্বর-সাধনা

বিদ্যা বা শিক্ষামাত্রই সাধনা-সাপেক্ষ। একমাত্র গুণনির্মুক্ত বস্তুতন্ত্র ব্রহ্মচৈতন্যই সাধনার অতীত, কিন্তু চৈতন্যাবরণরূপ অজ্ঞাননাশের জন্যেও সাধনার প্রয়োজন। তাই সাধনা ছাড়া বা প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন বস্তুরই সিদ্ধ রূপ মানুষের কাছে প্রতীত হয় না। সাধনা পথ বা উপায়, আর সিদ্ধি সমাপ্তি বা লক্ষ্য। তাই কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রাণী-স্তরে কর্মপ্রচেষ্টা বা সাধনার সার্থকতাকে স্বীকার করা হয়েছে। শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে ও দৈনন্দিন প্রতিটি কর্মে ও বিষয়ে সাধনার উপযোগিতা তাই সর্বজনস্বীকৃত।

সংগীতকর্মও সাধনসাপেক্ষ একথা বিশ্বের কর্মশীল ও চিন্তাশীল মানুষমাত্রেই স্বীকার করেন। বিশ্বের সকল রকম সংগীতশিক্ষায় কম-বেশী যত্ন, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার উপযোগিতা আছে। সংগীত সুখশ্রাবী শব্দকম্পনের পরিণতি স্বরসমূহের সমাবেশে সৃষ্ট। কিন্তু সাংগীতিক স্বরগুলি সাধারণ কথ্যশব্দ, ভাষা বা স্বররূপের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন, কেননা সম্পূর্ণ মিষ্টতা ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হোল সাংগীতিক স্বর এবং কথ্যস্বর বা শব্দ সুখশ্রুতিসম্পন্ন হোলেও গুণপরিমাণসত্তায় সাংগীতিক স্বর থেকে বেশ ন্যূন। কথ্যস্বরে মানুষের প্রযত্ন অপরিহার্য নয়, কিন্তু সাংগীতিক স্বর বা শব্দ প্রযত্নসাপেক্ষ। সাংগীতিক স্বরের প্রাকৃতিক বা দৈব প্রসাদগুণ ও মিষ্টতার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু সংগীতের স্বরের পুষ্টতা, ঋজুতা, বক্রতা, সাবলীলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্নিগ্ধতা, মিষ্টতা ও রসপূর্ণতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুসংযত ও সচেষ্ট সাধনার উপর। সকল দেশের সংগীতনিয়ামক শাসনতন্ত্র বা শাস্ত্র তাই স্বর-সাধনার উপযোগিতাকে স্বীকার করেছে। শাস্ত্র স্বীকার করেছে সংগীতের সার্থকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষার অপরিহার্য নীতিই তাই বারংবার অভ্যাস ও অনুশীলন। অভ্যাস ও অনুশীলন আবার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। অভ্যাসের অর্থ নির্ণয় ক'রে পাতঞ্জলদর্শনকার পতঞ্জলি বলেছেন 'তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ'; অর্থাৎ বারংবার

যত্ন করার নামই অভ্যাস। এই 'বারংবার যত্ন' কথার মধ্যে পাই কর্ম-প্রণোদিত সাধনার ইঙ্গিত এবং এই সাধনা কেবল সংগীতকর্মের সঙ্গেই নয়, মনুষ্য-জীবনের প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতীব প্রাচীন। আদিম যুগেও অনুন্নত সমাজবাসীর মধ্যে ছিল শ্রম-অপনোদনের ও আনন্দ-কামনার জন্যে গীত ও নৃত্য। সেই আদিম যুগ থেকে আজ-পর্যন্ত মানুষের সমাজে তার প্রচেষ্টায় ও চিন্তায় ভাঙাগড়ার কাজ হয়েছে অজস্র-ভাবে এবং সেই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সকল-কিছু। সেই সুদূর অতীতের অনুন্নত স্থূল রূপানুশীলনই ক্রমাবর্তিত ও বিভিন্ন যুগপ্রবাহবাহী হোয়ে বর্তমান বিবর্তিত রূপের হয়েছে সাক্ষী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও যোগসূত্র রক্ষা করেছে মানুষের অনুশীলনপ্রচেষ্টা বা সাধনা। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপানুশীলন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কালবাহী সমাজের বুকে এবং সেই অনুশীলনই ভারতবর্ষে শুধু নয়, সমগ্র দেশেই সার্থক সিদ্ধির প্রাণপ্রবাহকে করেছে প্রদীপ্ত। উন্নত ও অনুন্নত—সহজ ও সমৃদ্ধ সকল বিষয়বস্তু বা শিক্ষার রূপায়ণেই তাই অভ্যাস, যত্ন ও সাধনার পেয়েছি সাক্ষ্য। অনুর্বর আদিম, প্রাগ্বৈদিক, বৈদিক, ক্ল্যাসিক্যাল, পৌরাণিক, মধ্য ও আধুনিক-যুগবাহী সকল রকম সংগীতশিল্পের সার্থক রূপায়ণের পিছনে দেখি একনিষ্ঠ সাধনা ও কর্মসংগ্রামের রূপায়ণ। সুতরাং উনবিংশ-বিংশ শতকের রবীন্দ্রপ্রতিভাসৃষ্ট সংস্কৃতির প্রাণবাহী রবীন্দ্রসংগীতেও সাধনার উপযোগিতা যে থাকবে একান্তভাবে একথা স্বীকার করেন প্রতিটি বিচারবান মানুষই।

এতো গেল ইতিহাসাশ্রিত বিচার ও বৌদ্ধিক যুক্তির কথা। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ও অনুশীলন-নিষ্ঠার মধ্যেও প্রয়োজন আভিজাত্য ও আঞ্চলিক সংগীতকে সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে কণ্ঠসৌকর্য ও স্বরমাধুর্য। কিন্তু কণ্ঠসৌকর্য তথা কণ্ঠের প্রকাশ-সাবলীলতা ও সঙ্গে সঙ্গে সংযমশক্তির সার্থক রূপায়ণ হয় তখনই যখন একনিষ্ঠ সাধনা থাকে শিল্পীর পিছনে। স্বর কম্পনসমষ্টির ফলবিশেষ হোলেও তার নির্দিষ্ট একটি প্রকাশস্থান আছে এবং সংগীতশাস্ত্র তার পরিচয় দিয়েছে শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির মাধ্যমে। এই স্বরের সুষ্ঠু

ও পূর্ণ প্রকাশস্থানের নামই 'স্বরস্থান'। স্বরস্থানকে কেন্দ্র করেই স্বরের বিচিত্র বিকাশ হয় সার্থক এবং এই সার্থকতাই রাগের সম্পূর্ণ রূপের দেয় পরিচয়। রাগই সংগীতের প্রাণ এবং কথা রাগের সহকারী মাত্র। রাগের সার্থক রূপায়ণই তাই সংগীতের জীবনকে করে সমৃদ্ধ। সুতরাং সংগীতের শিক্ষার্থী বা অনুশীলনকারীর পক্ষে স্বরস্থান নির্ণয় ও স্বরের পূর্ণরূপ প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন স্বর-সাধনা এবং এই স্বর-সাধনার অপর নামই কণ্ঠমার্জনা বা কণ্ঠসাধনা। আবার মার্জনারূপ সংস্কারকর্মহীন স্বর-প্রকাশের নাম কণ্ঠবাদন, কণ্ঠসাধনা নয়। রবীন্দ্রসংগীতেরও সার্থক বিকাশ হয় শাস্ত্রীয় রাগ, তাল, লয়, রস, ভাব ও কথা বা সাহিত্যের সুষ্ঠ সাবলীল প্রকাশকে নিয়ে, সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতেও কণ্ঠসাধনা তথা স্বর-সাধনার অপরিহার্যতাকে মেনে নেওয়া তাই অসমীচীন নয়।

একথা অবশ্য সত্য যে, মার্জনা বা সংস্কারবিহীন অসংখ্য কণ্ঠের মধ্যেও পাই স্বরের প্রকাশস্বাচ্ছন্দ্য ও মিষ্টতা এবং সাধারণ নাগর ও পল্লী-জীবনযাপী মানুষের সহজ সরল গান ও স্বরবিকাশই তার নিদর্শন। পল্লী-বালক ও বালিকাগণের স্বভাব-সুন্দর সুমিষ্ট ও সতেজ কণ্ঠস্বর, বিচিত্র ব্রতানুষ্ঠানে কুমারী বালিকা ও পল্লীবধূগণের ছড়াগানে কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধুর্য, পল্লী-বাউলসম্প্রদায়ের উদাত্ত স্বচ্ছল সুকণ্ঠ প্রভৃতির নিদর্শনেও নিয়মিত কণ্ঠমার্জনা বা কণ্ঠসাধনার কোন প্রমাণ দেখি না বটে, কিন্তু গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত শিক্ষাসাপেক্ষ অভিজাত ও দেশী-সংগীতের বেলায় ঐ নিদর্শনকে আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা শিক্ষাশ্রেণীভুক্ত সংগীতের স্বর-প্রয়োগের নির্দিষ্টতা, সবলতা, কোমল-তীব্র স্বর-বিকাশের প্রয়োগকুশলতা এবং রাগ ও গানের অলংকরণচাতুর্য সাধারণ সাধনা-নিরপেক্ষ সংগীতের প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের রূপ, প্রকৃতি ও শিক্ষাপ্রণালীর কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র শ্রেণীর গান রচনা করেছেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ল্যাসিক্যাল রাগ-রাগিণী ও তালের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়গত সুর এবং রীতির সমাবেশ দিয়ে। হিন্দুস্তানী দরবারী সংগীতপর্যায়ের রীতিমত গিটকারি, তান, বিস্তার, বাঁট ও অলংকার-প্রয়োগের সমৃদ্ধি না থাকলেও মীড়, আশ, ছোট ছোট অলংকার ও তানরীতি, স্বরকম্পন প্রভৃতির প্রয়োগ

রবীন্দ্রসংগীতেরও অঙ্গাভরণ। অভিজাত ধ্রুবপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ বা গায়কীপদ্ধতি হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদ্ধতির অনুরূপ না হোলেও তার গাম্ভীর্য, রূপ ও পরিবেশ হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদেরই অনুরূপ। সুতরাং কণ্ঠের সৌকর্য এবং স্বরের বিশুদ্ধতা, দৃঢ়তা ও সংযত প্রয়োগকুশলতাও রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক রূপায়ণের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। তারি জন্যে কণ্ঠমার্জনা ও স্বর-সাধনার একান্ত উপযোগিতা দেখি রবীন্দ্রসংগীতের বেলায়ও। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, স্বর ও স্বরস্থান, স্বরের বিশুদ্ধপ্রয়োগ, মন্দ্র-মধ্য-তাররূপ সপ্তক, আশ, মীড়, অলংকার, ছোট ছোট গমক প্রভৃতির জ্ঞান একান্তভাবে রবীন্দ্রসংগীতের পথচরীদের পক্ষেও থাকা উচিত। তাল ও লয়ের বেলায়ও ঠিক ঐ এক কথা। কেননা তাল ও লয়-বিচ্যুত সকল শ্রেণীর সংগীতের মতো রবীন্দ্রসংগীতও অচল। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষেও কর্তব্য স্বর, রাগ, রাগের আরোহণ-অবরোহণক্রম, কথার উচ্চারণ ও প্রয়োগভঙ্গী, তাল এবং লয়ের রূপ ও প্রয়োগ প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রচেষ্টার নামই সাধনা। সাধন-বিহিনতা কোন শ্রেণীর গানেরই আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

তাছাড়া আরো এক কথা যে, হিন্দুস্তানী সংগীতধারার মতো অভিজাত কর্ণাটকী সংগীতধারারও কিছু জ্ঞান রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে থাকা উচিত। কেননা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় সংগীতের সকল শ্রেণীর গানের অঙ্গাভরণকেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন সাদর সম্ভাষণ তাঁর সংগীত ভাণ্ডারে। ক্ল্যাসিক্যাল হিন্দুস্তানী সংগীতকে তাই হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ না করেও তার রূপ, প্রকৃতি ও মাধুর্যসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কিছু অসম্ভব নয়, এবং সেই জ্ঞান প্রয়োজন ক্ল্যাসিক্যাল রাগ, তাল ও লয়াশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোভাবে জানার, সাধনার ও সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে। মোটকথা কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনাও রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু রূপায়ণে সহায়তা করে। সুষ্ঠু রূপায়ণই আবার সকল সংগীতে সৃষ্টি করে বিচিত্র রস ও ভাব, এবং সংগীত-সাধনার পথে আনে চরমসিদ্ধিরূপ পরমপুরুষার্থ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তাল-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রসংগীত যে ভারতীয় রাগ-সমৃদ্ধির অপরিহার্য উপাদান একথা পূর্বে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগ ও তালের সমাবেশকে স্বীকার করেছেন, যদিও কারু কারু অভিমত যে, পরবর্তী জীবনে তিনি বিশেষভাবে তালের ওপর বেশি জোর দেন নি।[১] মতভেদের কথা ছেড়ে দিলে একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানের সঙ্গে রাগ ও তালের সম্পর্ক নিবিড়। তবে তালবিহীন কতকগুলি গান যে তিনি শুধু রাগের সমাবেশ দিয়ে রচনা করেন্‌নি, তা নয়।

ছন্দ যে কবিতা ও গানের মধ্যে সাম্য রক্ষা ক'রে কাব্য ও সংগীত-মাধুর্যের বিকাশ সাধন করে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। মাত্রার বিচিত্র সমাবেশ সৃষ্টি করে 'তাল' এবং তাল ও গানের গতিই সৃষ্টি করে 'লয়'। ছন্দের বিশদ আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাব্যে ছন্দ ও গানে তাল: "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই"।

ছন্দ অর্থেরও প্রকাশ করে, আবার অর্থযুক্ত ছন্দঃরস সৃষ্টি করে। ছন্দ ও তাল সম ও বিষম ভেদে দুরকম হোলেও ছন্দ ও তাল বিচিত্র রকম

১। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত'-গ্রন্থে বলেছেন: "গুরুদেব প্রথমজীবনে, অর্থাৎ যতদিন বিষ্ণু, যদুভট্ট এবং তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সংগীতজ্ঞের আওতায় ছিলেন, ততদিন তবলা পাখোয়াজের তালের নিয়মকে অবহেলা করতে পারেন নি। সেই কারণে তখনকার গানগুলিকে নানা প্রকার তালের নাম দ্বারা চিহ্নিত করবার প্রয়াস দেখি। * * কিন্তু তার পরে এভাবে মৃদঙ্গ বা তবলার তালের নাম দেওয়া তিনি পছন্দ করেন নি, তাই জীবনের শেষ-পর্যন্ত বাকি গানের তালের কোনো নির্দেশ নেই" (আশ্বিন ১৩৫৬, পৃ ১৯৯)।

রসই সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলি রস"।

কবিতায় ও গানে যখন শুধু কথা থাকে, তখন অর্থের প্রকাশ হয়, কিন্তু কথা যখন 'তির্যক-ভঙ্গি ও বিশেষ গতি'-বিশিষ্ট হয়, তখন তা প্রকাশের অতীত হোয়ে অনির্বচনীয়তার স্তরে ওঠে। এই অনির্বচনীয়তার স্পর্শই ছন্দে, তালে, কথায় ও গানে রস সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রনাথের গানে যে সকল শাস্ত্রীয় রাগের সমাবেশ পাই, তাদের উল্লেখ করেছি 'রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণয়' পর্যায়ে। সুতরাং রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত সকল রকম রাগের ব্যাকরণসম্মত সুদীর্ঘ পরিচিতির উল্লেখ করা এখানে সমীচীন মনে করি না। রাগগুলির আরোহণ-অবরোহণের স্বরসজ্জা, বাদী-সংবাদী, অঙ্গ, পকড় ইত্যাদি লক্ষণ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে একথা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রসংগীতে কোন কোন রাগে রূপের বিকাশে প্রচলিত উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্তানী সংগীতপদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্ন, অথচ তারা বিধিসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—বেহাগ, ভৈরব, রামকেলী, আশাবরী, বসন্ত, পূরবী, মল্লার প্রভৃতি রাগের স্বর বা রূপ-বিকাশ ছিল বাঙলাদেশের বিষ্ণুপুর-ঘরাণার অনুযায়ী। তাছাড়া কতকগুলি রাগের স্বররূপে স্বাতন্ত্র্যও ছিল বাঙলাদেশে। উদাহরণ যেমন,

(১) রবীন্দ্রনাথ বেহাগে কখনো কখনো বেহাগ্‌ড়া বা বিহঙ্গড়ার মতো কোমল-নিষাদ ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো বা করেন নি। কোমল-নিষাদস্পৃষ্ট বেহাগের রূপ বিষ্ণুপুর-ঘরের ক্ল্যাসিক্যাল হিন্দুস্তানী গানেও পাওয়া যায়। যেমন—সা গ ম প, ন র্সা ন প, ম গ, ম প ণ প ম গ, 'ম গ র সা।

(২) ভৈরবরাগের লীলায়নেও অবরোহণে কোমল-নিষাদের স্পর্শ পাওয়া যায় বিষ্ণুপুর-ঘরাণায়। যেমন—সা ঋ গ, ঋ গ ম, ণ দ দ প, ম গ, প দ ন র্সা, র্সা ন দ প, ণ দ প, গ ম ঋ সা।

(৩) বসন্তরাগের রূপ-বিকাশেও মতভেদ আছে। প্রাচীন সকল ধ্রুবপদ-গানে শুদ্ধবসন্তের ব্যবহার অধিক দেখা যায় এবং তাতে শুদ্ধ-ধৈবত, কোমল-ঋষভ ও উভয়-মধ্যমের ব্যবহার এবং পরজ-বসন্তরূপা হিন্দুস্তানী

খেয়ালে ব্যবহৃত কোমল-ধৈবতের ব্যবহার নাই। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানে শুদ্ধ-বসন্তের ব্যবহার একান্ত অল্প, তার পরিবর্তে বাহাররাগের গানই বেশি, তবুও বসন্তের ব্যবহারে তিনি শুদ্ধ-বসন্তের রূপই পছন্দ করতেন। শুদ্ধ-বসন্তের রূপ—সা ম,-ম গ, ম ধ, ম ধ ন র্সা, র্সা ন, ঋ´ ন ধ ম গ, ক্ষ ম গ, ঋ সা। অধুনা হিন্দুস্তানী চালের 'র্সা ন দ, দ ম গ' এধরনের বিকাশ নাই। বিষ্ণুপুর-ঘরাণায় অবশ্য শুদ্ধ-বসন্তের ব্যবহারই দেখা যায়।

(৪) পূরবী বা পূর্বীর রূপ বাঙলাদেশে স্বতন্ত্র। হিন্দুস্তানীপদ্ধতির পূর্বীর রূপে কোমল-ধৈবত, উভয়-মধ্যম ও কোমল-ঋষভের ব্যবহার, কিন্তু বাঙলাদেশে ও বিষ্ণুপুর-ঝরাণায় পূরবীতে শুদ্ধ-ধৈবতের ব্যবহার। অথচ পূর্বী ও পূরবী একই রাগ। পূরবীর রূপ-বিকাশ—ন্ ঋ গ ক্ষ প, প ক্ষ প ন ধ প, ক্ষ গ ম গ, গ ক্ষ ধ ক্ষ, গ মগ ঋ গ, প ক্ষ গ ঋ সা। রবীন্দ্রনাথ পূরবীর এই রূপই গ্রহণ করেছেন।

(৫) রামকেলীর রূপ-বিকাশ বাঙলার বিষ্ণুপুর-ঘরাণায়—সা মগ ম প, ণদ দ প, ম ণদ র্সা, ণদ দ প, ণদ প, ম গ, ঋ সা ন্।

আসাবরীর স্বররূপেও কিছুটা মতান্তর আছে—অন্তত বাঙলাদেশের রীতি-প্রচলনের দিক থেকে। এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের প্রসঙ্গে বাঙলা ও ভারতবর্ষ এ'ধরনের ভৌগোলিক সীমারেখার কোন সার্থকতা আছে কিনা! আমরা বলি আছে এজন্যে যে, বাঙলাদেশে হিন্দুস্তানী রীতির ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর প্রচলন-কাল প্রাচীন নয়, কেননা ধ্রুবপদ, খেয়াল প্রভৃতির প্রচলন হয় বাঙলাদেশে আনুমানিক দু' শো বছর অথবা আড়াই শো বছর আগে। তার পূর্বে বাঙলার গান স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র সুর নিয়ে শিল্পী ও প্রেমিক-সমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙলার বাউল, পদাবলী-কীর্তন ও আঞ্চলিক সংগীতের বিকাশই তার নিদর্শন। তালের বেলায়ও বাঙলাদেশে স্বতন্ত্রতার প্রশ্ন ওঠে। বিষ্ণুপুরে যেভাবেই হিন্দুস্তানীপদ্ধতির অভিজাত গানের প্রচলন হোক না কেন, কতকগুলি রাগের রূপে স্বতন্ত্র বিকাশের ভাব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনে যেকোন কারণেই হোক বাঙলার বিষ্ণুপুরের প্রভাব পড়েছিল এবং তার স্বাধীন স্বতন্ত্র মন বাঙলার রীতিকেই যে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল একথা বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়েও সহজভাবে প্রমাণ করা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের যাঁরা

অনুসঙ্গী হোয়ে রাগের বিচার করবেন তাঁরা সর্বগ্রাহ্য উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্তানীপদ্ধতির রাগমার্গের অনুসরণ করলেও যে যে রাগ বাঙলাদেশের নাড়ীর সঙ্গে নিবিড় যোগ রেখে কয়েক শত বৎসর অনুশীলিত হোয়ে আসছে তাদের বিষয়েও চিন্তা করবেন। তাছাড়া অভিজাত সংগীতের বেলায় সংস্কৃত শাস্ত্রে রাগরূপের বিকাশ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই।

তালের অর্থ-পরিচয় 'রবীন্দ্রসংগীত-নিবন্ধসমীক্ষা'-আলোচনায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দিয়েছি। তাল-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলা যায়। তা ছাড়া ছন্দের সমাদর তাঁর সকল কবিতায় ও গানে পাই। ছন্দের বিচিত্র লীলায়নই তালের মধ্যে বিচিত্র রূপের সৃষ্টি করে। বেসুরো গান যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে বেদনাদায়ক ছিল, ছন্দ ও তালের স্বৈরাচারকেও তিনি বরদাস্ত করেন নি কখনো। তালের ব্যাকরণসম্মত গাণিতিক আলোচনা করা এ' গ্রন্থে উদ্দেশ্য নয়, তবে যে কতকগুলি তাল রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে, মাত্র তাদেরই এখানে কিছুটা পরিচয় দেব। এখানে ক্রমবর্ধিত মাত্রা অনুসারে তালের সমাবেশ করা হোল।

(ক) চার মাত্রার তাল হিসাবে রবীন্দ্রসংগীতে পাই কয়েকটি গান। যেমন ২+২=৪ মাত্রা বা ছন্দ।

(খ) পাঁচ মাত্রার তাল হিসাবে পাই ঝম্পকতাল—৩+২ বিভাগ অনুসারে। ঠেকা—ধি ধি না। ধি না। এর বিপরীত ২+৩=৫ মাত্রার সমষ্টি অর্ধ-ঝাঁপতাল। ঠেকা—ধি না। ধি ধি না।

(গ) ছ' মাত্রার তাল হিসাবে পাই দাদ্‌রাতাল—৩+৩, ঠেকা—ধি ধি না। না তি না। ২+৪ এবং ৪+২ কিংবা একেবারে বিভাগহীন ছ' মাত্রার তালের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের গানে পাওয়া যায়।

(ঘ) সাত মাত্রার তাল হিসাবে পাই তেওরা—৩+২+২; তবলের ঠেকা—ধি ধি না। ধি না। ধি না। পাখোয়াজের ঠেকা—ধা ঘেনে নাগ। গ দি। ঘেনে নাগ্। তাছাড়া ৩+৪=৭ এভাবে মাত্রার সমাবেশও তাঁর গানে আছে।

(ঙ) আট মাত্রার তাল হিসাবে পাই কাহারবা—৪+৪ এবং যৎ (আটমাত্রার; তবে বর্তমানে সাত মাত্রার যৎ-এরই প্রচলন বেশি)। কাহারবার ঠেকা—ধি ধি না তি। না ধি ধা ধি। আটমাত্রার যৎ-এর

ঠেকা—ধা ধিন্। ধাধা দিন। না তিন্। ধাধা দিন্। আটমাত্রা যৎ-এর ভিন্ন রকমের ঠেকারও প্রচলন আছে। বাঙলাদেশের সমাজে বাংলা গানে পূর্বে সাত মাত্রার পরিবর্তে আট মাত্রার যৎ-এরই প্রচলন ছিল। এখন আটমাত্রার যৎ-এর ব্যবহার লুপ্ত বললেও চলে।

আটমাত্রার রূপকড়াতালের ব্যবহারও রবীন্দ্রসংগীতে আছে। রূপকড়ার মাত্রা-বিভাগ—৩+২+৩; তবলের ঠেকা—ধা ধি না। ধি না। ধি ধি না। পাখোয়াজের ঠেকা– ধাগে তেটে তেটে। তাগে তেটে। কেটে তাগে তেটে।

(চ) নয় মাত্রার তাল হিসাবে পাই নবতাল। মাত্রার ভাগ—৩+২+২+২ এবং কাব্যছন্দ হিসাবে ৫+৪ এবং ৩+৬। আবার ৩+২+২+২ মাত্রাভাগের পাখোয়াজের ঠেকা—ধা দেন্ তা। তেটে কতা। গাদ ঘেনে। ধাগে তেটে।

পুনরায় ৫+৪ মাত্রাভাগের তবলের ঠেকা—ধা ধি না ধি না। ধি ধি ধি না এবং ৬+৬ বিভাগের ঠেকা—ধা ধি না। ধা ধি ধি না ধি না।

(ছ) দশ মাত্রার তাল হিসাবে পাই ঝাঁপাতাল—২+৩+২+৩; তবলের ঠেকা—ধি না। ধি ধি না। তি না। ধি ধি না। পাখোয়াজের ঠেকা—ধা গে। ধা গে দিন্। তা কে। ধা গে দিন্।

স্বরফাঁক্ বা সুলতালও দশ মাত্রার সমষ্টি। মাত্রাভাগ—৪+২+৪; পাখোয়াজের ঠেকা—ধা ঘেড়ে নাগ্ ধি। ঘেড়ে নাগ্। গ দি ঘেড়ে নাগ্। ৫+৫=১০ মাত্রার দু'ভাগ কাব্যছন্দ অনুসারে।

(জ) এগারো মাত্রার তাল হিসাবে পাই একাদশী। মাত্রাভাগ—৩+২+২+৪। পাখোয়াজের ঠেকা—ধা দেন তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে। ধাগে তেটে তাগে তেটে। কাব্যছন্দ অনুসারে মাত্রাভাগ—৩+৪+৪, তবলের ঠেকা—ধা ধি না। ধি ধি ধি না। ধা ধি তেরে কেটে।

(ঝ) বারো মাত্রার তাল হিসাবে পাই একতাল ও চারতাল বা চৌতাল। একতালের ছন্দভাগ—৩+৩+৩+৩ এবং তবলের ঠেকা—ধা ধি না। না তি না। কৎ তেটে ধিন্। তেটে ধিন্ তেটে। এই ভাগযুক্ত একতালের প্রচলন বাঙলাদেশের প্রাচীন গানে বিশ্লেষভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ৪+৪+৪ এই চতুর্মাত্রিক ভাগ হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে অধিক পাওয়া

যায়। তবলের ঠেকা—ধিন ধিন না না। ধিন্ না কৎ তে।* ধা তেরেকেটে ধিন্ না।

চৌতালের মাত্রাভাগ ২+২+২+২+২+২ এবং পাখোয়াজের ঠেকা—ধা ধা। দিন্ তা। কৎ তাগে। দিন্ তা। তেটে কতা। গদি ঘেনে। তাছাড়া এই বোলকে ৪+৪+৪ ভাগেও বিভক্ত ক'রে গাওয়ার রীতি আছে।

(ঞ) চৌদ্দ মাত্রার তাল হিসাবে পাই আড়া-চৌতাল, চৌদ্দ মাত্রার যৎ এবং ধামার। আড়া-চৌতালের মাত্রাভাগ—২+৪+৪+৪ এবং পাখোয়াজের ঠেকা—ধা গে। ধা গে দিন্ তা। কৎ তাগে দিন্ তা। তেটে কতা গদি ঘেনে। চৌদ্দমাত্রার যৎ-এর তবলের ঠেকা—ধা ধা ৷। ধা গে তিন্ ৷। না তিন ৷। ধা গে ধিন্ ৷।

ধামারের মাত্রাভাগ—৩+২+২+৩+২+২ অথবা ৩+২+২+৩+৪। পাখোয়াজের ঠেকা—(১) ক ধে টে। ধে টে। ধা ৷। গ দি নে। দি নে। তা ৷॥ অথবা—ক ধে টে। ধে টে ধা ৷। গ দিনে, দিনে তা ৷॥ হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ধামারের মাত্রা ভিন্নভাবে আছে।

(ট) পনেরো মাত্রার তাল হিসাবে পাই পঞ্চমসওয়ারি। মাত্রাভাগ—৪+৪+৪+৩ এবং তবলের ঠেকা—ধা ৷ কেটেতাগ্ থুন্ না কেটেতাগ। তেরে কেটে তাগ্ দিৎ তাকেটে দিন্ তা। তাগ্ তেটে তেটে তাগ্ নে ধা কেটে তাগ্। তাগ্ দিৎ ৷। তাগ্ দিৎ ৷॥

(ঠ) ষোলমাত্রার তাল হিসাবে পাই ত্রিতাল, কাওয়ালী বা কাবালী, আড়াঠেকা বা তিলবাড়, মধ্যমান প্রভৃতি। ত্রিতালের মাত্রাভাগ—৪+৪+৪+৪, তবলের ঠেকা—ধা ধিন্ ধিন্ না। না ধিন্ ধিন্ না। তা তিন্ তিন্ না। তেধে ধিন্ ধিন্ না॥ অবশ্য বিলম্বিত ত্রিতালের ঠেকা একটু ভিন্ন। যেমন, ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধিৎ তাগে তেরেকেটে ধি। না তিন্ তিন্ তা। কৎ তাগে তোরকেটে ধি॥

আড়াঠেকার মাত্রাভাগ—৪+৪+৪+৪, তবে আড়ে ও বিলম্বিতে। যেমন, ঘি ৷ ধা গি। ৷ ঘি তা ৷। কি ৷ তা গি। ৷ ঘি ধা ৷॥

মধ্যমানের মাত্রাভাগও ৪+৪+৪+৪। তবে অনেকে ষোলমাত্রারও দ্বিগুণ ক'রে বিলম্বিতে বাজান। কিন্তু আড়াঠেকা ও মধ্যমানের ব্যবহার বর্তমানে একরূপ অপ্রচলিত।

(ভ) আঠেরো মাত্রার তাল হিসাবে পাই নবপঞ্চতাল। এর মাত্রা বিভাগ—২ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪। পাখোয়াজের ঠেকা—ধা ধা। ধাগে তেটে দিন্ তা। তাগে তেটে দেন্ তা। তেটে কতা গদি ঘেনে। ধাগে তেটে তাগে তেটে।

গানে গতি-বিকাশের নাম 'লয়'। লয়-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার উল্লেখ করেছি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত হিসাবে লয় তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাল এই লয়কে অনুসরণ ক'রে প্রকাশ পায়। গানের বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন রকম গতির মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে। যেমন, অতিবিলম্বিত, ঈষৎ-বিলম্বিত, অতিদ্রুত ও ঈষৎ-দ্রুত। মধ্যলয় সমতারক্ষক বা balancing unit। ধ্রুবপদ ও খেয়াল বা খ্যাল গানের গতি তিন রকমভাবে সাধারণত প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের গানে তাল ও লয়ের স্থান সমাদৃত। তবে কতকগুলি গান লয়-বন্ধনহীন সেকথা পূর্বেই বলেছি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানে একাধিক তালেরও সমাবেশ দেখা যায়।[১]

১। তালসম্বন্ধে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য

নবম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয়

রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয়-ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে শিক্ষালাভ করেছেন যাঁরা তাঁর রচিত সংগীত (গান ও সুর) তারই নির্দেশের অনুবর্তী হোয়ে, তাঁদের কাছে বিধিবদ্ধ শ্রেণী-নির্দেশের প্রশ্ন হয়তো না আসাই স্বাভাবিক হোতে পারে, কিন্তু কালক্রমে রবীন্দ্র-সংগীতের অনুশীলন-আলোচনার ক্ষেত্র-পরিধি যতই ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও বিবর্ধিত হোতে চলেছে, ততই তার শ্রেণী-নির্দেশ বা শ্রেণী-নির্ণয়ের প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে নিয়মানুসারী ও শৃঙ্খলতাসেবী বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অনুশীলকদের মধ্যে। তাছাড়া এ' প্রশ্ন জাগ্রত হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয় অন্তত শিল্পী-সাধারণের সমাজে। অভিজাত শাস্ত্রীয় বা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের অনুশীলন খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে ভারতবর্ষীয় সমাজে। আঞ্চলিক বা দেশী (অভিজাত দেশী নয়) সংগীতের প্রচলন-কালও বড় কম প্রাচীন নয়, বরং তাকে সুপ্রাচীন আদিমযুগের শিল্প-সামগ্রীর শ্রেণীভুক্ত করা অসমীচীন নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক সংগীত তথা 'ফোক্-মিউজিক' বা 'ফোক-সঙ্'-এর কথা ছেড়ে দিলে এক ভারতবর্ষেই যত রকম জাতি তাদের ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার মাধ্যমে যত রকম দেশসীমা ও বর্ণসীমা সৃষ্টি করেছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তত রকম ভাষা, চিন্তা ও প্রকৃতি নিয়ে আঞ্চলিক বা দেশী সংগীতরূপের বিকাশও সম্ভব হয়েছে। জাতিতে হিন্দু, মুসলমান কিংবা পার্শী প্রভৃতি হোলেও ধর্মীয় বিশ্বাসে, ভাষায় ও আচার-অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য বা অন্তর্বিভেদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং তাতে ক'রে বিভিন্ন মহান্ জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত রকম শ্রেণী এবং সেই সেই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সামগ্রী-রূপে রূপায়িত হয়েছে বিচিত্র রকমের আঞ্চলিক বা দেশী গীত বা সংগীত। তারি জন্যে

বিভিন্ন জাতির গানের ভাষায়, ছন্দে, সুরে ও প্রকাশভঙ্গীতে দেখা যায় বৈচিত্র্য, যদিও সেই বৈচিত্র্য কেন্দ্রান্বিত হয় পরিশেষে একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের রসানুভূতিতে পর্বত-নিসৃত বিচিত্রাভিমুখী অসংখ্য স্রোতস্বিনীর অখণ্ড এক সাগরে মিলনের মতো।

'গীতবিতান'-এর বার্ষিকী (১ম বর্ষ, মাঘ ১৩৫০) সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তী-লিখিত 'গানের গান'-প্রবন্ধটির কথা এখানে মনে পড়ে। 'গানের গান' বলতে লেখক 'রবীন্দ্রগীতসৌধের বিশেষ একটি আশ্চর্য নির্দিষ্ট মহল'-কে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'কত বিচিত্র নতুন প্রসঙ্গের গানের কথা' রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন। অনুশীলন করলে সেই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে কতকগুলি বিশেষ পর্যায়েরও সন্ধান পাওয়া যায়। অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে : "পরিবেশের পার্থক্যে এক একটি গান নূতনতর উজ্জলতায় দেখা দেয়, গানের মালায় তার রঙ বদ্‌লায়। * * রবীন্দ্রনাথের গানে কোনোখানে কথায় ও সংগীতে মাধুরীর ছেদ নেই, সমগ্র গানের স্বকীয়তা দুয়ের যুগাত্মক, কিন্তু বিশ্লেষণের কালে কাব্যের দিক থেকেও গানের বিচার সম্ভবপর"। সেদিক থেকে অমিয়বাবু রবীন্দ্রনাথের গানের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন।

প্রথম পর্যায়ের স্বরূপ হোল : "যিনি গান শুনছেন, গান শোনাবার তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে, তিনি স্বয়ং সুরস্রষ্টা। সমস্ত রূপলোকই তাঁর সংগীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন ধ্রুবপদ, সেই বিশ্বতানে জীবনকে মেলাতে হবে। * * শুভ্র নব শঙ্খে বাজে তাঁর সুর, পিনাকে লাগে তাঁর টংকার, বক্ষে বাঁশি বাজিয়ে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তকে তিনি সৃষ্টির নৃত্যে মাতান ; আঘাতে আঘাতে ঝঙ্কৃত হয় তাঁরই স্পর্শ জীবনের তারে, নিঠুর মূর্ছনায় গানের মূর্তি সঞ্চার করেন তিনি। তিনিই আসেন নীরব মহামন্ত্রে, গভীর রজনীতে ; কবির হৃদয়-বাঁশি কেড়ে নিয়ে আপনি বাজান, গ্রহ শশি যে-তান শুনে অবাক্, সেই জীবন-মরণপারের সুর অকূল তিমিরে শুনতে থাকেন কবি"।[১] এ' গান কবির কৌতুকময়ী জীবনদেবতার অন্তর-প্রেরণার দান। এই নৈসর্গিক ও দেবতার দানই কবির যেন প্রথম পর্যায়ের গান।

অমিয় চক্রবর্তীর অভিমতে : "কখনো গান শোনার আনন্দই তাঁর গান,

১। 'গীতবিতান বার্ষিকী' (১৩৫০), পৃঃ ১২৪

সুর-সুরধুনির স্রোতে আপন গীত-সমর্পণে তিনি ধন্য। গীতময় প্রত্যুত্তর দেবার পালা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'গানের গানে' বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে"। এই গানের দ্বিতীয় পর্যায়ে যেন "কোনো একটি পুষ্পিত পর্ব নেই যাকে রবীন্দ্রনাথের গানে বাঁধা হয় নি; ফল-ফসলের গান, শূন্য মাঠের গান, জল-ঝরানোর দিনের মর্মরতা তাঁর গানের ঋতুচক্রে আবর্তিত। * * মাটি ও আকাশের সমাবর্ত, তাপ ও আলোর অনুষ্ঠান, ঋতুলগ্নগুলির সঙ্গসমারোহ কবির গানে ভাষা পেয়েছে। প্রকৃতির নিত্য-সৌন্দর্য-বিভিন্নতা তাঁর অজস্র নূতন গানকে সঙ্গে নিয়ে এল। এই তাঁর গীতিময় প্রত্যুত্তর"।

আর 'গানের গান' বলতে "সব চেয়ে নির্দিষ্টভাবে তৃতীয় একটি গীত-পরিধি নির্ণয় করা যায়"। উৎসবে অনুষ্ঠানে গান বাঁধতে তাঁর ভালো লাগত; নূতন নূতন গান রচনা ক'রে কবি কত আনন্দ পেয়েছেন তা আমরা জানি। "নিজের মনে গান গেয়েছেন, অন্যকে শুনিয়েছেন; সুখে দুঃখে তাঁর গান সংসারে শান্তি এনেছে, ভালোবাসা ভরে দিয়েছে"। এরই প্রসঙ্গ দেখি তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের গানে।

তাছাড়া অজিতবাবুর আর একটি কথা হোল—পূজা ও প্রেম এই দুটি ভাগে সাজানোর গান রবীন্দ্রনাথের গীতলীলায় সৃষ্টি করেছে এক যুগান্তর। তিনি বলেছেন: "পূজা-অংশে প্রধানতঃ সুরস্রষ্টার কথা আছে, বিশ্বলোক যার রাগিণী; বিশেষভাবে 'পূজা'-র প্রথম কয়েকটি গানে। গান যেখানে ভক্তিরসে বিধৃত, কবির নিজের সংগীতও সেখানে পূজার পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। 'প্রেম'-অংশে দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে গীতলীলা, বিশেষভাবে কবির আনন্দময় আসন সুখ-দুঃখের সুরে শিল্পীত এই গান। কিন্তু পূজা ও প্রেমের মধ্যে তো ছেদ নেই; কবির সংকল্পিত গীতবিতানে তাই লীরিকের মালা গাঁথা হয়েছে বিশেষ উপভোগের জন্য; ভাবের বিভিন্নতা কিন্তু রক্ষা হয়নি। গীতবিতানের প্রথম খণ্ডের প্রায় সমস্তখানি 'পূজা'; তার অন্তর্গত ৬২৯ গানকে একুশটি স্বতন্ত্র নামে ভাগ করা হয়েছে, যেমন 'গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, দুঃখ, আত্মবোধন' ইত্যাদি; এর মধ্যে বহু গানকেই অন্য ভাবেও দেখা চলে"।[২] মোটকথা গীতবিতানের মালঞ্চে যে কোনোখান থেকে কতকগুলি গান তুলে নিলে তার মধ্যে বিশ্বগীতস্রষ্টার

২। 'গীতবিতান বার্ষিকী' (১৩৫০), পৃঃ ১২৬

গান এবং কবির আপন গান এই দুই পর্যায়ের রচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া পূর্বে আলোচনা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বাংলা সংগীতের শুধু কেন, ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ-রূপে। তবে বাঙলাদেশের সংগীত-বিকাশের রূপ ছিল চলমান অথচ কেন্দ্রায়িত। দিল্লী ও আগরা থেকে আগত বিদগ্ধ মুসলমান সংগীতশিল্পীদের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছিল তখন বিশেষভাবে বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে। বাঙলাদেশে হিন্দুস্তানী গীতিরূপ ধ্রুবপদ, খেয়াল বা খ্যাল, ঠুংরী ও টপ্পার প্রচলন হয় অনেক পরে, অর্থাৎ আজ থেকে আনুমনিক দেড়শো-দুশো বছর আগে। তার পূর্বে বাঙলার নিজস্ব সংগীতসম্পদ ছিল বাউল, কৃষ্ণকীর্তন, পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, রামপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত ও বৈঠকীচালে বাঙলার স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে টপ্‌খেয়াল।

অনেকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে টপ্‌খেয়াল-গীতরীতির প্রবর্তক বলে স্বীকার করেন—যেটা স্বভাবতই অযৌক্তিক, কেননা বাঙলার ইতিহাসের পাতায় এ' স্বীকৃতির কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও তৎসাময়িক গীতিকার ও সংগীত-রচয়িতাদের পূর্বসমাজেও বাঙলাদেশে টপ্‌খেয়াল-গীতরীতির বহুল প্রচার ও প্রচলন অব্যাহত ছিল। দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাঙলার গীতরসিক-সমাজে বিশেষভাবেই সমাদৃত ছিল। দাশরথী রায়ের পর শ্রীধর কথকের যুগকে একটি নবজন্মের যুগসূচনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীধর কথক কথক-বংশজাত হোলেও নিজে ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞানী ও শিল্পী। শোনা যায়, বাংলা টপ্পাগানের তিনিও ছিলেন একজন বিদগ্ধ সাধক। পূর্বতন বাঙলার নিজস্ব সরল ও নিরাভরণ বাংলাগানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনিও টপ্‌খেয়ালগান পরিবেশন করতে পারদর্শী ছিলেন।

সংগীতরসিক শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালও বলেছেন যে, শ্রীধর কথক মূলত ছিলেন সংগীতজ্ঞানী ও সুরকার এবং তাছাড়াও ছিলেন কথক। কোন কোন সময়ে সংগীত-ব্যবসায় হিসাবে তাঁকে বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেও গান গেয়ে বেড়াতে দেখা গেছে। বাঙলার টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল-গানের তিনিও ছিলেন একজন সুনিপুণ শিল্পী এবং যে সকল মর্মস্পর্শী গান তিনি রচনা

করেছিলেন তাঁর সহজাত কবিপ্রতিভা নিয়ে, সেগুলি নিধুবাবু-রচিত টপ্পাগানের চেয়ে কোন অংশেও নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রীধর কথকের পরবর্তী কালে নাথু খাঁ, রমজান মিঞাঁর মাতা ইমামবাঁদী, রমজান খাঁ নিজে ও শ্রীজন বাঈ প্রভৃতি পশ্চিমী তথা হিন্দুস্তানী অভিজাত টপ্পা-গায়করা বাঙলায় বসবাস করার জন্যে বাঙলদেশের টপ্‌খেয়াল আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল বলা যায়। নিধু বাবুর সময়ে বাংলা টপ্পাগানের গঠন ও প্রকাশভঙ্গী যে ধরনের ছিল, ঐ সকল অভিজাত মুসলমান টপ্পা-গায়করা বাঙলার সমাজে যখন টপ্পাগান শিক্ষা দিতে লাগলেন তখন ঐ পূর্বতন টপ্পাগানের রূপে কিছু কিছু অলংকরণের নূতন মিশ্রণ ঘটেছিল, ফলে বাঙলার টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল গান যে কিছুটা নূতনতর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল একথা স্বীকার করা যেতে পারে। বাঙলার বিদগ্ধ গায়কমহলে তার প্রকাশ এবং প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল বিশেষভাবে। হরিণাভির অঘোরনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ধ্রুবপদ-গীতিরীতির একজন বিশিষ্ট পরিবেশক, কিন্তু তাহলেও বাঙলা টপ্‌খেয়াল ও টপ্পা পরিবেশন করতেন তিনি সুষ্ঠুভাবে। একদিক থেকে স্বীকার করা যায়, অঘোরবাবু প্রভৃতির সুগাত বাংলা টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল-গানের ধারক ও বাহক-রূপে লালচাঁদ বড়াল, ললিত লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাম চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমানে বাঙলার প্রসিদ্ধ ধ্রুবপদশিল্পী শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টচার্য প্রভৃতির অভ্যুদয় বাঙলার সমাজে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল লিখেছেন যে, উস্তাদ শশিকুমার, হরিদাস মোদক, বক্রেশ্বর মোদক এবং যদু চণ্ডালও বাংলা টপ্পা ও টপ্‌খেয়ালের অনবদ্য রূপকার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বাঙলার এ' সকল শিল্পী ও রূপকারদের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, কালীমোহন বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতজ্ঞানীদের রচিত গান ও সংগীতগ্রন্থ উনবিংশ শতকের বাঙলার গীত-রসিকদের সংগীতরুচি ও সংগীত-সাধনাকে প্রাণদীপ্ত করেছিল। প্রসিদ্ধ যদুভট্ট, রাধিকামোহন গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এঁদের সমসাময়িক অন্যান্য গীতশিল্পী ও সংগীত-রচয়িতাদের অবদানসম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেতন

ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বাঙলার স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীরও বিশেষ যোগসূত্রের বন্ধন তো ছিলই। রাধিকা-প্রসাদ বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরের দরবারে নিযুক্ত শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে, কিছুদিন মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপাল চক্রবর্তী বা নুলো গোপালের কাছে এবং কিছুদিন বিষ্ণুপুরের বিদগ্ধ গায়ক যদু ভট্টের কাছেও সংগীত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে শেষ সংগীত-শিক্ষকরূপে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর সহযোগী ছিলেন সংগীতজ্ঞানবিচক্ষণ শ্যামসুন্দর মিশ্রও। সে' সময়ে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আদি-ব্রাহ্মসমাজের গায়কের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং প্রায় দশ বৎসর সংগীত-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ গোস্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদপদ্ধতির গান বাংলায় রূপন্তরিত করেন। রবীন্দ্রনাথও গোস্বামী বা 'গোসাইজী'-সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন: "রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণার রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রূপ সঞ্চার করিতে পারিতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশি"। তারপর একদিকে উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির এবং অপরাদকে বাঙলার নিজস্ব টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, পদাবলীকীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, গম্ভীরা প্রভৃতি অভিজাত ও দেশী গীতশ্রেণী এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের সুর-সৌন্দর্য এবং গীতরীতি রবীন্দ্রনাথকে গান-রচনা ও সুর-যোজনায় পথে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাশ্চাত্ত্যের কিছু কিছু সুর বা মেলাডিও রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল মনে রেখাপাত করেছিল। তারি জন্যে বলা যায়, হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল গান, বাঙলার নিজস্ব গীতিরূপ এবং পাশ্চাত্ত্যের কিছু কিছু সুর এই ত্রিবেনীসঙ্গম রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভাকে মুখর ও মহিমময় করেছিল। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানের তথা রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণয়-ব্যাপারে তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমের পূর্ণরূপটির দিকে।

এবার আলোচনা করবো রবীন্দ্রনাথ-রচিত ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা

ও দেশী-প্রকৃতি গানগুলির, কেননা এই গানগুলির পরিবেশনভঙ্গীর নিদর্শনই রবীন্দ্রনাথের গানের শৈলী ও শ্রেণী-নির্ণয়-ব্যাপারে সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গান-রচনার মধ্যে পাই একটি সার্বিক দৃষ্টি ও সমষ্টিকরণের বৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, তেওরা, রূপক প্রভৃতি তালে ধ্রুবপদাঙ্গে। তাছাড়া একতাল, ত্রিতাল, মধ্যমান, যৎ, রূপকড়া, কাহারবা, দাদরা, ঢিমা, কাওয়ালি, তেওট, তালফেরতা, খেমটা প্রভৃতি তালেও তাঁর রচিত গান অনেক। কীর্তনাদি গানের তালও কম নয়। এ' সকলগুলি তালই শাস্ত্রনির্দিষ্ট। আর রাগ হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন ভূপালী, তোড়ী, ঝিঁঝিট বা ঝিঁঝৌটি, কেদারা, গান্ধারী, জোয়ানপুরী বা জৌনপুরী, আসাবরী, কামোদ, শঙ্করা, বেহাগ, খাম্বাজ, পিলু, বারোয়াঁ, শ্যাম, পুরিয়া, ইমন-পুরিয়া, ইমন, ইমন-কল্যাণ, কল্যাণ, খট, বাহার, বসন্ত (যদিও শুদ্ধবসন্তরাগের গান অত্যন্ত কম অর্থে নাই বললেই চলে), ছায়ানট, ভৈরব, ভৈরবী, ললিত, বড়হংসসারঙ্গ, সারঙ্গ, মধুমাধবী, লুম, বিভাস, যোগিয়া, জয়জয়ন্তী, মল্লার, গৌড়মল্লার, নটমল্লার, হাম্বীর বা হামীর, দেশ, দেশকার, সুরট, আলাহিয়া, বিলাবল, ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী, গুর্জরী, আড়ানা, কানাড়া, সিন্ধু, কাফী, প্রভৃতি। মোটকথা শাস্ত্রনির্দিষ্ট রাগ ও তালকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন তাঁর গানের অনুসঙ্গী ক'রে। স্বকীয় প্রতিভায়ও রচনা করেছিলেন তিনি কতকগুলি রাগ ও তাল। রাগের মিশ্রণধারার পরিচয়ও পাই তাঁর গানে। বাঙলার বিষ্ণুপুর-ঘরের (ঘরাণার)[১] রাগরূপকে তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করলেও

১। 'ঘরাণা'-শব্দটির অর্থ নিয়ে মতবাদ কম নেই। 'ঘরাণা'-শব্দের আসল অর্থ রীতি, প্রকাশপদ্ধতি, চাল বা ইংরেজীতে ষ্টাইল, স্কুল। কোন এক বিদগ্ধ শিল্পী ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য-প্রচলিত ধারাকে নিয়ে অথবা স্থান বা শিল্পসংস্থাকে নিয়েও ঘরাণার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে অতীতে। এই ঘরাণার প্রকৃতির মধ্যে তাই পাই এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ও আভিজাত্যের নিদর্শন। সংগীতসংস্থা বা সংগীতকেন্দ্রকে নিয়ে ঘরাণা-শব্দটির জন্মকথার ইতিহাস পাই ১৫শ-১৬শ শতকেরও পরবর্তীকালে এবং গবরহারা (গৌড়ীহার), খাণ্ডার, ডাগর ও নওহার বা নৌহার বাণীগুলিই তার সাক্ষ্য। তাছাড়া রামপুর, বেতিয়া, বারাণসী প্রকৃতি স্থান বা অঞ্চলগুলিও ঘরাণার অর্থ-সার্থকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'গবরহার' শব্দটি আসলে গোয়ালিয়র-অঞ্চলের সংগীতধারা বা গীতশৈলীর প্রকাশক। তেমনি 'খাণ্ডার' রাজস্থানের একটি স্থান কিংবা স্থানের গীতিশৈলীর নাম; 'ডাগর' উত্তর প্রদেশের কোন

ইতিহাসাশ্রিত রাগরূপের মর্যাদাকে অস্বীকার করেন নি কোনখানেও। দক্ষিণী রাগ ও তালের অনুকরণ করেও রাগ এবং তাল রচনা করেছেন তিনি তাঁর সংগীত-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্যে সেকথা আগেই বলেছি। তাঁর পরিকল্পিত নবতাল, একাদশী প্রভৃতি নূতনতার নিদর্শন। নৃত্য-পরিকল্পনার বেলাও তাই। তাছাড়া বাংলা ও আঞ্চলিক গান ও সুরগুলির অনুকরণ এবং অনুসরণেও তাঁর নিজস্ব গানে মিশ্রণের কাজ করেছেন যাদুকরের মতো। সুতরাং শাস্ত্র ও সাধারণ এই উভয় দৃষ্টিই ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একান্ত-ভাবে। তবে কখনো কখনো শাস্ত্রশাসনের অমর্যদা না করেও আবার নূতন দৃষ্টি ও সৃষ্টির পথকে অনুসরণ করতে তিনি পশ্চাদপদ হন নি। সহজাত

এক স্থান বা অঞ্চল, অথবা সেই অঞ্চলের গীতি-প্রকাশশৈলী এবং 'নওহার' বা 'নৌহার' রাজস্থানের কোন এক স্থান বা স্থানে গীতিশৈলী। সুতরাং দেখা যায়, শিল্পী, শিল্পসংস্থা বা অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও 'ঘরাণা' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। এ' সম্বন্ধে সংগীততত্ত্ববিদ্ শ্রীরবীন্দ্র লাল রায় তাঁর নূতন 'সঙ্গীতে শাস্ত্রী ও কলাবিৎ' (১ম ভাগ, ১৩৭২)-গ্রন্থে এই ঘরাণা-নির্দেশক বাণীসম্বন্ধে এক নূতন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ওয়াজেদ আলি সা-র দরবার-গায়ক হাকিম মহম্মদ করম্ ইমাম-লিখিত 'মাদনুল মুসিকী' (১৮৫৬)-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : "সম্রাট আকবরের সময় দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—গোপাল লাল এবং বৈজু বাওবা। * * কিন্তু গন্ধর্বদের মধ্যে চারজন সম্রাটের বিলাস-ব্যসনের প্রলোভনে আকৃষ্ট হন। ইহার মধ্যে প্রথম তানসেন। ইনি মকরন্দ নামে গৌড়-ব্রাহ্মণের পুত্র। * * দ্বিতীয় ব্রিজচন্দ, ইনিও ব্রাহ্মণ এবং দিল্লীর নিকটবর্তী ডাগর নামক স্থানের অধিবাসী। তৃতীয় রাজা সমোখন সিং, ইনি খাণ্ডার নামক গ্রামের রাজপুত। চতুর্থ শ্রীচাঁদ, ইনি নুহা নামক স্থানের রাজপুত। এই চারজন সম্রাটের সভাসদ ছিলেন * *। এই চারজন কলাবন্ত হইতে গোরারী, ডাগরী, খাণ্ডারী এবং নুহারী এই চার বাণীর সৃষ্টি হয়। কিছু সঙ্গীতজ্ঞ ভুল করিয়া গোরারীকে গোবরারী বলিয়া থাকেন। * *" (পৃ: ২৮—২৯)। শ্রীগোবিন্দ বিদ্যার্থী 'সংগীত-নাটক আকাদামী'-র বুলেটিন ১৩-১৪ সংখ্যায় 'মাদনুল মুসিকী'-গ্রন্থের কিছু অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। তিনি 'The Method of Alap' আলোচনায় মূলের অনুবাদ করেছেন : In the beginning, Alap originated from Mahadeo in *Narg Paani*, that is to say, the *Bani* of the inhabitants of Nether World Among the three *Banis*, mentioned earlier, this *Bani* is most delicate and beautiful. * * On the contrary, *Dagari* and *Bhakri Banis* are harse"। ঘরাণা-নির্দেশক বাণীসম্বন্ধে আরও যে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা নাই, তা নয়। মোটকথা গায়কীরীতির বোধক গীতিশৈলী বা বাণীগুলির সৃষ্টি হয়েছিল যে স্থান ও শিল্পী বা শিল্পীদের গায়কীপদ্ধতি থেকে সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিভার ধারা বা প্রকৃতিই তাই যে, সে পুরাতনের পাশাপাশি নূতন সৃষ্টির পথকে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাই এর প্রত্যক্ষ পরিচয়।

এবার আপন অনুসন্ধানবৃত্তি ছাড়াও সাহায্য গ্রহণ করেছি শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী-সংগম' ও শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার দাস-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থ-দুটির রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাশ্রেণীর কিছু কিছু নিদর্শন দেবার জন্যে ; কেননা বিশেষভাবে সেগুলি সাহায্য করবে আমাদের রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান বা রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণয়-ব্যাপারে।

রবীন্দ্রনাথ চৌতাল প্রভৃতি তালে যে ধ্রুপদাঙ্গ বা ধ্রুবপদপ্রকৃতির গান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে,

(১) **তিনি চৌতালে রচনা করেছেন,**

(ক) ডুবি অমৃতপাথারে—ললিত,
(খ) কেমনে ফিরিয়া যাও—ভৈরবী,
(গ) এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ—আসাবরী,
(ঘ) জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে—বিভাস
(ঙ) প্রভাতে বিমল আনন্দে—গুর্জরী-তোড়ী,
(চ) আজি হেরি সংসার অমৃতময়—বিলাবল,
(ছ) শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে—ইমনকল্যাণ,
(জ) তোমারি সেবক করো হে—ছায়ানট,
(ঝ) তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন—বড়হংসসারঙ্গ
(ঞ) ভয় হতে তব অভয়মাঝে—বেহাগ
(ট) হে মহাপ্রবল বলী—কানাড়া, ইত্যাদি।

(২) **সুরফাঁকতালে রচিত গান,**

(ক) শান্তি করো বরিষণ - তিলককামোদ,
(খ) সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল—ইমনকল্যাণ
(গ) দেবাদিদেব মহাদেব—দেবগিরি,
(ঘ) প্রথম আদি তব শক্তি—দীপক,
(ঙ) আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি—ভৈরবী, প্রভৃতি

(৩) ধামারতালে রচিত গান,

(ক) আজ রাজ-আসনে তোমারে—বেহাগ,
(খ) মম আঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে—বাহার,
(গ) হৃদি-মন্দিরদ্বারে বাজে—কেদারা,
(ঘ) গরব মম হরেছ প্রভু—দেশ,
(ঙ) অমৃতের সাগরে—কামোদ, প্রভৃতি।

(৪) আড়াচৌতালে রচিত গান :

(ক) সব আনন্দ করো—দেবগিরি-বিলাবল,
(খ) শুভ্র আসনে বিরাজো—ভৈরব, প্রভৃতি।

(৫) তেওরাতালে রচিত গান,

(ক) আজি এ'আনন্দ-সন্ধ্যা—পূরবী,
(খ) আমার মিলন লাগি তুমি—বাগেশ্রী-বাহার,
(গ) জড়ায়ে আছে বাধা—মিশ্রসাহানা,
(ঘ) দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—বেহাগ,
(ঙ) আলোয় আনন্দময় করে হে—ভৈরব,
(চ) বিপুল তরঙ্গ রে—ভীমপলশ্রী, প্রভৃতি।

(৬) ঝাঁপতালে রচিত গান,

(ক) কেন বাণী তব নাহি শুনি—ভৈরব,
(খ) নিত্য নব সত্য তব—শুক্লবেলাবলী,
(গ) পেয়েছি অভয় পদ—খট্,
(ঘ) মহাসিংহাসনে বসি—ভৈরবী,
(ঙ) হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ' নিকেতনে—ললিতা-গৌরী, প্রভৃতি।

তাছাড়া কাওয়ালি, একতাল, আড়খেমটা, ঢিমাত্রিতাল, রূপক, কাহারবা, নবপঞ্চ, রূপকড়া, একাদশী, যৎ, মধ্যমান প্রভৃতি তালে রচিত কবির গান অসংখ্য। বাউলভাঙা গান 'কবে তুমি আসবে বলে আমি রইবো না বসে,' 'আজি সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে', 'পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে', 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে', 'কোন্ আলোতে আশার প্রদীপ

জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে', প্রভৃতি। কিংবা বাউলমিশ্রিত বা বাউলপ্রকৃতির গান 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন', 'হে ক্ষণিকের অতিথি', 'আজি কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে', 'ফিরে চল্ মাটির টানে,' প্রভৃতির নিদর্শনও দেওয়া যেতে পারে। সারিপ্রকৃতির গান যেমন 'খর বায়ু বয় বেগে,' প্রভৃতি। তাছাড়া প্রেম-সংগীত, ঋতুসংগীত প্রভৃতির নিদর্শনও কম নয়। জন্মদিন, বৃক্ষরোপন, উৎসব-পার্বন, হলাকর্ষণ প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক কর্মকে কেন্দ্র ক'রে রচিত গান তো আছেই। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী তাঁর স্বল্পায়তন অথচ উপাদানসমৃদ্ধ 'রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী-সংগম' পুস্তিকায় অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল, আধুনিক ও লোক-সংগীত এই ত্রিধারার সমন্বয় দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সংগীতে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ কুমার রায়, শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিদগ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচক রবীন্দ্রসংগীতে এই ত্রিধারারই নিদর্শন দিয়েছেন চিঠিপত্রে ও আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারে প্রায় সকল শ্রেণীর গানেরই সমাবেশ দেখা যায়। তাই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রসংগীতের সমাদৃত দরবারে সকল শ্রেণীর গানেরই আসন নির্দিষ্ট আছে।

হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিক্যাল গানের অনুকরণে ও অনুসরণে জীবনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন অসংখ্য গান সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাঁর গানের সাহিত্য কাব্যসুষমায় পূর্ণ এবং হিন্দুস্তানী গানের চেয়ে রচনায় ও ছন্দমাধুর্যে তাঁর গান শতগুণে উন্নত একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। হিন্দীগানের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বাংলা গানের নিদর্শন যেমন,

অভিজাত হিন্দুস্তানী গান	রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গান
১। জগজন ধ্যান ধরত—বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল	১। তাঁহারে, আরতি করে, ঐ
২। প্রচণ্ড গর্জন—ভুপালী, সুরফাঁকতাল	২। প্রচণ্ড গর্জনে আসিল, ঐ
৩। আজু রঙ্গ খেলত—বেহাগ, ধামার	৩। জাগে নাথ জোছনা-রাতে, ঐ

অভিজাত-হিন্দুস্তানী গান	রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গান
৪। শঙ্কর শিব পিণাকী—ইমন কল্যাণ, সুরফাঁকতাল	৪। সুন্দর বহে আনন্দ, ঐ
৫। শম্ভু হর পদযুগ—তিলক-কামোদ, সুরফাঁকতাল	৫। শান্তি কর বরিষণ, ঐ
৬। মেরে তুন্দ দল—বেহাগ, ঝাঁপতাল	৬। মহারাজ, এ' কি সাজে, ঐ
৭। মোরি নয়ি লগন—নটমল্লার, একতাল	৭। মোরে বারে বারে, ঐ
৮। জাগো মোহন—ভৈরব, ত্রিতাল	৮। মন জাগো মঙ্গল লোকে, ঐ
৯। আজু বহত সুগন্ধ—বাহার, তেওরা	৯। অজি বহিছে বসন্ত-পবন, ঐ
১০। ফুলি বন ঘন মোর—বাহার, চৌতাল	১০। আজি মম মন চাহে, ঐ
১১। এরিমা সব বন—পরজবাহার, ত্রিতাল	১১। ওরে ভাই, ফাগুণ এসেছে, ঐ
১২। সুন্দর লাগোরী হৈ—আঁড়ানা, একতাল	১২। মন্দিরে মম কে, ঐ
১৩। মোরে কান ভনকবা—গান্ধারী, ত্রিতাল	১৩। কার বাঁশি নিশিভোরে, ঐ
১৪। রুদ্রদেব ত্রিনয়ন—ভৈরব, আড়া-চৌতাল	১৪। শুভ্র-আসনে বিরাজ, ঐ
১৫। মুরলীধুনি (ধ্বনি) শুনি—সিন্ধু, ঝাঁপতাল	১৫। চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, ঐ
১৬। বেণী নিরখত—আড়ানা, চৌতাল	১৬। বাণী তব ধায় অনন্ত, ঐ
১৭। বীণা বাজায় রে—পুরবী (বা পূর্বী), ধামার	১৭। বীণা বাজাও হে, ঐ
১৮। রুমঝুম বরখে—কাফি, সুরফাঁকতাল	১৮। শূন্য হাতে ফিরি হে, ঐ
১৯। উড়ত বন্দন নব—ললিতা-গৌরী, ঝাঁপতাল	১৯। হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত, ঐ
২০। প্রবল দল মেঘ—মেঘ, ঝাঁপতাল	২০। তিমির ময় নিবিড় নিশা, ঐ —প্রভৃতি।

এভাবে অনেক হিন্দুস্তানী অভিজাত গানের অনুরূপ বাংলা গানের নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে[১] যা থেকে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ও ইতিহাসাশ্রিত ভারতীয় সংগীতের পথচারী ছিলেন। রাগরূপ ও তালরূপের এবং স্থানে স্থানে সম্প্রদায়গত গায়কীশৈলীরও ব্যতিক্রম করেন নি তিনি, যদিও রবীন্দ্রসংগীতের প্রকাশভঙ্গী ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণী থেকে ভিন্ন ধরনের। তবে একথা অতীব সত্য যে, গতানুগতিক ওস্তাদীচালের হুবহু নকলের বা ফনোগ্রাফীক প্রতিফলনের অনুসরণ না ক'রে সরল আবেদন দিয়ে রসসৃষ্টির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে। আধুনিক যুগে ধ্রুবপদের শিল্পীরাও যেভাবে গানে বাঁটের ও আলাপের কারুকার্য করার পক্ষপাতী এবং খেয়াল-গায়কেরাও তাঁদের গানে দ্রুততাল, চক্রতালাদি তান-কর্তবের বা কলাকৌশলের অনুসরণ করেন, রবীন্দ্রনাথ সে ধারার অনুকরণকে গ্রহণ করেন নি, বরং গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সকল শ্রেণীর গানের প্রকাশরীতিতে আবেদন ও রসানুভূতির সরল মাধুর্যকে। মোটকথা রসানুভূতি লাভ ক'রে রসোত্তীর্ণ লোকে উপনীত হওয়ার জন্যেই তার সংগীতের রচনা ও সংগীতের প্রতিফলন। তারি জন্যে তাঁর সংগীত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় ধারার অনুসারী হোয়ে আরাধ্য জীবনদেবতার সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁর সংগীতের সার্থকতাও ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথ এই গভীর তত্ত্বের অনুভব করেছিলেন মর্মে মর্মে। তাই অলংকারের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত না ক'রে তাঁর গানকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নিরাভরণ ক'রে এবং এই নিরাভরণের অর্থই হলো কলাকৌশল-ভারাক্রান্ত ছিল না তাঁর গান, কিন্তু কাব্যমাধুর্যে ও সুরসৌন্দর্যে ছিল পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিপুল ভাণ্ডারে দেশী ও অভিজাত সকল শ্রেণীর গানই পেয়েছে আসন সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে। ধ্রুবপদ, খেয়াল বা খ্যাল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল এ'বিভাগ রাখেন নি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে। কিন্তু তা হোলেও এক বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশ পায় তাঁর গানের সুরে, তালে ও ছন্দে। রবীন্দ্রসংগীতের দরবারে সমগোত্রতার বিচার তাই সাদরে হয় স্বীকৃত, অথচ নূতনতার রূপও সেখানে সর্বদা সর্বজনসমাদৃত। তারি জন্যে বলি

১। এখানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' ও শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ,' ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

যে, সর্বগ্রাহীধর্মী· তাঁর সংগীত; নিজস্ব বা স্বতন্ত্রসত্তায় প্রতিষ্ঠিত থেকেও পরসত্তার প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল তাঁর সংগীত। রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী-নির্ণয়-ব্যাপারে তাই আমরা ক্ল্যাসিক্যাল, দেশী, লোকসংগীত প্রভৃতির শ্রেণী বা পর্যায়ভুক্ত না ক'রে বরং বলি ক্ল্যাসিক্যাল, দেশী ও লোক-সংগীত ও আধুনিক সংগীতেরই সমবেত রূপ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিসত্তার উপরেও স্বতন্ত্রসত্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত।

এ'প্রসঙ্গে মনে পড়ে ডক্টর বি. ভি. কেশকার যখন ছিলেন কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য-বিভাগের অধিনায়ক, তখন দিল্লী বেতারকেন্দ্রের কেন্দ্রিয় সংগীত-সংসদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় একথাই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছিল যে, রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণী একটি স্বতন্ত্র এবং সে স্বাতন্ত্র্যের আসনে সকল শ্রেণীর সংগীতেরই আসন সমানভাবে নির্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত।

দশম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়ন

রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেণীনির্ণয়প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, রবীন্দ্রসংগীত সুর, তাল, লয়, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতিকে নিয়ে অপরাপর গীতশ্রেণীর মতো 'সংগীত'-শব্দবাচ্য, পার্থক্য কেবল অপরাপর সংগীতশ্রেণীর সঙ্গে তার নিজস্ব প্রকাশে বা রূপায়ণে। ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি গীতশ্রেণী যেমন আপনাপন রূপ বা গঠন ও প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল তথা কলাবতী ও দেশী সংগীত নামে পরিচিত, রবীন্দ্রসংগীতও তেমনি নামে, গঠনে ও প্রকাশভঙ্গীতে-নিজের জাতি, শ্রেণী ও আভিজাত্যকে বজায় রেখে জনসমাজে আদরণীয় ও অনুশীলনযোগ্য। অবশ্য ঐক্য ও অনৈক্য এই দ্বন্দ্বপ্রকৃতির আরোপ সকল শ্রেণীর গীত বা সংগীতের মতো রবীন্দ্রসংগীতের বেলায়ও প্রযোজ্য। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যেমন এক হিসাবে রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুবপদ, খেয়াল ও অন্যান্য ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীর সংগীতের সঙ্গে পৃথক, তেমনি অপর দিকে রাগ, তাল, লয়, মূর্ছনা, অলংকারের সঙ্গে ধ্রুবপদ, খেয়াল, ভজন প্রভৃতি গীতশ্রেণীর সমাবেশকে নিয়ে ক্লাসিক্যালশ্রেণীর সঙ্গে আবার এক ও অপৃথক। সুতরাং জাতি ও শ্রেণী-বিচারের বেলায়ই পৃথক কি অপৃথক,—ক্ল্যাসিক্যাল-ধর্মী কি দেশীধর্মী এ' ধারণা মনে জাগে। কেননা রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেও দেখি গীতশ্রেণীর সংমিশ্রণ বা সমাবেশ হিসাবে ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি বিচিত্র গীতরীতি। তাছাড়া ভক্তিরসাত্মক ও স্তুতিবাচক ভজনপ্রকৃতির গান প্রায় সকল শ্রেণীর সংগীতকেই বলা যায়, যদিও ভজনকে একটি পৃথক সত্তার অধিকারী ক'রে পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ভারতের সংগীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রীরা। যেমন মীরার ভজন, নানকের ভজন, কবীরের ভজন, প্রভৃতি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত ধ্রুবপদগানকের প্রাচীনেরা ভজনাখ্যা দিয়েছেন এজন্যে যে, অনেক ধ্রুবপদ-রচনার বা ধ্রুবপদসাহিত্যের ভাষা, রস ও প্রকৃতি ভগবদ্ভজনাত্মক বা দেব-

দেবী ও ঈশ্বরস্তুতি বিষয়ক। অনেক ধ্রুবপদগানের মধ্যেই আবার পরমপুরুষ ভগবান এবং দেবতাদের মহিমা, গুণ ও ঐশ্চর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু একথাও সত্য যে, ভগবদ্ভজন বা ভক্তিস্তুতিমূলক সাহিত্য বা বাচনভঙ্গী থাকলেই সে গান ভজনশ্রেণীভুক্ত হবে এমন কোন কথা নেই, কেননা সূক্ষ্মদর্শী গীতরসিকরা ভজনকে একটি পৃথক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃতি একদিক থেকে অন্যান্য গীতশ্রেণী থেকে একটু স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা যায়। কেননা রবীন্দ্রসংগীত প্রধানত প্রেম, পূজা, ঋতু, প্রকৃতি, অনুষ্ঠান, উৎসব, ধর্ম প্রভৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন। তাছাড়া ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল এই সকল রকম গীতশ্রেণীরই অন্তর্নিবেশ আছে রবীন্দ্রসংগীতে। অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতের পথচারীরা রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি গীতরীতির স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করেন না, কেননা তাঁরা বলেন, ধ্রুবপদাঙ্গ গান, খেয়ালাঙ্গ গান, কীর্তনাঙ্গ গান। অবশ্য 'অঙ্গ' আসল রূপ থেকে কিছুটা ভিন্ন হোলেও আসল রূপেরই আবার অপরিহার্য অংশ, কেননা অঙ্গ বা অংশকে অঙ্গী বা অংশী থেকে পৃথক করা যায় না। যাই হোক সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে এমন একটি সার্বজনীন ও সর্বগ্রাহী কলাবস্তু বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে আছে অভিজাত ও দেশী সকল শ্রেণী গানেরই আসন নির্বাচিত। আর রবীন্দ্রসংগীত ঠিক সেই শ্রেণীরই সংগীত। বিরাট এর বিস্তৃত, সীমা এর সুদূরপ্রসারী, মিলন ও আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা এর সকলের জন্যে এবং আবেদন এর ব্যাঁপক ও অন্তরস্পর্শী। তারি জন্যে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই রবীন্দ্রসংগীত, অথচ স্বতন্ত্র সীমার পারেও এর দৃষ্টি প্রসারিত।

তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রসংগীতের অখণ্ড রূপ খণ্ড খণ্ড রূপের সমবায়েই গঠিত। কেননা পূর্বেই বলেছি যে, এক রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে আছে সকল প্রকৃতির গান, সকল রকমের গীতিরূপ, তাল ও লয়ের সমাবেশ। গান, রাগ, তাল প্রভৃতি সংগীতের অপরিহার্য অঙ্গ এবং এ' অঙ্গগুলির নিয়মনের জন্যে প্রয়োজন কতকগুলি নিয়ম ও নীতির। সাধারণভাবে ঐ সকল নিয়ম ও নীতিগুলি পরিচিত 'ব্যাকরণ' আখ্যায়। ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই জানেন যে, ভাষার সৃষ্টি সমাজে আগে, তারপর সৃষ্টি হয়েছে তার শাস্ত্র বা ব্যাকরণ। রবীন্দ্রসংগীত যেমন

ভারতীয় সংগীত-ভাণ্ডারেরই এক অপরিহার্য উপাদান এবং অন্যান্য সংগীত-উপাদানের মতো রবীন্দ্রসংগীতের অঙ্গীভূত যেমন সাহিত্য, সুর বা রাগ, তাল, লয়, ছন্দ প্রভৃতি, তেমনি অন্যান্য সংগীতশ্রেণীর মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও থাকা চাই একটি নির্দিষ্ট নিয়ামক শাস্ত্র বা ব্যাকরণ এবং সেই ব্যাকরণ-নির্দেশিত নিয়ম ও নীতিকে অনুসরণ ক'রে চলা উচিত রবীন্দ্রসংগীতেরও, যদিও একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন না নিছক ব্যাকরণপন্থী।

সম্ভবত এ' যুক্তিসঙ্গত ধারণার বশবর্তী হোয়েই আজকাল অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের একটি শাসনশাস্ত্র-রচনার প্রবৃত্তি এবং তারি জন্যে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের সাহিত্য বা রচনা, রাগ, তাল ও এমন কি নৃত্যেরও শ্রেণী ভাগ করতে হয়েছেন প্রবৃত্ত। থাট বা ঠাটের বিভাজন এবং রাগের, গানের ও তালের বিভাগকর্মেও হয়েছেন তাঁরা যত্নশীল ঐতিহ্যবাহী হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটক সংগীতপদ্ধতির শাসনশাস্ত্র ও ধারাকে অনুসরণ এবং স্থানে স্থানে হুবহু অনুকরণ ক'রে। যত্ন বা প্রচেষ্টা তাঁদের অবশ্যই প্রশংসনীয়, কেননা রবীন্দ্রসংগীতও যখন ভারতীয় গীতি-কলারই এক অপরিহার্য উপাদান, তখন ভারতীয় সংগীতগোষ্ঠির পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ও ভারতীয় সংগীতশ্রেণীর মর্যাদা এবং অভিজাত্য লাভ করার জন্যে রবীন্দ্রসংগীতেরও থাকা উচিত হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী সংগীতপদ্ধতির মতো একটি শাসনতন্ত্ররূপ 'ব্যাকরণ'।

কিন্তু এ' ব্যাপারে আবার নির্ধারণকারীদের কর্তব্য আছেও প্রচুর। তাঁদের কর্তব্যই হলো রবীন্দ্রসংগীতের স্রষ্টা যিনি রবীন্দ্রনাথ, তিনি কতটুকু ছিলেন সংগীতশাসনতন্ত্রের তথা সংগীত-ব্যাকরণের পক্ষপাতী তা পরীক্ষা ক'রে প্রথমে দেখা। শ্রুতি, স্বর, অলংকার, মূর্ছনা, তান এবং আরো কত-কিছুর প্রয়োজন সংগীতকলাবস্তুকে রূপায়িত করার জন্যে। প্রাচীন ভারতের সংগীত-মনীষীরা চিন্তা ও অনুশীলন করেছিলেন এ'সব প্রশ্নের ও এ'সকল সমস্যার কথা এবং তারি জন্যে রচনা করেছিলেন তারা সংগীতশাস্ত্র সংগীতশিল্পকৃতিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার জন্যে। যথার্থ পথের সঙ্গে অবশ্য লক্ষ্যপথেরও থাকে সম্পর্ক, কেননা প্রতিটি কর্মের পিছনে থাকে যেমন প্রয়োজনের প্রেরণা, তেমনি থাকে লক্ষ্য বা গন্তব্য দিকে উপনীত হওয়ারও এক আকুলতা। সকল শ্রেণীর সংগীতের পক্ষে ঠিক ঐ

একই কথা এবং তারি জন্যে ছিল প্রাচীন শাস্ত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ও আকুলতা সংগীতের গতিপথ নির্ণয় করার নিমিত্ত। সংগীতের সাহিত্য, রাগ ও তাল যাঁরা করেছিলেন রচনা সংগীতরূপের রূপায়ণের জন্যে, তাঁরা হয়তো ততটা চিন্তা করেন নি তাঁদের সৃষ্ট বস্তুকে শাসনতন্ত্র দিয়ে পরিচালনা করার কথা। কিন্তু কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল নিয়মনকারীরা রচনা করলেন ব্যাকরণ এবং পরবর্তী শিল্পী ও শাস্ত্রীরাও সেই নিয়ম-নীতিকে করলেন অনুসরণ, করলেন তার কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও; ফলে গানের অনুশীলনের তথা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের হলো সৃষ্টি ও বিস্তৃতি।

সুতরাং এখন আসা যাক্ রবীন্দ্রসংগীতের শাসনশাস্ত্র তথা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে। সংগীতসম্পদ নিয়ে সংগীত-জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে শুদ্ধ-অশুদ্ধতার দিকদর্শনকারী কোন নিয়ন্ত্রণ্-নীতি বা শাস্ত্রকে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত—অন্তত শৃঙ্খলা ও সুসংগতি রক্ষা করার জন্যে শিক্ষা, সাধনা ও রসানুভূতির ক্ষেত্রে। এখানে এ' সম্পর্কে হার্বার্ট্ স্পেন্সারের মতে সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন: "আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুর-সমষ্টির কর্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামে অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড় প্রতিমা আমাদের দেব-দেবীমূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে কোন গায়ক-কুম্ভকার সংগীত প্রায় একই ছাঁচে গড়িয়াছে। এইটুকু মাত্র তাহার বাহাদুরী যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ মূর্তির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র তফাত হয় নাই; এমনি তাহার হাত দোরস্ত। * * সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়"।

রবীন্দ্রসংগীতের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সারমর্ম বোঝার জন্যে কল্পনার প্রয়োজন হয় না, কেননা তাঁর অভিপ্রায় এখানে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর সংগীতের শাসনশাস্ত্র ব্যাকরণের রূপায়ণ সম্ভব না হোলেও পরবর্তিকালে যে তার আবির্ভাব ঘটবে না বা ঘটা উচিত নয় এরকম ভাবারও কোন কারণ নাই। অতীতের সমাজে ভারতীয় সংগীতের স্বরূপ ও আদর্শের উল্লেখ না করলেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বর্তমানে সংগীতের রূপ ও আদর্শের বিচার আমরা যেভাবে করি তা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। স্বর কতকগুলি শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরকম্পনের সমষ্টি মাত্র। এই সূক্ষ্মস্বরের নামই 'শ্রুতি'। চারটি শ্রুতি ষড়্জে, তিনটি ঋষভে, দুটি গান্ধারে, চারটি মধ্যমে, চারটি পঞ্চমে, তিনটি ধৈবতে ও দুটি নিষাদে এই বাইশ শ্রুতির অন্তর্নিবেশ সাতটি স্বরে। তাও এই নির্দিষ্ট সংখ্যা মাত্র ষড়্জগ্রামিক স্বরের। মধ্যম ও গান্ধার-গ্রামদুটির শ্রুতিসন্নিবেশপ্রণালী একটু ভিন্ন, সুতরাং সংখ্যা-বিভাগেও প্রার্থক্য আছে। সুরে তথা রাগে অল্পাধিক্য স্বরপ্রয়োগের জন্যে শাস্ত্রকাররা অংশ বা বাদী, সংবাদী ও অনুবাদী স্বরগুলির নামকরণ করেছেন। বিবাদী স্বরে রাগের রূপে বিকৃতি ঘটে। বাদীই রাগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। বহুল বা অধিক পরিমাণে স্বরপ্রয়োগের নামই বাদী নয়, শাস্ত্রকাররা বলেছেন 'বদনাৎ বাদী', অর্থাৎ রাগের যথার্থ রূপটি বলে দেয় বা প্রকাশ ক'রে বলে বাদী। তবে স্বরের সংখ্যাধিক্যও যে প্রমাণ করে বাদীর সার্থকতা এ' বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ক্ল্যাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বরূপ ও প্রকাশ-নির্ধারণে থাট বা ঠাট, অলংকার, মূর্ছনা, রাগের কাল, রাগের রস ও বিচিত্র ভাবের পরিচয় দিয়েছেন সংগীতশাস্ত্রকাররা। সংগীতশিল্পীরা এসব উপাদানের জ্ঞান অর্জন করেন সংগীতের রাগরূপকে সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ করার জন্যে। কিন্তু ব্যাকরণ বা শাস্ত্রের সকল বিধি-নিষেধ ও নির্দেশক বাণীর সম্পূর্ণ জ্ঞান অধিগত হোলেও সংগীতের ব্যবহারিক সাধনার প্রয়োজন হয় পৃথকভাবে। রাগ ও স্বরসম্বলিত সংগীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বেলায় শাস্ত্রশাসনও ঠিক খাটে না, তখন প্রয়োজন হয় নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অবিশ্রান্ত সাধনার। তারপর কেবল স্বর-সাধনা বা রাগ-সাধনায় প্রাণপাত পরিশ্রমও সংগীতের প্রাণকেন্দ্র-অবিষ্কারে একান্তভাবে সাহায্য করে না। তখন প্রয়োজন হয় অধ্যাত্ম বোধ ও সংগীতের জীবন-বিশ্লেষণ। রাগের রসানুভূতির

উপরই নির্ভর করে রাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। স্বর, অলংকার, মূর্ছনাদির কাঠামো-কঙ্কালে তখন রক্তমাংস সৃষ্টি করে দিব্যকান্তি, করে প্রাণের সঞ্চার। প্রাণের স্পন্দন তখন অনুভূতির তন্ত্রীতে করে আঘাত ও আনে জাগরণ, এবং তখনই শাস্ত্রের 'ন বিদ্যা সংগীতাৎ পর' বাণী হয় সার্থক। অলংকার, মূর্ছনা, গমক, তান প্রভৃতি সংগীতসামগ্রী অলংকাররূপে করে সংগীতের বাইরের শোভাবর্ধন, কিন্তু সংগীতের আন্তর বিকাশের জন্যে প্রয়োজন জ্ঞাননিষ্ঠ সাধনার ও রসানুসন্ধানের। রবীন্দ্রনাথ একথার সমর্থনে বলেছেন: "শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক—অনুভাবশূন্য মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়—যথাযথ রেখা-বিন্যাস দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি-সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্রশিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ স্বর-বিন্যাস মাত্র, কিন্তু যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না"।

রবীন্দ্রনাথের এই সরস ও নিগূঢ় মন্তব্যকে প্রতিটি শ্রেণীর সংগীতশিল্পী, সংগীতবেত্তা ও সংগীতশাস্ত্রীরই মনে রাখা উচিত। কেবল প্রাণহীন শুষ্ক স্বর-কঙ্কালের প্রতিফলনে বা স্বর-বিন্যাসের মনোহারিত্বে সংগীত-প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সংগীত-প্রতিমাকে জাগ্রত করতে হোলে প্রয়োজন শিল্পীর প্রাণের জাগরণ। শিল্পী হয়তো ব্যাকরণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের যথাযথ অনুসরণ এবং তাঁহার সংগীত-শিক্ষক বা আচার্যের কণ্ঠ ও গায়কীধারা অনুকরণ ক'রে রাগরূপ প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হলেন, কিন্তু ফলে দেখা গেল, তাতে প্রাণস্পন্দন ও লাবণ্যের কোন লক্ষণেরই প্রকাশ পেল না, আর পাওয়া গেল না রসানুভূতি ও জীবনানুভূতিরও কোন নিদর্শন, সংগীতের হলো স্পন্দনহীন ও প্রাণহীন কেবল রূপায়ণ, সুতরাং সংগীত-

সাধনার সার্থকতাও হোল ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তারি জন্যে রবীন্দ্রসংগীতকে চিরাচরিত প্রথায় নির্দিষ্টভাবে বোঝা ও জানার জন্যে শাসনশাস্ত্র ব্যাকরণ প্রভৃতির উপযোগিতাকে মেনে নিলেও বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই অন্তত রবীন্দ্রপথচারী রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী ও রসগ্রাহীদের, তাঁরা যেন শাস্ত্র বা ব্যাকরণ প্রভৃতিরই মাত্র সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে রস ও ভাবের যথার্থ আবেদন, প্রাণের অনুভূতি ও জীবনের আদর্শকে না দেন বিসর্জন। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ-ইঙ্গিতও ঠিক অনুরূপ। তিনি অধিকাংশ ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের উস্তাদদের প্রাণহীন বাহ্য-চাতুর্যেরই সমালোচনা করেছেন। কেবলি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হোয়ে স্বাভাবিকতাকে বিসর্জন দিলে সংগীতের নূতন ও মৌলিক সৃষ্টির পথ হয় অবরুদ্ধ। তাছাড়া সমাজ-জীবনের সঙ্গেও সংগীতের থাকা চাই নিবিড় সম্পর্ক। পরিবর্ধন ও পরিবর্তনই সমাজের জীবন। সুতরাং কালোপযোগী সমাজ-পরিবেশের অনুযায়ী শাসনতন্ত্রেরও হওয়া উচিত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সময়োপযোগী সমাজ-রুচিকে গঠন করার জন্যে। বিচারবিহীন অনুসরণ বা অন্ধানুকরণই সব-কিছুর অচলায়তন সৃষ্টি করে সমাজে, শিল্পে ও এমন কি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতেও। তাই শাসন মানারও যেমন আছে প্রয়োজন, স্বাধীনতার প্রবাহকে অব্যাহত রাখারও আছে তেমনি সার্থকতা। তার অর্থও কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযমতা নয়, পরন্তু বিচারযুক্ত মনোবৃত্তি ও প্রতিভার সৃজনশক্তিকে চির-উন্মুক্ত রাখা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও তাই যে, যান্ত্রিক অনুসরণপ্রিয় হোয়ে পুরাতনের পুনরাবর্তনের চেয়ে নূতন সৃষ্টির আকুলতায় যথার্থ রস ও জীবনানুভূতির পথে অগ্রসর হওয়া শ্রেয় এবং সেটাই শিল্পের ও শিল্পীর জীবনের আদর্শ বলে পরিগণিত। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাকরণ বা ব্যাকরণী মনোবৃত্তির মোটেই অপক্ষপাতী নই কেউ, কিন্তু সর্বদাই সতর্ক করি আমরা রবীন্দ্রসংগীতের পথচারী ও অনুশীলনকারীদের এই বলে যে, ব্যাকরণের বাহ্য আবরণের নিষ্পেষণে তাঁরা যেন রবীন্দ্রসংগীতের সৌন্দর্য, ভাব ও রসানুভূতির পথকে না করেন অবরুদ্ধ। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কেবল শাস্ত্রার্থ ও শাস্ত্রের আদর্শাবগতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-জীবনেরও অপার্থিব আদর্শ ও লক্ষ্যকে নির্দেশ করায়। অর্থাৎ জানানোর কৃতিত্বই কেবল শাস্ত্রের —"জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্", পথের নির্দেশ দান করাতেই শাস্ত্রের কৃতিত্ব ও

বাহাদুরী, কিন্তু পথচারী হোয়ে পথের লক্ষ্যকেন্দ্রে উপনীত হওয়াই সকল শিল্পী ও সাধকের কর্তব্য। নির্দেশ সাধনার সহায়কমাত্র, কিন্তু সাধনাই সাধককে যথার্থ সার্থকতার আশীর্বাদ দান করে। রবীন্দ্রসংগীতে ব্যাকরণের সূত্রপাত মোটেই অসমীচীন নয়,—অন্তত শিল্পকে কালজয়ী ও সুসঙ্গত করার জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ-অভিপ্রায় এবং ভারতীয় সংগীতের লক্ষ্য ও মর্মকথা। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'সংগীত ও ভাব' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত ক'রে উপসংহার করি রবীন্দ্রসংগীতে শাস্ত্র তথা ব্যাকরণ-উপযোগিতার আলোচনা। কবি বলেছেন: "আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই, বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময় ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। * * * আর কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কি চক্ষে সমালোচনা করেন? তাঁহারা দেখেন, একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কিনা। সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসংবাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কিনা; এ' পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবাসূচক ঘাড় নড়ে। * * আমাদের সংগীতশাস্ত্র নাকি মৃত শাস্ত্র, যে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা নাকি আয়ত্ত করতে পারি না। এই জন্য রাগ-রাগিণী, বাদী ও বিসংবাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহাকোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না ত, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমী' তৈরী করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাঙলার আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া উচিত"।

রবীন্দ্রসংগীতের মূল্য-নির্দেশের পথে প্রথমেই মনে রাখা উচিত বর্তমান

দেশ, কাল ও সমাজ-মনের গতি, রুচি ও গ্রহণশক্তিকে। ভারতীয় সংগীত-ইতিহাসের পাতায় যতটুকু ইঙ্গিত বা নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা থেকে জানতে পারি, অনুর্বর আদিম যুগেও সংগীত ছিল নৃত্যের অনুসঙ্গী। প্রাগ্বৈদিক যুগের উন্নত সভ্যতায়ও পাওয়া গেছে যতটুকু সংগীতের সামগ্রী, তা প্রমাণ করে সেই সুদূর অতীতে সংগীতানুশীলনের কথা। বৈদিক যুগে সংগীত-সামগ্রীর নিদর্শন সুস্পষ্ট এবং ক্ল্যাসিক্যাল যুগে ও বৌদ্ধ-ভারতে বিচিত্র গুহাভাস্কর্য, শিলালেখ, মন্দিরশিল্প প্রভৃতিও সংগীতানুশীলনের মর্মকথা প্রকাশ করে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব থেকেই নাট্য-শিল্পের প্রয়োজনে সংগীতের অভ্যুত্থান হয় এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনের পথে পুরাতনের বুকে নূতন নূতন রূপ নিয়ে ভারতীয় সংগীত আজও সঞ্জীবিত শিল্পসৌন্দর্যের দরবারে তার প্রসিদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময়কার সামাজিক পরিবেশ-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "I was born in 1861, that is not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of three movements had met in the life of our country. One of these, the religious, was introduced by a very great-hearted man of gigantic intelligence, Raja Rammohan Roy. * * There was a second movement equally important. Bankimchandra chatterjee, who, though much older than myself, was my contemporary and lived long enough for me to see him, was the first pioneer in the literary revolution, which happend in Bengal about that time. * * There was yet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality". ।[1]

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসবাহী ধারা কতক শুদ্ধ ও কত বিকৃত এই উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে ভারতের সমাজে তখন প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম,

1. Vide *Contemporary Indian Philosophy* (London, 1936) pp. 25-26.

শিক্ষা ও জাতীয় জাগৃতি এই তিনটি ধারার সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই তিন জাগরণ-যজ্ঞের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে সম্পার্কিত ছিলেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তিনি নিজেও ("These three movements were on foot and in all three the members of my own family took active")। তাঁর সংগীত-সৃষ্টি ও সংগীত-জীবন-সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "In regard to music I claim to be something of a musician myself. I have composed many songs which have defied the canons of orthodox propriety and good people are disgusted at the impudence of a man who is audacious only, because he is untraind. But I persist, and God forgives me, because I do not know what I do. Possibly that is the best way of doing things in the sphere of art. For I find that people blame, but also sing my songs, even if not always correcty". [2]

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা ও সংস্কার-সন্ধানী সৃষ্টিশক্তি দিয়ে রচিত নিজের সংগীত-সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী বলে আত্মশ্লাঘার গৌরব অনুভব না করলেও তাঁর সংগীত-রচনা যে গতানুগতিক সংগীতধারার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা "which have defied the canons of orthodox propriety" কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিচিত্র সমালোচনার আঘাত সংযত মন দিয়ে সহ্য করেও তিনি তাঁর নূতন অবদান দিয়েছেন সংগীতের ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন : 'আমার সংগীতশিল্পের যেমন নিন্দা করেছে তেমনি সমাদরে গ্রহণ করেছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে তারা প্রকাশ করে নি'। তিনি একথা আবার স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে বলেছেন : "Please do not think I am vain. I can judge myself objectively and can openly express admiration for my own work, because I am modest. I do not hesitate to say that my songs have found their place in the heart of my land, along with her flowers that are never exhausted, and that the folk of the

2. Ibid p, 31.

future, in days of joy or sorrow or festival, will have to sing them. This too is the work of a revolutionlist". [3]

সত্যই রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি সার্থক হয়েছে বলা যায়; কেননা শুধুই বাঙলা দেশে কিংবা ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বে সমগ্র নরনারীর হৃদয়-তন্ত্রীতে আজ রবীন্দ্রসংগীত স্পন্দন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এই সংগীত-সৃষ্টিকর্ম বা সংগীতকৃতি একজন বিদ্রোহীর অবদান একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন 'the work of a revolutionist'. Revolution বা বিদ্রোহ হয় পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের। নবসৃষ্টিহীন গতানুগতিকতা যখনই সমাজ-জীবনকে পঙ্গু ও প্রাণহীন করে, তখনই সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ। পুরাতনের বুকে নূতনের এই সংক্রমনই সমাজ-দেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার করে। সুতরাং বাঙলার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও বহুকাল প্রবাহিত ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গীতিধারার পাশে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন তার নূতনতর গান, যে গানের প্রকাশে থাকলো পুরাতনের প্রতি সমাদর অথচ নূতন গরিমার অভিযান। ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন সকল-কিছু গীতরীতির অন্তর্নিবেশ ঘটলেও রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রীতি নিজস্ব মহিমায় থাকলো প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'which have defied the canons of orthodox propriety'। একথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, প্রাচীনের বিরুদ্ধে নূতনের অভিযান বহুবারই হয়েছে ভারতের শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে ও আরো কত বিষয়ে। সংগীতের বেলায়ও আমরা দেখেছি, বৈদিকের বিরুদ্ধে এসেছে ক্ল্যাসি-ক্যালের তথা গান্ধর্বের অভিযান, গান্ধর্বের বিরুদ্ধে এসেছে অভিজাত দেশীর অভিযান এবং দেশীর মধ্যেও হয়েছে কত-কিছু ভাঙাগড়ার কাজ পরিবর্তনশীল সমাজের প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তানের চাহিদা নিয়েও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল কিছুদিন আগে। হিন্দুস্তানী খেয়াল বা খ্যাল গানে তানের কাজ আছে, হিন্দুস্তানী ধ্রুবপদে বাঁটের (বণ্টন) কাজে আছে, রবীন্দ্রসংগীতও যখন

---

3. Ibid. pp. 31-32

ভারতীয় সংগীতেরই শ্রেণীভূক্ত তখন রবীন্দ্রসংগীতেও তান এবং বাঁটের কাজ থাকবে না কেন —এই হলো চাহিদাবাদীদের অভিযোগ। 'গল্পভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলো বিভিন্ন শিল্পী ও শাস্ত্রীর তানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিচিত্র প্রবন্ধ। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের সূত্র পাওয়া গেল না বেশীর ভাগ আলোচনার ক্ষেত্রেই। এখানেও আমাদের আলোচনার মধ্যে যে পাওয়া যাবে একটা সুসংগত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত একথাও স্পর্দ্ধার সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে পারি না।

'তান' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বরবিস্তারকরণ। শার্ঙ্গদেব (ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে) সঙ্গীত-রত্নাকরে তানের পরিচয় দিয়েছেন এবং কল্লিনাথ এর অর্থ নির্ধারণ ক'রে বলেছেন: 'তন্যতে বিস্তার্যত ইতি তনোতের্ধাতো'। সুতরাং তান অর্থে বিস্তার বা স্বরবিস্তার করা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত দত্তিল, মতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাচীন নাট্য ও সংগীত-শাস্ত্রীরা দুরকম তানের উল্লেখ করেছেন। সিংহভূপাল 'সুধাকর'-টীকায় ভরতের (নাট্যশাস্ত্রকার ভরত) নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন: 'তথা চাহ ভরতঃ—'দ্বিধা তানক্রিয়া তন্ত্র্যাং প্রবেশো নিগ্রহশ্চ'। অথো প্রবেশো নামাধরস্বরপ্রকর্ষণাদুত্তর-স্বরমার্দিবাচ্চ। নিগ্রহশ্চাসংস্পর্শঃ ইতি"। মোটকথা ধ্বনিসাদৃশ্যের নাম প্রবেশ ও ধ্বনির অসংস্পর্শের নাম নিগ্রহ। পূর্ণ, কূট প্রভৃতি ভেদে তান ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও অসংখ্য। মতঙ্গ (খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতক) মূর্ছনা ও তান-প্রসংগে বলেছেন: "মূর্ছনারোহক্রমেণ তানোঽবরোহক্রমেণ ভবতীতি",—অর্থাৎ আরোহণক্রমে স্বরবিস্তৃতির নাম মূর্ছনা এবং অবরোহেণ-ক্রমে তান। যজ্ঞনামীয় ('তানানাং যজ্ঞনামানি') তানের সংখ্যাও কম নয়। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ত্রিবান্দ্রাম-সংস্করণ 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে মূর্ছনার পাঠে সম্ভবত ভুল আছে, কেননা আরোহণ-অবরোহণযুক্ত স্বরবিস্তার ছাড়া মূর্ছনার রূপ প্রকাশ পায় না। এজন্যে আড়েয়ার-সংস্করণ, পণ্ডিত সোমনাথ-রচিত 'রাগবিবোধ'-গ্রন্থে মতঙ্গ-বচনের এরূপ উদ্ধৃতি আছে: "* * উচ্যতে, আরোহাবরোহ-ক্রমযুক্তঃ স্বরসমুদায়ো মূর্ছনেত্যুচ্যতে, তানস্ত্বারোহণং ভবতীতি ভেদঃ ইতি"।

যাইহোক শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি ও প্রমাণের নিদর্শন ছেড়ে দিলে দেখা যায়, তানের সার্থকতাই স্বরবিস্তারকরণ। গানের অনুসঙ্গী স্বর যেখানে সংক্ষিপ্ত,

সেখানে সৌন্দর্যের অনুরোধে বিস্তৃত ক'রে তাকে প্রকাশ করে তান। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কবির একটি আলোচনা এখানে অনেকটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের দাবী রাখে। কবি বলেছেন: "* * কিন্তু তাই বলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকম-ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে, তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই, তার অন্য নিয়ম। * * হিন্দুস্তানী সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী-কানাড়ার খেয়াল সাদামিঠাভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী-কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামিঠাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে ত আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব"। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন: "* * বাংলা গানে হিন্দুস্তানী সংগীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে একথা তুমি মান কিনা?"।

দিলীপ বাবু উত্তরে বলেছিলেন: "* * তাই আমার মোটকথাটি এই যে, বাংলা গান বাংলা বলেই তাতে তান দেওয়া চলবে না একথা আমার সংগত মনে হয় না"। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আমি ত একথা বলি নি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্তানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলংকারের জন্যে তার দাবী আছে। আমি এ'রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই"। এই কথা বলে কবি স্বরচিত একটি ভৈরবী তান দিয়ে গাইলেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের গানে তানের অলংকার লাগে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বেশ স্পষ্ট। 'হিন্দুস্তানী সংগীত assimilte ক'রে বাংলাগান রচনা করলে তাতে তানের স্বরবিস্তার গানের ভাব ও রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সগররাজার মতোই সুরের সুধুরনী বইয়ে দেওয়

সম্ভবপর, অন্যথা সুরের জলপ্লাবনে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না'—একথা রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সুরের যাদুকর ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকেও তান ও অলংকার দিয়ে গাইতেন, তাতে ক'রে গানের সঙ্গতির কোন হানি হোত না। অবশ্য এর প্রমাণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত 'বিগত দিন" আলোচনাংশ উদ্ধৃত ক'রে 'রবীন্দ্রসংগীত ও তার ক্রমবিকাশ' পর্যায়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গানে তানের রোলার চালাবার কোনদিনই পক্ষপাতী ছিলেন না, যদিও কোন কোন গানে তিনি নিজেই আবার সামান্য সামান্য তানের কাজ করেছেন সুসংগতভাবে।

সকল শ্রেণীর শিল্পীরা নিজেদের পছন্দমত রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার দাবীও জানিয়েছিলেন কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথকে। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ও আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন: "কিন্তু তবু আপনার গানে শিল্পীর নিজের expre sion দিয়ে গাওয়াটা আপনার কাছে ব্যথার বিষয় বলে অনেক সত্যকার শিল্পী হয়ত আপনার গান তাদের নিজের মতন করে গাইতে চাইবে না। আপনার অনিচ্ছা না থাকলে হয়ত তারা আপনার গানের মূল কাঠামটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামত স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আপনার গানকে একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান ক'রে তুলতে পারত। কিন্তু আপনার সুর 'হুবহু বজায় রাখতে হবে'—আপনার এই ইচ্ছা বা আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রং ফলিয়ে আপনার গান গাওয়া তাদের কাছে একটা সংকোচের কারণ না হয়েই পারবে না। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন"।

রবীন্দ্রনাথ একথা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অপর এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "আমার গানের বিকার প্রতিদিন এত শুনেছি যে, আমারও ভয় হয়েছে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। * * গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট্-পালট্ করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা

চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারেই খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না"।

তাছাড়া কবির ব্যক্তিগত ধারণাও ছিল যে, "যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য-সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত; চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ-সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তাহলে কলা-জগতে অরাজকতা ঘটে। একথা নিশ্চিত যে, ওস্তাদ-পরম্পরার দুর্দম কণ্ঠতাড়নায় তানসেনের কোনো গানেই আজ তানসেনের কিছুই বাকী নেই। প্রত্যেক গায়কই কল্পনা করে এসেছেন যে, তিনি উৎকর্ষ সাধন করেছেন। * * * আজকালকার দিনে ছাপাখানা ও স্বরলিপি প্রভৃতি উপায়ে নিজে রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সম্ভব, তাই রচনা-বিভাগে সরকারী যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা উচিত। নইলে দাঁড়ি টানবে কোথায়?"

এখানেও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। 'রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই' একথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতকে নিজেদের পছন্দ মতো সুরে, তালে ও ছন্দে গাওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয় মনে করি—অন্তত সার্থক শিল্পীর শিল্পসম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদকে স্মরণ ক'রে। অতীতের রীতিকেই একমাত্র শাস্ত্র ও যুক্তির দোহাই দিয়ে প্রামাণিক ও প্রচলিত প্রথা বলে চালাবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা কেবল মাত্র তাতে করেই গান কালজয়ী হোয়ে সর্বাধিকার লাভ করতে পারে না।

এ' ধরনের অনেক আলোচনার কথাই মনে পড়ে রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়নপ্রসঙ্গে এবং মনে হয়, সকলগুলির আলোচনাই হওয়া উচিত নবসৃষ্ট শিল্পের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতবাদের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব

১ ॥ পদাবলীসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রাচীন ভারত ও তার ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ অনুরাগ বারবার মূর্ত ক'রে তুলেছে অতীত ভারতকে তাঁর সৃষ্টিতে। সে যুগের ভারতের ভাবধারা যেন কল্পলোকের সম্পদ। ভাষার যাদুকর তাঁর সোনার কাঠির পরশে জাগিয়ে তুলেছেন সুপ্ত অতীতকে, যা থেকে জন্ম নিয়েছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' 'বিদায়-অভিশাপ,' 'গান্ধারীর আবেদন', উর্বশী', 'ঋতু-সংহার', 'কুমারসম্ভব-গান', 'ভাষা ও ছন্দ' এবং 'কথা ও কাহিনী'-র কতকগুলি কবিতা, যেমন, 'পূজারিণী', 'অভিসার' প্রভৃতি। তাঁর নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও পুরাতন ভারতের ছায়া নিতান্ত বড় একটা কম নেই। সেটা নাট্যসাহিত্যে—কি কাব্যে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেন কবি সুদূরকে নিকট করেছেন তার অমর সাহিত্যের মাধ্যমে নিপুণ ছন্দে আর ভাষায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি কবির নিবিড় আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব-কাব্যের অনুকরণপ্রিয়তার নিদর্শন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্যরসলোভী মনের এক স্বাভাবিক প্রেরণার পরিচায়ক, যা ছন্দ ও ভাষার উপর তাঁর জন্মগত অধিকারকেই ব্যক্ত করেছে। কবির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছলতা, দার্শনিক মনোবৃত্তি ও গভীর রসোপলব্ধি তাঁর রচনাসম্ভারকে নিছক অনুকরণতাপ্রসূত ভাবক্লিষ্টতা ও ব্যঞ্জনার দৈন্য হোতে মুক্ত ক'রে দিয়েছে স্বচ্ছন্দভাবে। ভাবসম্পদের সংযোজনায় অবশ্য বৈষ্ণব-কবিতা বা পদাবলীর সঙ্গে এখানে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র আমরা তুলনা করছি না, কারণ যে প্রেরণা কবির মধ্যে সৃজন করেছে ভানুসিংহের পদাবলীর ভাব মূল-আকারে সেই ভাব-উৎসের সঙ্গে কোথাও কারু কোনো ভাবের তুলনা চলতে পারে বলে মনে করি না। ঐ প্রসঙ্গে কবির নিজের উক্তির উল্লেখ করলে বোধহয় ভুল হবে না যে, "জীবনস্মৃতি"-তে (রচনাবলী ৩৪৮) কবি লিখেছেন : "তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, ভানু-

সিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই মেকি বাহির হইয়া পড়ে"। অবশ্য কবির বিনয়-বচন কতকাংশে সার্থক হোলেও পুরোপুরি ঠিক নয়, কেননা তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান', 'শ্যাম রে লম্পট (কপট ?) কঠিন মনতোর', 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' প্রভৃতি পদগুলি। চণ্ডীদাসের 'কানুর পিরীতি মরণ অধিক' রবীন্দ্রনাথ দ্বারা 'জীবন-বল্লভ মরণ অধিক সো'-তে পর্যবসিত হবার আগে কবির চরণগুলি এমনি এক মাধুর্যপূর্ণ ভাবের সৃষ্টি করেছে যে, শেষ পর্যন্ত পদটির কোথাও অনুকরণের ছায়া ধরা পড়ে নি। এমনি করেই অনুকরণ করতে গিয়ে কবি বহুস্থানে নিজেকে হারিয়েছেন ঠিক 'নূনের পুতুল সাগরের জলে' মেশানোর মতো। আর তাতেই বৈষ্ণব-ভাবপ্রবাহের মধ্যে থেকে তাঁকে খুঁজে বার করা স্থানে স্থানে দুরূহ হোয়ে পড়েছে। তাই উদ্ধবদাসের—

আষাঢ় গত পুণ মাহ শাঙন সুখদ যমুনাক তীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনী দমকত, বিন্দু বরিখত নীর ॥

এবং— শাঙন মাসে সগন ঘন গরজন পুলকিত দামিনী মাল।
বরিখত বারি পবন মৃদু মন্দ হি গঙ্গা-তরঙ্গ বিশাল ॥

শিবরামদাসের "মাহ শাঙন বরিখে ঘন ঘন দুহুঁ ঝুলে কুঞ্জক মাঝ"।
আবার "গগন গরজনি দমকে দামিনী, দুহুঁ গাওহে বহুবিধ তান",
প্রভৃতি এবং গোবিন্দদাসের—

মন্দির বাহির কঠিন কবাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার
হরি রহু মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥

* * *

ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥

যখন সমন্বিতভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণ করলে নূতনরূপ—

শাঙন গগনে ঘোর ঘন ঘটা নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে অব কৈ-সে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে, যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত থর থর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বরখত নীরদ-পুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে নিবিড়-তিমিরময় কুঞ্জ।
কহলো সজনি, এ' দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশি কাহে বাজায়ত সকরুণ রাধানাম।

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন : "১২৯৯ সালে 'সোনর তরী'-র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন' পদটির (পদবন্তবলী ২৫) এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া লেখেন—

স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহবে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে
শুয়ে শুয়ে ঘুম-অনিদ্রায়
'রজনী শ'ঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়নে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মন-সুখে নিদ্রায় মগন।
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন॥

* * ১২৩২ সালের 'শেষবর্ষণ' নাটকে নটরাজ এই পদাংশ আবৃত্তি করিয়াছেন। পুনরায় ১৩৪৩ সালে 'শ্যামলী'-র 'স্বপ্ন' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন—

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন'
স্বপন দেখিনু হেন কালে।
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।

মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।

নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা অবশ্য 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত পদে (পদ· কল্পতরু ২১০) পাওয়া যায়—

চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥

পদটি লোচন ও যদুনাথের ভণিতাতেও পাওয়া যায়।[১]

তাছাড়া 'গহণ রয়ণ সে ন যাও বালা, নওল কিশোরক পাশ—' তখন কোথাও কবিতাটির স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্যের ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে হয় না, অথচ ভাবের অভিব্যক্তি ও বর্ণনাতে তা বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে সমতুল্যতার দাবী রাখে।

যদিও ভাবের গভীরতার দিক থেকে বিদ্যাপতি আরও ছাড়িয়ে গেছেন, যেমন—

নিজ পহুঁ পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারী
তু অ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুণল বরনারী-ইঃ।

শশিশেখরও বলেছেন—

ধনি অনুরাগিণী জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে করল পয়াণ॥
পরনারী পিরিতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥

ভাবের গভীরতায়, প্রকাশের মাধুর্যতায় ও ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যে হয়তো এমনি অনেক বৈষ্ণব-কবিতাই নিঃসংশয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতীয়মান হোতে

১। ডক্টর মজুমদার : 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান', পৃ· ৫৮-৫৯

পারে, কিন্তু ভাষার সংযমতায়, পরিবেশ সৃষ্টির কুশলতায় ও প্রাকৃত বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় কবির উক্ত পদটির সমতুল্য কয়েকটি পদই উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়। ভাব-বিচিত্রতার নব-নব অভিব্যক্তি—যা ব্যক্ত হয়েছে দান, গোষ্ঠ, মান, নৌকাবিলাস, রাস, মুরলীশিক্ষা, খণ্ডিতা ও এ'রকমের শত শত লীলা-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, রস-সাহিত্যকে ক'রে তুলেছে সুসমৃদ্ধ, তাদের অনুরূপ পদের সন্ধান কবির সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-সৌন্দর্যপ্রিয় কবি-মন বৈষ্ণব-সাধকদের মতো প্রেমের জটিলতাকে উপলব্ধি এবং ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি, যার জন্যে কবি মানলীলাকেও যথোপযুক্ত মূল্য দিতে সমর্থ হন নি। তবু দার্শনিক ভাব ও মধুর রসের প্রতিচ্ছায়ার সেখানে যতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে, কবির মনে তার অবদান ব্যর্থ হয় নি। যার ফলে জন্ম নিয়েছে 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়'—অনুরূপ পদ, সার্বজনীন প্রভাবের দিক থেকে যার সাথে বিদ্যাপতির—"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" পদটির সাদৃশ্য মেলে। অবশ্য এখানেও বিদ্যাপতির ভাবগম্ভীর্য অতুলনীয় এবং তার বাচনিক অভিব্যক্তির সঙ্গেও কবির ঠিক ঠিক মিল পাওয়া যায় না। তবুও—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এবং—

কো তুহুঁ বোলবি মোয়,
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন আঁখ উপর তুহুঁ রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম,
নিমিখন অন্তর হোয় কো তুহুঁ বোলবি মোয়।

পাশাপাশি পড়লেই ভাব ও ছন্দের ঐক্য সহজেই ধরা পড়ে। বৈষ্ণব-মহাজন ও রবীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি ও ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যও বেশ অনুভূত হয়।

ভানুসিংহের শ্রীরাধার প্রশ্ন-কাতরতা কবি বিদ্যাপতির প্রশ্ন-কাতরতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, উভয়ের রস ঠিক এক নয়।

ভানুসিংহের রাধার মনে যে প্রশ্ন তা অজানার, আর বিদ্যাপতির রাধার প্রশ্ন অশেষের অতৃপ্তির। ভানুসিংহের রাধা বিস্মিতা, বিদ্যাপতির রাধা চির-আকাঙ্ক্ষিণী। তবুও মানব-মনের চির-আকুলতা উভয়ের মধ্যেই প্রকট।

কবির মধ্যে সর্বপ্রথম এই কাব্যরসের সৃষ্টি করে জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ"; এবং তার আভাষ তাই ভানুসিংহের পদাবলীর অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। কবি জয়দেবের—

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ ॥
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম ॥৫।১০-১১

ইত্যাদির ছায়া রবীন্দ্রনাথের—

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী, শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য,
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন-নিলয়ে, বালা-বিরহ-বিষণ্ণ।
তৃষিত নয়নে, বনপথপানে, নিরখে ব্যাকুল বালা
দেখন পাওয়ে, আঁখি ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত, দূরে খেপল মালা—
কহল সজনি, শুন বাঁশরী বাজে, কুঞ্জে আওল কালা।[১]

ইত্যাদির মাঝে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। জয়দেবের ছন্দ, কাব্য ও সুর কবির লেখনীর মাধ্যমে পেয়েছে নবজীবন—যাকে তুচ্ছ করা একেবারে যায় না, আর তাকে বৈষ্ণব-পদের সমতুল্য মর্যাদা দিতেও কোন রকমে দ্বিধা আসে না। তেমনি ছন্দের দিক থেকে বোধহয় গোবিন্দদাসের—

আজু বিপিনে যাওত কান
মুরতি-মূরত কুসুমবান
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গি নটবর-শোহনি।[২]

—ইত্যাদির মতোই ধ্বনি ও মাধুর্য। কিন্তু ভাবের দিক থেকে এর মধ্যে যে সুর উপলব্ধি করা যায় তা পরমানন্দদাসের—

১। এ'সম্বন্ধে পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

২। অন্যপাঠ—'নটবর-মোহিনী'।

মন্দ মন্দ মধুর তান
মুরলী কুঞ্জে বাজিল রে,
নব-নায়রী শ্রীরাধে
অনঙ্গরঙ্গে মাতিল রে।
উঠত বসত খসত কেশ
মুরলী শব্দে শ্রবণ-ভেদ
পুলকে পুরল সবহুঁ অঙ্গ
প্রেম এই তরঙ্গ ভাসিল রে।

এই উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মনোবেদনা গোবিন্দদাসের লেখনীতে মূর্ত হয়েছে,

হামরহু সঙ্কেত আনত রহু কান
একলি নিকুঞ্জে কুসুম-সর হান
এ সখি হৃদয় জলত মঝু আগি
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি।
কুলবতী চরিত পিরিতি লাগি খোই
হা হা হরি করি কাননে রোই
পন্থ নেহারি নয়নলয় লাগি
টুটত রজনী বাডত অনুরাগী
অবহুনা মিলল শ্যামরু কাঁতি
গোবিন্দদাস কহে দীগ ভঁরাতি।—ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে এটিই নূতনত্ব পেয়েছে—'হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে' পদটির মাধ্যমে। যথা—

বিরহ বিষে দহি বহিগল রয়নি, নহি নহি আওল কালা।
তৃষিত প্রাণ মম দিবস যামিনী শ্যামক দরশন আসে।
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জলত হুতাশে।

বিপ্রলব্ধার[২] ছায়াও এতে পড়েছে। বিপ্রলব্ধার ভাবে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব-পদাবলী যথা—

২। সঙ্কেত ভবনে নাহি হেরি প্রিয়জনে
ব্যাকুলা যে বিপ্রলব্ধা কহে কবিজনে।

—পীতাম্বরদাস, রসমঞ্জরী

নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনী কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ।
গুরুজন গৌরব দূর হি ডারলুঁ
গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিধি বঞ্চল
মঝু ভালে দেয়ল আগি। —বাসুদেব ঘোষ

হতাশে মুহ্যমানা মানিনী সমস্ত উপকরণ যমুনায় বিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা—

ত্যেজ সখি কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দুরহিঁ ডারহ যমুনা পার ॥
কিশলয় শেজ মণিমাণিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল ॥

—বলরামদাস

বিশেষ ক'রে সখিদের ভর্ৎসনার মধ্যে শ্রীরাধার যে অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়'তা বিপ্রলব্ধারই অনুরূপ।

শ্যামরে নিপট কঠিন মন তোর,
বিরহ সাথী করি দুঃখিনী রাধা, রজনী করতহি ভোর।
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত, পরাণ থেহ না মানে।

* * *

গহন তিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি, শূন্য কদমতরুমূলে,
ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল রোদই আপন ভুলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু পরিহরি সব গৃহ কাজে,
চাহি শূন্য পর কহে করুণ স্বর, বাজে বাঁশরী বাজে।

রসসৃষ্টির দিক থেকে গোবিন্দদাসের—"পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে" পদটির অনুরূপ। যথা—

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধরে নিরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুনি গুনি জীবন নৈরাশ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরহুঁ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি উঠই
বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে
বিধি সঞে মাগয়ে পাখ॥

বাঁশরী-আকুল-করা সুর রাধিকাকে বিব্রত করেছে দেখা যায়। বিদ্যাপতির ভাষায় একে বলা যায়—

আরে সখী বাজত বংশী মধুর।
ধ্বনি শুনি প্রাণ করত আনছান
চিত হোয়ত অধির।
মাতল শ্রবণ কম্পে ঘন ঘন
পুলকে ভরয়ে শরীর।
হৃদয় দরদর শ্বাস বহে খর
নয়নে বহতহি নীর।
ধৈরজ ধরইতে নাহি পারি চিতে
ভিগেও হৃদয়ক চির।
জাতি কুল শীল সবহু দূরে গেল
উয়ল মনমথ বীর।
বিদ্যাপতি ভণে মুরলী নিশানে
ঘরের করিলি বাহির॥

আবার গোবিন্দদাসের রাধা বাঁশিকে তিরস্কার করেছেন দেখি—

বাঁশী অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতী কুল নাশিলয়ে।

এ' ধরনের পদ একেবারে অল্প নয়। যেমন—

কি মোহিনী জানরে বাঁশী, কি মোহিনী জান
শ্রুতিপথে প্রবেশিয়া প্রাণে মোর টান।

যে আছে নিলাজ পরাণ
শুনিয়া তোমার গান থাকে বা না থাকে।'

এদের সমন্বয়ে জন্ম নিয়েছে 'বাজাওরে মোহন বাঁশী" প্রভৃতি, যার মধ্যে শুনতে পাই—

রিঝ মন ভেদন বাঁশরী বাদন কাঁহা শিখলি রে কান।
ইনে সিরথির মরম-অবশ কর লহু লহু মধুময় বান।

আবার—

হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয় দারুণ মধুময় গান
সাধ যায় ইহ যমুনা বারিম ডারব দগধ পরাণ।

রসসৃষ্টি ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় গোবিন্দদাসের। কবির ভাষা ও ভাব-সম্প্রসারণেও অনুভূত হয় গোবিন্দদাসের প্রভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রীরাধার মধ্যে মানবীয় প্রেমের রূপ অধিক প্রকট এবং রাধার মধ্যে যে প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তাতে ঐশী প্রেমের ছায়া ক্ষুণ্ণ হোয়ে মানবীয় প্রেমকেই প্রকাশ করেছে। তাই ভানুসিংহের রাধার মধ্যে অভিমানের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত মৃদু। ভানুসিংহ পদাবলীর রাধার মধ্যে আশা ও নিরাশার দোলা অনেকটা সাধারণ মানুষের মানসিক গতির দোলার মতো, এজন্যে সাধারণের পক্ষে তাতে সরস প্রাণের ছোঁয়া সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাই তো রাধিকার আশঙ্কা—

বাদর বরিখন নীরদ গরজন, বিজুলী চমকন ঘোর,[১]
উপখই কৈছে আওতু কুঞ্জে নিতি নিতি মাধব মোর।
অঙ্গ বসন তব ভীখত মাধব, ঘন ঘন বরখত মেহ
ক্ষুদ্র বালি হায় হমকো লাগয় কাহে উপেক্ষবি দেহ।

১। প্রাকৃত দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ক্ষুদ্রত্ববোধের সত্যিকার কোন ভিত্তি নেই, যদিও তাতে বহুস্থানে শ্রীরাধা নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, বহুবার আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি ক'রে শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেম-লাভের যোগ্যতার প্রতি নিজে সন্দিহান হয়েছেন, কিন্তু এই ভাব তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি উপলব্ধি করেছেন শ্রীকৃষ্ণের অভাব। আত্মনিবেদনের মধ্যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে জনম-মরণ সঁপে দিয়েও সুখী হন নি, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজেকে বিস্মৃতা হয়েছেন। কিন্তু ঠিক তারই আগে রাধার চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন জগন্নাথ নিজে তাঁর মান, তাঁর বিশেষত্ব। কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনায় আকুল হোয়ে রাধা নিজেকে দেখেছেন যখনই পৃথক ক'রে তখনই উপলব্ধি করেছেন আপনার ক্ষুদ্রতা। কিন্তু মিলনের মধ্যে তাঁর সে বোধের স্থান নাই। তখন কৃষ্ণরসসাগরে নিমজ্জিতা রাধিকার প্রেমের ভিত্তি এত কঠিন যে, সেখানে দ্বৈতভাবের আভাসমাত্র নাই, তাই তার মধ্যে কায়িক মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নও উঠেনি। সহস্র রসবৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভাবের গভীরে ধরা পড়ে শুধু ছ'টি মাত্র অনুভূতি—পাওয়ার আনন্দ ও না-পাওয়ার ব্যথা—যা থেকে সৃষ্টি হয় প্রবল অভিমান। কিন্তু এই যে মিলন, তা পরিপূর্ণ সত্তায় সত্তায়। এ' মিলনে রাধা ও কৃষ্ণের সত্তায় পৃথকত্বের অবকাশ কোথায়! সেখানে 'আমি তুমি'-র স্থান কই? আর যদি বা থাকেও তো তা রাধাময় কৃষ্ণে ও কৃষ্ণময়ী রাধায়। এই পরম-আনন্দ ও চরম-পাওয়া থেকে যখন বঞ্চিতা তখনই জেগে ওঠে রাধিকার সুপ্ত আমিত্ব। তখন তিনি উপলব্ধি করেন এক ভিন্ন সত্তার অভাব,—যার তুলনায় নিজেকে মনে হয়েছে অতি তুচ্ছ। সেজন্যে রাধিকার হয়েছে অভিমান, পেয়েছেন তিনি দুঃখ ও জেগেছে তাঁর মধ্যে অনুতাপ। আর তখনই তিনি বুঝেছেন—'তোহারি গরবে গরবিনি আমি'।

তাই দেখি যে, মরণ অপেক্ষা সহস্রগুণ যাতনা সহ্য করেও রাধা মরণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারেন নি। মরণে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু শ্যামের দেখা তো মিলবে না, অথচ জীবন থাকলে তা মিলতেও পারে, তাইতো রাধার প্রাণধারণ ক'রে বেঁচে থাকা এবং জীবনের দুঃখ ও বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করা। কারণ এত সহ্য করেও শ্যামকে পেলে তাঁর জীবন সার্থক—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আসিলে
দেখা না হইতে পরাণ গেলে ॥

* * *

এতেক সহিল অবলা বলে
ফাটিয়া যাইতো পাষাণ হলে ॥

মরণকে আহ্বান করার যা-কিছু ভনিতা তা রাধার কৃষ্ণপ্রেম-লাভের আশায় শুধু ছলনামাত্র। রাধা মরণকেই বরণ করতেন—যদি জানতেন যে, তার মধ্যে দিয়ে পাবেন জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে। কিন্তু তা তো হবার নয়! তবে তিনি কোন্ প্রাণে আর মরণকে দেবেন শ্যামের আসন! শুধু মরণ কেন, তাঁর পক্ষে শ্যামের সঙ্গে বিশ্বভুবনের কোন বস্তুরই তুলনা করা চলে না। 'হেন মনে লয় এ' তিন ভুবনে, তুলনা নাহিকো তার' এই তো রাধিকার অন্তরের উপলব্ধি। এখানেই পরাজয় ভানুসিংহের রাধার, কেননা শ্যামের অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছে সে মরণকে তার আসনে বসিয়ে। তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা যদিও বলেছেন—'মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া চাও', কিন্তু বলেন নি—'তুঁহু মম শ্যাম সমান'। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের লেখাকে এইভাবে সমালোচনা করা অবশ্য অনেকের কাছে অনুচিত বলে মনে হোতে পারে, কিন্তু 'ভানুসিংহের পদাবলী'-কে তাঁর কাঁচা লেখা বলে ছোট করা যায় না।

তারি জন্যে রসের বিচারে 'ভানুসিংহের পদাবলী'-কে বৈষ্ণব-কাব্য-ধারার সমান মূল্য দেওয়া চলে, ভাবের দিকে যদিও তা একটু হাল্কাই বলতে হবে। তবু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে কবির কাব্যসৃষ্টি পদাবলী-সাহিত্যের একপাশে স্থান ক'রে নেবে। যে রসের স্রোতে অবগাহন ক'রে বৈষ্ণব-কবিরা আজও অমর হোয়ে আছেন সেই স্রোতেই ডুব দিয়ে কবি ভাসিয়েছেন তাঁর কাব্যের অর্ঘ্য। সে ফুল ডোবেনি আজও পর্যন্ত, ঢেউয়ের তালেই ভেসে চলেছে, কোন্ সে আগত যুগের তটে গিয়ে লাগবে এবং সে তটের মানুষ পরমস্নেহে হয়তো তাকে চয়ন করবে। সযত্নে হয়তো বা গাঁথবে সেই ডোরেরই প্রান্তে সেই ফুল—যে ডোরে গাঁথা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অমৃত-রত্নাবলীরূপ অম্লান কুসুমরাজি!

২ ॥ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি ও বৈষ্ণব-পদাবলী ॥

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও তত্ত্বেসুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন অষ্টাদশ শতকে লিখিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাচিন্তামণি', রাধা মোহন ঠাকুর-সংকলিত 'পদামৃতসিন্ধু', দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত', ঘনশ্যাম নরহরি চক্রবর্তী-লিখিত 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'ভক্তিরত্নাকর', গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ও গোকুলানন্দ বা বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' ছাড়া বৈষ্ণবপদসংগ্রহের গ্রন্থ আর প্রায় ছিল না। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কমলাকান্ত দাস 'পদরত্নাকর' ও গৌরীমোহন দাস 'পদকল্প-লতিকা' সংকলন করেন।[১] এর পর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জগবন্ধু ভদ্র সংকলন ক'রে প্রকাশ করেন 'মহাজনপদাবলীসংগ্রহ'। জগবন্ধু ভদ্রের ঐ 'পদাবলী-সংগ্রহ' যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বারো বৎসর। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন: "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) দাদা জোতিরিন্দ্রনাথের নিকট এই সংগ্রহের অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি থাকিত"। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই 'মহাজনপদাবলীসংগ্রহ'-গ্রন্থের কথা জানতেন। তাই ১৩৪৬ সালের প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "অঘোরচন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যাক্রমে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময় নির্ণয়-সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাজ অনুমান করা অনেক সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি; বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক্ তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের

১। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান (১৩৬৮), পৃ ১

ডেস্ক থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না"।[২]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই বৈষ্ণব-পদাবলী নিয়ে যে নাড়া-চাড়া করতেন সেকথা তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন লেখায় স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমান বাবু লিখেছেন, জগবন্ধু বাবুর 'মহাজন-পদাবলী' প্রকাশের দু' বৎসর পরে (১২৮২ থেকে ১২৮৩ সালের মধ্যে) সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার-সংকলিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'-গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় কবি নিজেই স্বীকার করেছেন: "শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না"। রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট-লেকচার **Religion of Man**-এও ঠিক অনুরূপ কথা বলেছেন। 'The Vision' আলোচনা-পর্যায়ে তিনি লিখেছেন: "Fortunately for me a collection of old lyrical poems, composed by the poets of the Vaishnava sects, came to my hand when I was young"।[৩] ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন ও ডক্টর জে. এইচ্. মুইরহেড-সম্পাদিত **Contemporary Indian Philosophy**-গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ 'The Religion of an Artist-নিবন্ধেও অনুরূপভাবে বলেছেন: "What gave me boldness when I was young was my early acquintance with old Vaishnava poems of Bengal, full of the freedom of metre and courage of expression. I think I was only twelve when these poems first began to be reprinted. I surreptitiously got hold of copies from the desks of my elders. I must also admit that the greater part of these lyrics was erotic and not quite suited to a boy just about to reach his teens. But my imagination was fully occupied with the beauty of their forms and the music of their words; and their breath, heavily

২। রবীন্দ্রসাহিত্যের পদাবলীর স্থান; পৃ ২৩

3. Cf. *Religion of Man* (1949), p. 195.

laden with voluptuousness, passed over my mind without distracting it."[4]

বৈষ্ণব-পদাবলীর পরমরসাস্বাদক শ্রীচৈতন্যদেবের উদার ধর্মভাব ও মানবপ্রেমের প্রতিও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং স্বীকারও করেছেন : "তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন"। প্রকৃত শুদ্ধসত্ত্ববান জ্যোতির্ময় জীবন লাভ করেছিলেন বলেই তো জ্যোতিদীপ্ত করেছিলেন চৈতন্যদেব সমগ্র বাঙলাদেশকেই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে। বৈষ্ণব-পদাবলীর বিকাশ ছিল শ্রীচৈতন্যদেবেরও বহুপূর্ব থেকে এবং বিদগ্ধ পদাবলী-রচয়িতা কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পরমশ্রদ্ধার পাত্র। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ,
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম-আনন্দ।

এখানে প্রাক্‌চৈতন্য পদকর্তারূপে জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ছাড়াও আছেন শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক রচয়িতা ও বৈষ্ণব-সাধক রায় রামানন্দ, বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুক ও স্বরূপ-দামোদর। শ্রীচৈত্যদেব রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক', লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতির নিত্য পাঠ শুনতেন ও পরমানন্দ লাভ করতেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় ১২৯২ সালে 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করেন এবং সেই 'পদরত্নাবলী'-তে তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বলরামদাস, নরহরি, কবিবল্লভ, অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, জ্ঞানদাস, জগন্নাথদাস, নরহরি, নরসিংহদাস, নরোত্তমদাস, প্রেমদাস, লোচন ক্রমে প্রায় পঁচিশ জন বিদগ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্তার পদ সংকলন করেছেন। এই সংকলনকর্মে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি তাঁর একান্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রপারগ ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান'-গ্রন্থে (১৩৬৮) 'পদাকর্তা রবীন্দ্রনাথ' 'পদাবলীর মাধুর্য-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ', 'পদাবলীর সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথ',

4. Cf. *Contemporary Indian Philosophy* (1936), pp. 29-30.

কবি-কৃত অনুবাদ—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর—
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে'হায়,
কিশলয়পাখাখানি দোলাইব গায় ?

(২) বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্য ভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কবি কৃত বঙ্গানুবাদ —

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

(৩) বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

কবি-কৃত অনুবাদ—

আসে তো আসুক রাতি,
আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে' যায় কি-বা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

(৪) মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত –
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

কবি-কৃত অনুবাদ—

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

এভাবে রবীন্দ্রনাথ রসিকের মাধ্যমে সংস্কৃত পদের পরিবেশন করেছেন অনেকগুলি এবং অনুবাদ করেছেন সেগুলি অনিন্দ্যসুন্দরভাবে। কবিতা ও অনুবাদ গান কিংবা নাটকীয় সংগীত না হোলেও তাদের প্রতিটি ছন্দে ধ্বনিত হয় সংগীতের সুর। নাটকে প্রযুক্ত সংস্কৃত পদানুবাদ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের বহু মন্ত্র বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং সে অনুবাদ-সারল্যের তুলনা নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' নাটকে নলিনীর গানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকে এই ধরনের আত্মসমর্পণের গান নাটকীয় সংগীত-পরিবেশকে সমুন্নত করেছে বলা যায়। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে হিমীর গানও নাটকীয় সংগীতকে মহিমান্বিত করেছে। হিমীর কণ্ঠে গীত সংগীতগুলিতে কথার ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে রসপ্রবাহের সার্থকতা আছে। হিমীর গানগুলি যেমন,

(১) বাজো রে বাঁশরি বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে
মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো। —প্রভৃতি

(২) ওরে মন যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে। —প্রভৃতি

(৩) ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে। —প্রভৃতি

'নটীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর গান সচল, কাব্যরসপূর্ণ ও ইংগিতময়। ভিক্ষুকদের কণ্ঠে কবি বিশ্ববন্ধনের অন্ধকারের পাশে আলোকের ইংগিত দিয়েছেন যা নাটকীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আশাময় ও অপার্থিব। ভিক্ষুকরা গেয়েছে—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।—প্রভৃতি

'শেষরক্ষা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রকান্ত, ইন্দু ও কমলের কণ্ঠে গান দিয়েছেন, যা নাটকীয় সংগীতের ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'পরিত্রাণ' নাটকেও গানের পরিবেশন নাটককে সার্থক করেছে। 'পরিত্রাণ' নাটকে ধনঞ্জয় সংগীতমুখর। ধনঞ্জয় প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পঞ্চম গানটিতে মানুষের অন্তরে সুপ্ত নিবিড় বেদনার চাওয়া যেন সার্থক হয়েছে প্রেম ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। ধনঞ্জয় গেয়েছে—

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।
তোমার অভিসারে যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।
পরাণে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুঃখের মাধুরীতে করিল দিশেহারা।
সকলি নিবে কেড়ে দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে ফেলিলে একী দায়ে।

এখানে নটীদের গানও অর্থপূর্ণ।

'তপতী' নাটকের পরিবেশ ভাবগম্ভীর, সুতরাং সংগীতে গাম্ভীর্য অথচ সরসতা আছে। 'তপতী'-র সূচনায় ভৈরব-মন্দিরের প্রাঙ্গন দেখি এবং দেবদত্তের সঙ্গে সেখানে একদল উপাসক। উপাসকগণের শ্রদ্ধানিবিড়িত গান—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥

এই নাটকীয় সংগীতের ভাব তেজোদীপ্ত অথচ প্রসন্ন। এর পর বিক্রমের গান—

(১) ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জলদর্চি তনু।—প্রভৃতি

(২) মৃত্যুঞ্জয় যে-মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।—প্রভৃতি

ভৈরবের স্তব বীর সাধকের মধ্যে শক্তিপ্রবাহের উদ্বোধন করে এবং করে মৃত্যুঞ্জয়। সংলাপে ওজঃশক্তিবিধায়ক প্রেরণাদীপ্ত শিব-সংগীত। এর পর বিপাশার গানে পাই আবার রুদ্র-জাগরণের প্রেরণা—

জাগো হে রুদ্র জাগো।
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তারে,

তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু মাগো ॥

নাটকীয় সংগীতের মধ্যে ভক্তির জাহ্নবীধারা স্বতঃপ্রবাহিত। বিপাশার আর একটি গানেও নটরাজ শিবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তির পাশাপাশি কল্যাণ-সুন্দর মূর্তির বিকাশ দেখি। বিপাশার গান—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথি হল আপন সাথে,
সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে ॥

এই গানের পরিবেশ কী রকম তার পরিচয় দিয়ে বিপাশা বলেছে : "এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে। ঝরণাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো তার সময়—ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে"। নাটকীয় সংগীত এখানে ভাব-সার্থকতার চরমসীমায় প্রতিষ্ঠিত। মোটকথা বিপাশার গান 'তপতী' নাটকের মাধুর্যকে আরো উন্নত ও রসোজ্জ্বল করেছে। বিপাশার আর একটি গান—

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,
ওই যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।
বাজল তূর্য আকাশ-পথে,
সূর্য আসেন অগ্নিরথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।
ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।

দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণচিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো ॥

রবীন্দ্রনাথের যাদুহস্তে বাংলা নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীত নূতন রূপে ও নূতন প্রাণস্পন্দনে সমুজ্জ্বল ও পূর্ণ এবং নাটকীয় সংগীতের জীবনে নূতন জাগরণ ও নূতন কল্যাণময় সিদ্ধি ও ঋদ্ধির আশীর্বাদ লাভ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ ও আদর্শ

রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ ও আদর্শের পরিচয় পেতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক শিল্প ও সংগীত-চিন্তা তাঁর নিজের জীবনমন্থনজাত অমৃত-নির্যাস। তাঁর জীবনোপলব্ধির প্রতিটি স্তরে নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবতরঙ্গের দেখি সৃষ্টি ও প্রবাহ এবং সেই সেই চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায়ই তিনি রচনা করতেন নূতন নূতন কাব্য, নাটক, গান প্রভৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক ঘটনা-পারম্পর্য সৃষ্টি করেছিল তাঁর অন্তরে ভাববিক্রিয়ার বিচিত্র উদ্বেল এবং সেই প্রাণচঞ্চল উদ্বেলের বুকে কবি ভাসিয়েছিলেন তাঁর কল্পনার তরী। কূলে ও অকূলে হয়েছিল সেই তরীর গতি; আনন্দ ও বেদনার চরম ও পরম-ফলশ্রুতি লাভ করেছিলেন তাই কবি তাঁর জীবনে সমভাবে। তারই জন্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও মর্মকে বুঝতে হবে আমাদের একান্তভাবে।

এ'প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: "জীবনের এক এক পর্যায়ে তাঁহার কবি-মানস এক একটি ভাব-বন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে, মুক্ত করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাব-বন্ধনে বাঁধা পড়িবার জন্য। এই বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই অন্যদিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্দ্র-নাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার কবিধর্ম, তাঁহার কবি-জীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য"।[১] স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যসম্পদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সম্পর্কে বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়, * *। কোন কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্যে যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃ ৫৪

ঘটিয়াছে কিনা জানি না। সেই জন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশী করিয়া পড়িতে হয়"।[২] কবির শিল্প ও সংগীত-জীবনকে নিবিড়ভাবে জানার বেলায়ও তাই।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে চিত্রে ভাস্কর্যে ও সংগীতেই শুধু নয়, মানুষের সর্ব প্রেরণার মূলেই থাকে এক কল্যাণময়ী ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাই প্রকাশ পায় সৃষ্টিধর্মী কার্যরূপে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মন ও সৃষ্টিধর্মের পিছনেও ছিল এক অনির্বচনীয় ইচ্ছার ইংগিত বা প্রেরণা। সেই প্রেরণাকে কবি বলেছেন 'কৌতুকময়ী অন্তর্যামী'। সেই কৌতুকময়ীই কখনও মানসসুন্দরী, কখনও অন্তর্যামী, কখনও বা জীবনদেবতা নামে পরিচিত। সেই কৌতুকময়ী অন্তর্যামী কখনও কবির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কবিতায় ও গানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন—

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।

এই কৌতুকময়ীই কবিকে কখনও প্রখর শীতের রাতে এক অজানা অভিসারের পথে অঙ্গুলি নির্দেশে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবি বলেছেন—'সংগীত-স্রোতে কূল নাহি পাই, কোথা ভেসে যাই দূরে'। সত্যই কবি-জীবনের সুগভীর জীবনরহস্যের পরিচয় পাই আমরা তাঁর কবিতায় ও গানে। কবি তাঁর ব্যাপক অনুভূতির পরিচয়দানপ্রসঙ্গে একটি পত্রেও বলেছেন: "এই তৃণ গুল্মলতা জলধারা বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্ক-দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী চলাচলের যোগ রয়েছে। * * আমরা যাকে জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনি দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হয়ে উঠতো"। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ নিবিড় ও অচ্ছেদ্য। এই বিশ্ববোধ ও বিশ্বনিয়ন্তার বোধই কবির জীবনকে করেছিল মহান্। এই অনির্বচনীয় জীবনবোধকেই কবি তাঁর সকল কবিতায়, গানে ও সৃষ্টিকর্মে প্রকাশ করেছিলেন একান্ত-ভাবে।

২। কাব্য-পরিক্রমা (২য় সংস্করণ), পৃ ১৫৭—১৫৮

কবির এই ব্যাপক বিশ্বচেতনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবোধরূপ চিরন্তন সত্যের উপলব্ধিসম্পর্কে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচক স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী বলেছেন—কবির জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। সেই জীবন কত যুগপর্ব থেকে কত বিচিত্র জীবপর্যায়ের ভিতর দিয়ে এই বর্তমানতায় এসে পৌঁছেছে, সেই জীবনই কবির অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন। "কবি তাহারি আবাসে পূর্ণ হইয়া বলেন—'যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে' এবং 'স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে', এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে সেই জন্যই তিনি বিশ্বচেতনাকে এক এক সময় অনুভব করিয়া থাকেন"।[৩] সুতরাং সমগ্র জীবনাভিব্যক্তির মধ্যে এক অখণ্ড চেতনার ধারাই জন্মে জন্মে নূতন নূতন সৃষ্টির কল্পলোকের বিকাশ ক'রে চলেছে, আর মহাকালের বুকে চলেছে অনন্ত সৃষ্টির খেলা অনাদি-অতীত অনাদি-ভবিষ্যৎ সীমারেখার মধ্যে। কবিও একথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না,
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

"সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ত্ব আরও স্ফুটতর হইবে। * * আত্মতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে পরমতত্ত্ব আরও ব্যক্ততর হইবে"।

এই রহস্যময় তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাতত্ত্ব।[৪] একথা সত্য যে, কবি এই জীবনদেবতার উপলব্ধিতেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরমসন্ধান লাভ করেছিলেন। কবি নিজেও তাই স্বীকার করেছেন: "বৈচিত্র্য যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, ঐক্যও ততই ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া সেই সমস্ত জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে এক চরম-সমাধানের মধ্যে সার্থক করিবে"। এই সার্থক হোয়ে ওঠাতেই কবির আনন্দ। এই সার্থকতার জয়গান গাওয়ার জন্যেই তাঁর গান। গানে তিনি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধের জয়গানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপিতার মহিমার জয়গানও করেছেন। এজন্যে সার্থক তাঁর সংগীত, সার্থক তাঁর সংগীতাভিসারী যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকাব্যের কবি বলে পরিচিত হোলেও কাব্যের

৩। কাব্য-পরিক্রমা (২য় সংস্করণ, ১৩৪০), পৃ ৩২—৩৩

৪। এ'সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

মতো সংগীতের মধ্যেও ছিল তাঁর আপন নিঃশব্দ গুঞ্জরণ। রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যেমন বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, কাব্যের মধ্যে তাঁহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ; আবার তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি; কাজেই তাঁহার মনের অপর অংশ সাহিত্যের ঐ সব শাখায় বিকশিত, কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার",[৫] তেমনি আমরা বলি—রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও অধ্যাত্ম-জীবনচেতনাকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হোলে তাঁর সকল শ্রেণীর সংগীতকেও প্রণালীবদ্ধভাবে পড়া ও বোঝা দরকার। কাব্যে সাহিত্যে নাটকে কিংবা চিঠিপত্রে তাঁর মানসিক গতি-প্রকৃতির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর সংগীতের ছন্দে, রসে ও ভাবে। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় আবার বলি: "কাব্যে-সংগীতে-গল্পে-নাট্যে-উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ ও তাঁহার প্রচারেও তিনি তেমন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। * * আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন; যখনই বিশ্বজীবনের কোন-কিছু তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে, বিচিত্র কর্মে ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসস্রষ্টা; তাঁহার সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয় যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া"।[৬] এই আপন অন্তরের অনুভূতিই কবিকে দিয়েছিল তাঁর সত্যকার জীবনরসের পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের নিবিড়তাই করেছিল তাঁর গানের মধ্যেও এক অনির্বচনীয় রসের সঞ্চার।

সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ নির্ভর করে সেই অনির্বচনীয় আনন্দ-

---

৫। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ (১ম খণ্ড, ১৩৬৮), পৃঃ খ.

৬। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃঃ ২—৪

রসের উপলব্ধিতে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মদৃষ্টির রহস্যানুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম 'কবির ধর্ম' অর্থে বিশ্বপ্রকৃতিরই প্রাণধর্ম। 'ধর্ম' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন: "জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকার নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শরীরপ্রাণের চেয়ে বড়ো—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। * * জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম,. আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য"। এই সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে এবং এই বিশ্বরূপ কবিরও জীবনধর্ম। রবীন্দ্র-সংগীতের আদর্শ এই জীবনধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সংগীত তাই চিরসম্পর্কিত। বেদনার সঙ্গে আনন্দের—বিরহের সঙ্গে মিলনের—মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের যে সম্বন্ধ, সেই আনন্দময় সম্বন্ধেরই পরিচয় দেয় কবির সংগীত। অনন্তযাত্রা'র পথে কবির বারবার তৃপ্তি ও অতৃপ্তি এই আলোছায়ার দোলাচলবৃত্তির জয়গানই তাঁর সংগীত। তাই কবির গান বা সংগীতের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্বের ধর্ম ও ভগবদ্‌সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তাই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং এই জীবনদর্শনেরই আলোকমেখলাদীপ্ত তাঁর সংগীত। তাই রবীন্দ্র-সংগীতের মর্মবোধ করতে গেলে তাঁর স্বচ্ছ জীবনানুভূতির পরিচয় লাভ আমাদের করা উচিত।

সকল সংগীতের আদর্শই মহৎ এবং সেই আদর্শ তার মর্মবোধ ও যথার্থ সৌন্দর্যদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। ভারতের সংগীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্র-কাররা স্বীকার করেন যে, কেবলি স্বর-সংগঠনের প্রকাশই সংগীত নয়, সেই স্বরসজ্জার বিকাশে যখন রসোচ্ছলতা ও ভাবসমৃদ্ধির হয় প্রকাশ তখনই সংগীত হয় প্রাণময় ও প্রেরণাসঞ্চারী। সুতরাং ভারতীয় সংগীতের প্রাণ-জাগরণের উপরই নির্ভর করে শিল্পী ও শিল্পকর্মের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা।

গীতাঞ্জলির প্রথম গানই সংগীতশিল্পীর জীবনে সৃষ্টি করেছে এক আলোড়ন। কর্মফলের স্পৃহা মানুষকে দেয় বন্ধন এবং সে বন্ধনই জীবন-সার্থকতার পথে সৃষ্টি করে অন্তরায়। জীবনের সকল কর্মপ্রেরণার মধ্যে যেমন থাকা প্রয়োজন আত্মনিবেদন, সংগীত-সাধনার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি।

অন্যান্য কর্মে আত্মগৌরব-লাভের ন্যায় সুরানুশীলন ও সুর-পরিবেশনের পিছনেও গীতিকারের থাকে আত্মগৌরব লাভ করার বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে, যার ফলে নিজেকেই শিল্পী দেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন, আর সুরাধিষ্ঠিত ভগবানের আসন হয় লাঞ্ছিত। তারি জন্যে কবি প্রার্থনা করেছেন—

আমার, মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

সংগীতশিল্পীও তাই অহংজ্ঞান দূর ক'রে আত্মনিবেদন করবেন ভগবানের চরণে, তবেই উৎসারিত হবে গান জীবন-জাগরণের আনন্দরসকে নিয়ে। বিশ্বসংগীতশিল্পী তাঁর সংগীতের সুরের আলোয় তাই সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে ফেলেন এবং তাঁর সংগীতে পাষাণ দ্রবীভূত হোয়ে সুরধুনীস্রোত হয় প্রবাহিত। তারি প্রতিধ্বনি ক'রে কবি গেয়েছেন,

তুমি, কেমন করে গান কর হে গুণী,
অবাক্ হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।[১]

কবি বলতে চেয়েছেন, যেন প্রত্যেক সংগীতশিল্পীই এই আদর্শে হন প্রদীপ্ত ও অনুপ্রাণিত।

প্রকৃতপক্ষে অহংবোধশূন্য শিল্পীর গান যখন হয় নিবেদিত সুর-ভগবানের চরণে, তখনই সংগীতের হয় যথার্থ মর্মবোধ। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, মন দিয়ে যখন তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, গান দিয়েই তখন জীবনদেবতার আরাধনা সার্থক হয়। সুরের মাঝে শিল্পী তখন নিজের সত্তা হারিয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হন, এবং ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যায় যখন সুরের ঘোরে, শিল্পী তখন প্রভুকে আহ্বান জানান বন্ধু বোলে। গানের সাধনা ও গানের পরিবেশন হয় তখনই আনন্দরসময়। কবি এখানে তাই সংগীতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন,

---

১। গীতাঞ্জলির ২২নং গান।

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।[২]

গানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের দেবতার সাধনা যে সচল ও সেই জীবনদেবতাকে যে লাভ করা যায় একথাই সংগীতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, গান বা সংগীত-সাধনার পথে মাঝে মাঝে যদি ব্যর্থতার বেদনা ও ক্রন্দন দেখা দেয়, তবেই বুঝতে হবে সাধকের লক্ষ্য স্থির ও অচঞ্চল, কেননা ব্যর্থতার আঘাত ও নিরুৎসাহই আনে উৎসাহ-সার্থকতার আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যর্থতার বেদনাভরা জীবন নিয়ে সেই বিশ্বসংগীতস্রষ্টার উদ্দেশ্যে গেয়েছেন,

গাবার মতো হয় নি কোনো গান,
দেবার মতো হয় নি কিছু দান,
মনে যে হয় সবই রইল বাকি,
তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁকি,
কবে হবে জীবন পূর্ণ ক'রে
এই জীবনের পূজা অবসান।[৩]

পরমশিল্পীর নিকট তাঁর সংগীত যে কত অকিঞ্চিৎকর এবং এ-জীবনে গীত সকল সংগীতই যেন ফাঁকিস্বরূপ—কবি এটিই নিবেদন করতে চেয়েছেন মহান্ সুরশিল্পীর চরণে। প্রকৃতপক্ষে নিরভিমানের গান হয় ধ্যান ও উপাসনা। তখন জীবনদেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যেই হয় গান, স্বার্থবদ্ধ মানুষের উদ্দেশ্যে নয়। গানের আনন্দযাত্রার মাঝে মাঝে তাই ব্যর্থতার বেদনা যে ভালো সেকথা কবি বার বার স্বীকার করেছেন। কেননা বেদনার আঘাতই করে জীবনযাত্রার পথকে প্রশস্ত।

প্রেমময়ের সঙ্গে মিলনের পথে ও জীবন-সাধনার পথে পাথেয় তাই গান। হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে যে মহান্ দেবতার অধিষ্ঠান, বিশ্বের অনু-

২। গীতাঞ্জলির ৭৮নং গান।
৩। গীতাঞ্জলির ১২৯নং গান।

পরমাণুতেও প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাণপুরুষের প্রতিমা। সংগীত হওয়া চাই তাই জীবনদেবতারই জয়গান, আত্মগরিমার বা যশোলিপ্সার জন্যে নয়। তাই অন্তরে বাহিরে যে চৈতন্যময় পুরুষের লীলাভিসার চলেছে অহরহ, সেই লীলার মহিমাগানই হবে সকল সুরশিল্পীর জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য। যুগ-যুগান্তরবাহী ঐ লীলার আস্বাদনকামী কবি তাই গেয়েছেন,

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির-মনে,
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।[৪]

বিশ্বের ব্যথিত মানুষের জন্যেই তো গান ও গানের প্রেমস্নিগ্ধ আবেদন। অগণিত নরনারীকে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্যের সীমাকে নিয়েই তো ভগবান অসীম—'সীমার মধ্যে অসীম তুমি'। বিশ্বের সকল অসুন্দর ও অকল্যাণকে নিয়েই তো তিনি সুন্দর ও কল্যাণমূর্তি। সেই অসীম ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। যুগে যুগে—বারে বারে তাই তাঁর নূতন নূতন লীলা, বারে বারে মানুষের খোঁজরও তাঁকে অন্ত নাই। এই অনন্তকাল অতৃপ্তির অনুসন্ধানেই তো পরম-আনন্দ ও পরমতৃপ্তি! তাই কবি গেয়েছেন,

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই।
বারে বারে নূতন লীলা তাই।

* * *

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর![৫]

লীলাবাদী রবীন্দ্রনাথের যিনি জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী, তিনি অন্তহীন অনন্ত। তাই বারে বারে তাঁর নূতন লীলা এবং লীলাভিসারী কবিরও সেই সঙ্গে তাঁকে খোঁজার আর অন্ত নাই। এখানে সংগীতশিল্পীকে তাই মনে

৪। গীতাঞ্জলির ১৩২নং গান।

৫। গীতাঞ্জলির ১৩৩নং গান। 'রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা' আলোচনা-পর্যায়েও এবং উল্লেখ করা হয়েছে।

রাখতে হবে তাঁর সাধনার পরিপূর্ণতার দিকে। কেননা অজস্র সাধনার চরম-উপহার একদিন না একদিন আসবেই তাঁর জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনার ইঙ্গিত দিয়ে পুনরায় তাঁর অন্তর্যামীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁরই সুরের লীলায় জীবন যখন পূর্ণ এবং চিরজীবন নানা ছলে যখন কবিকে তিনি গান গাইয়ে নিয়েছেন, তখন যেন এবার তাঁর চরণতলে তিনি স্থান লাভ করতে পারেন। কবি প্রতিটি সংগীতশিল্পীকেও এই আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি গেয়েছেন,

তব সুরের লীলাতে মোর
জনম যদি হয়েছে ভোর,
চুপ করিয়ে রাখো এবার
চরণতলে হে।
গান গাওয়ালে চিরজীবন
কতই ছলে হে।[৬]

নানা ছলে সারাজীবন গান গাওয়ার ফলে কবির মনে হয়—বুঝি তাঁর এবার চুপ করার পালা এসেছে। সুর-সাধনা হয়তো বা শেষ হয়েছে এবার। কিন্তু যে অন্তর্যামী জীবনদেবতা তাঁর মুখ হোতে ভাষা কেড়ে লন, তিনি আবার নূতন ক'রে দেন প্রেরণা। কবির জীবন পুনরায় সুরের পথে পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশের যাত্রায়। কবি তাই তো বলেছেন,

মনে করি এইখানে শেষ—
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন করে হৃদয় জাগে,
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।[৭]

উষার অরুণ আলোকপাত থেকে সুরু ক'রে সারাদিন যেন রাগের হয়েছে

৬। গীতাঞ্জলির ১৫৪নং গান।
৭। গীতাঞ্জলির ১৫৫নং গান।

পরিবেশন। এলো দিনশেষের পুরবীর আলাপ; এলো সন্ধ্যা ও রাত্রির অন্ধকার বিচিত্র রাগ-রাগিণীর বিকাশ নিয়ে জীবনের আঙ্গিনায়। একের পর এক সুরের আহুতি চলেছে জীবনযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে, শেষ আর নাই। কিন্তু জীবনের চরমশান্তিকে নিয়ে সমাপ্তি আসে আবার আলাপের এবং সেই সমাপ্তিই জীবনের শেষসমাপ্তি নয়, কেননা যুগ-যুগান্তরের পথে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আলাপের যাত্রা। কবি বলেছেন,

সকল আলাপ গেলে থেমে,
শান্ত বীণায় আসে নেমে,
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে।[৮]

নবীন উষার আলোকেই বিশ্বের গভীর অন্ধকার অপসারিত হয়। শিল্পীর জীবনও হয় তখন সার্থক গানের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে। তখন জীবনের যত পূজা, যত উপাসনা, যত কর্ম-কোলাহল, সবেরই হয় অবসান। আসে তখন শান্ত-নীরবতা ও নিঃসঙ্গতার গান, আসে প্রাণের আলাপ গোপনে অন্তরে অন্তরে অন্তর্যামী জীবনদেবতার সঙ্গে। কবি গান তাই—

কোলাহল ত বারণ হলো
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।[৯]

যথার্থ জীবনশান্তির পর শিল্পীর গান হয় তখন বন্ধনমুক্ত, মর্মের অন্তঃস্থলে গানের হয় তখন গুঞ্জন এবং জীবনদেবতার সহিত আনন্দ-মিলন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

গানের ভিতর দিয়ে
যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি,
আমি তখন তারে জানি।[১০]

৮। গীতাঞ্জলির ১৪৭নং গান।

৯। গীতিমাল্য ৮নং গান।

১০। ব্রাহ্মসংগীত (১২শ সংস্করণ, ১৩৪৬) ৩৪৯নং গান।

'পদ-উদ্ধৃতি-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ', 'প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর স্থান' এবং বিশেষ ক'রে 'গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব', ও 'পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব'-সম্বন্ধে সুনিপুণ ও প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন। আমরা 'রবীন্দ্রপ্রতিভায় পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব' পর্যায়ের প্রথমাংশে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, উদ্ধবদাস, পীতাম্বরদাস, বলরামদাস, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পদকর্তাদের অনুকরণে ও অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যে সকল পদ বা গান রচনা করেছেন তার উদাহরণ দিয়েছি। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিদের প্রত্যক্ষভাবে অনুকরণ না করলেও পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। কিন্তু সেই অনুসরণে কবি সন্তুষ্ট হোতে পারেন নি, বরং পদাবলীর মাধুর্যের সঙ্গে ভানুসিংহের অনাত্মীয়তার কথাই উল্লেখ করেছেন। এ'প্রসঙ্গে কবি বলেছেন: "পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানায় মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই"। এখানে কবির স্বীকারোক্তিতে বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে স্বীয় জীবনের অনৈক্যভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথাও তাই যে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা বৈষ্ণব-সাধনরীতি থেকে চিরদিন পৃথকই ছিল। অবশ্য এ'প্রসঙ্গের আলোচনা পরে 'রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে বিশেষভাবে করেছি।

তবে অধ্যাত্ম-সাধনপথ-রহস্যের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণবধর্মসাধনা থেকে পৃথক হোলেও মহাজন-পদাবলীর রস-মন্দাকিনীতে যে তিনি অবগাহন করেছিলেন সে প্রমাণের অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসপূর্ণ সাহিত্যভাষা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলির শব্দ-ঝংকার ও ছন্দলালিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল বা সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশ না পেলেও তা কোন কোন অংশে প্রায় সমশ্রেণীভুক্ত একথা স্বীকার করলে ভুল হবে না। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত ক'রে বলি যে, পদকর্তা গোবিন্দদাস যেখানে রসান্বিত পদলালিত্য প্রকাশ করেছেন,

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ

ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর-ভোরনি।
বিসরি গেহ নিজহু দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

'ভানুসিংহের পদাবলী'-র ভাষা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা অপেক্ষা কিছুটা কৃত্রিম হোলেও গোবিন্দদাসের প্রায় অনুরূপভাবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

গহন কুসুম-কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক-লাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়-কুসুমরাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ-বনমে আও লো॥

মোটকথা বৈষ্ণব-পদাবলীর মাধুর্যরসনির্যাস-নিষ্কাশনে রবীন্দ্রনাথ কম নিপুণ প্রচেষ্টা করেন নি এবং এর প্রমাণ তাঁর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নিবন্ধ। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'-নিবন্ধে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রেম-সম্পর্ককে কবি নিবিড় ও বাস্তব বলেছেন। তিনি বলেছেন: "বিদ্যাপতি সুখের কবি ও চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। * * বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন"। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের কাছে চণ্ডীদাস ছিলেন বিদ্যাপতি অপেক্ষাও সকরুণ, সচল ও কোমল, কিন্তু পদ-রচনার মাধুর্যে ও রস-সম্ভোগের ক্ষেত্রে উভয়েরই তুলনা নাই। বৈষ্ণব-পদাবলী-রসসম্ভোগবিলাসী রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার সম্বন্ধেও আমরা বলি সত্যই তার তুলনা নাই। এই বিচিত্র বিষয়ে প্রতিভার উল্লেখ ক'রে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমানবাবু বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্যুতি যাহার উপর পড়িয়াছে তাহাই উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর হইয়া ফুটিয়াছে। কি মহাভারতের

কাহিনী, কি বৌদ্ধ উপাখ্যান, কি কালিদাসের কাব্য নাটক, কি বৈষ্ণব-পদাবলী যাহা-কিছু তাঁহার পরশ পাইয়াছে তাহাই সোনা হইয়াছে"।

ডক্টর শ্রীমজুমদারের মতে, ১৩১৩ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর ভাব-মাধুর্যকে স্বকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-তে প্রকাশ করেন, এবং 'বলাকা'-রচনার কাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত এই ছাব্বিশ বৎসরকাল কবি বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ও সাধনপ্রণালী তটস্থ সমালোচনার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এবং পদাবলীর ছন্দ, ভাব ও বিষয় যতটা সম্ভব বর্জন ক'রে চলেছেন বলা যায়।[১] তবে একথা স্বীকার্য যে, কবি যখন 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' রচনা করেন (১৩১৩—১৩২১ খ্রীঃ) তখন তাঁর ভাষা ও ভাবের মধ্যে এক অভিনব সারল্য ও অনাড়ম্বরতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সহজাত স্বচ্ছল ভাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল লক্ষ্য করা যায়। তাই ডক্টর শ্রীমজুমদার সত্যই বলেছেন যে, ঠিক ঐ সময়কার ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, দ্বিজ বলরামদাস, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর বা সহচরদের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র অধিকাংশ গানে বৈষ্ণব-পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাবসম্বন্ধেও অতিসুন্দর ও সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান'-গ্রন্থে। এ'বিষয়ে যে তিনি পথিকৃৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র গানগুলির মধ্যে আমরা দেখি—

(ক) আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। —ইত্যাদি
—গীতাঞ্জলি ৩৪

(খ) আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

১। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান (১৩৩৮), পৃ ৬৭

আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম ;
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম
চাই সে বারে বারে। —ইত্যাদি

—গীতাঞ্জলি ২০

(গ) দয়া দিয়ে হবে মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে। —ইত্যাদি

—গীতাঞ্জলি ৭৫

(ঘ) আমি অধব অবিশ্বাসী,
এ' পাপ-মুখে সাজে না যে
তোমায় আমি ভালোবাসি।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে,
কঠিন ধুলায় বসে এবার
চরণ-সেবার অভিলাষী। —ইত্যাদি

—গীতিমাল্য ৬

(ঙ) তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে
বলব চোখের জলে। —ইত্যাদি

—গীতিমাল্য ৩২

(চ) সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।

ফলের তরে নয় তো খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই। —ইত্যাদি
—গীতালি ৩৭

(ছ) মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ,
আমার মাঝে, হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে, মোহ
ঘুচল এ' নয়নে। —ইত্যাদি
—গীতালি ১০৪

তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-রচিত আরো অনেক গান আছে যাদের ভাব ও রসের তুলনা করা যেতে পারে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচিত গানের ভাবের ও রসের সঙ্গে। যেমন গোবিন্দদাস-রচিত একটি রাধা-অভিসারের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গানটির ভাবের ও ভাষাশৈলীর অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের গানটি হোল—

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শব্দে জিউ কাঁপ ॥
তহিঁ দিবি জারত বিজুরিক জালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা ॥
ঐ ছল কুঞ্জে একলি বনমালি।
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি ॥
—পদকল্পতরু ৯৯১

গান-দুটির মধ্যে পার্থক্য হোল : যেখানে গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণ তাঁর "এক গর্জনমুখর বর্ষার রাত্রিতে সঙ্কেত-কুঞ্জে বসিয়া ভাবিতেছেন এমন রাত্রিতে রাধা যদি অভিসারে বাহির হন তবে তিনি কত কষ্টই না পাইবেন—আজ তিনি না বাহির হইলেই ভাল", সেখানে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন (নায়কের পরিবর্তে) তাঁর "নায়িকা অনুরূপ দুর্যোগের রাত্রিতে তাঁহার পারণ-সখা বন্ধুর (নায়কের) জন্য দুয়ার খুলিয়া বসিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন বন্ধুর (নায়কের) আমার আসিতে কত কষ্টই না

হইতেছে"। আসলে নায়ক ও নায়িকার মিলনাকাঙ্ক্ষা ও বিরহ-কাতরতা উভয়ের গানেরই ভাবসম্পদ।

ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'আমার মিলন লাগি তুমি, আসছ কবে থেকে' গানটির ভাববস্তুর সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাটে; আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া, দেখিয়া পরাণ ফাটে' গানটির ভাবের বেশ সাদৃশ্য আছে। বিরহ ও মিলনের বেদনা ও আনন্দের দ্বন্দ্বধারা উভয়ের গানের মধ্যেই সুস্পষ্ট। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানে 'প্রভু' 'নাথ' ও 'প্রিয়' সম্বোধন বৈষ্ণব-পদাবলীর 'সখি', 'বধু' 'বন্ধু', 'নাথ' প্রভৃতি প্রিয়-সম্বোধনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন: (১) প্রভু ও নাথ সম্বোধন গীতাঞ্জলির ২৪, ২৮, ৪০, ৫৩, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৭৯, ৮৬, ৯২, ১০৯, ১৩৮, ১৪৪ এবং ১৪৮ সংখ্যক কবিতায় আছে। (২) প্রিয় সম্বোধন গীতাঞ্জলির ১৭, ২০, ২১, ২৩, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৯৪ এবং ১২১ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়"। হয়তো প্রশ্ন হোতে পারে যে, কেবল প্রভু, নাথ, প্রিয় প্রভৃতি সম্বোধনই কি প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র এবং অন্যান্য গানগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর দ্বারা প্রভাবিত?

আসল কথা যে, এ'সকল মধু-সম্বোধন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের ও বিশেষ ক'রে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র বেশীর ভাগ গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও রস-মাধুর্যের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ ও রস-লালিত্যের সাদৃশ্য প্রায় সমান। কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণব-পদাবলীর অপার্থিব রাধাকৃষ্ণের অবিনাভাবসম্পৃক্ত প্রেমধর্মের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক অনুসরণ করেন নি এবং সেকথা 'রবীন্দ্র-সংগীতে দার্শনিকতা' পর্যায়ে এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। ১৩১৫ সালে 'শান্তিনিকেতন'-এ রবীন্দ্রনাথ সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশও করেছেন। তিনি বলেছেন: "প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রস-সম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরমসিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা,

জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই, কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি"।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈষ্ণবপ্রেম-সাধনার অপার্থিব পথ-বিচার-সম্বন্ধে একটু ভুল করেছেন। স্বর্গীয় প্রেমরসাস্বাদনই বৈষ্ণব সাধক-জীবনের সকল বাসনাবন্ধন ও দুঃখ-যাতনার অবসান ঘটায়, পৃথক ক'রে জ্ঞান ও কর্মের পথকে আর আশ্রয় করতে হয় না। মোটকথা যথার্থ প্রেমের পথে জ্ঞান ও কর্মের কোন অপেক্ষা থাকে না, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বলা যায়, শুদ্ধপ্রেম ও শুদ্ধজ্ঞান এক ও অভিন্ন। অবশ্য এই বিশুদ্ধ প্রেম বা প্রেমরসাস্বাদন সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়, মানসিক বিচার ও বুদ্ধির খেলা সেখানে বোধে বা উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়।

যাইহোক রবীন্দ্রনাথের গানে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব বা সংস্পর্শের আলোচনাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবপ্রেম-সাধনার নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও গানের ভাব এবং আদর্শের যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় এবং বিশেষ ক'রে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র অধিকাংশ গানে বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলীসাহিত্যের প্রভাব বা স্পর্শ কতটুকু তা আলোচনা করা। পরিশেষে তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমানবাবুর মতোই বলি : "আধুনিক মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' এমন এক স্বর্গীয় সুধা পরিবেশন করে যাহা গান করিলে বলিবার শক্তি পাওয়া যায়—

> মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ,
> আমার মাঝে, হে আনন্দ,
> তোমার প্রকাশ দেখে, মোহ
> ঘুচল এ' নয়নে"।

মোটকথা বৈষ্ণব-পদাবলীসাহিত্যের দ্বারা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ প্রভাবিত হোলেও তারা স্বকীয়তার আসনেই অধিষ্ঠিত ও মহিমান্বিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাটকীয় সংগীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথ

নাটকের উদ্দেশ্যে বা নাটকসম্পর্কে রচিত সংগীত সাধারণত নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীত নামে পরিচিত। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে রচিত সংস্কৃত নাটক-গুলিতেও সংগীতের সমাবেশ পাওয়া যায়। নাটকে সংগীত-যোজনার মুখ্য উদ্দেশ্য একটানা সংলাপ ও চরিত্র-ধারাবাহিতার মধ্যে বিরতির আনন্দ সৃস্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় বিষয়বস্তু ও ব্যক্তব্যকে অর্থময়, রসময় ও প্রাণচঞ্চল করা। নাটকীয় চরিত্র ও বিচিত্র সংলাপ প্রভৃতির সার্থক আবেদনও সৃষ্টি করে সংগীত এবং অভিনয়কর্মের পূর্ণতাসাধন করেও সংগীত। তাই দেখি, মহাকবি কালিদাস, ভাস, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি বিদগ্ধ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের রচয়িতারা সংলাপসমৃদ্ধির পথে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে সংগীতের সন্নিবেশ করেছেন শিল্পীচিত্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃচিত্তেও আনন্দ-রস পরিবেশনের জন্যে।

বাংলা নাটকে সবপ্রথম সংগীতের যোজনা হয় ১৭৭৪ শকাব্দে তথা ইংরেজী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদার-লিখিত 'ভদ্রার্জুন' নাটকে। কিন্তু সংগীতের সাহিত্যসম্পদ ছিল তখন সম্পূর্ণ কাব্যসুষমারহিত। এর পর ১৭৭৫ শকে তথা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ-রচিত 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটকের হয় আবির্ভাব এবং কিছু কিছু সংগীত যোজনাও সেই নাটকের বিষয়-বস্তুকে করে রসায়িত। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'কৌরব-বিয়োগ', 'বারুণীবারণ বা সুরার সঙ্গদোষ', 'রজত গিরিনন্দিনী', 'চারুমুখচিত্তহরা' প্রভৃতি বাংলা নাটকও এবং কিছু কিছু সংগীতেরও সমাবেশ থাকে ঐ নাটকগুলিতে। কিন্তু নাট্যসংগীতের সুর ও তাল ঐ সব নাটকগুলিতে অভিজাত শ্রেণীর হোলেও সাহিত্যরচনা ছিল কাব্যরসবর্জিত।[১] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মালতী-মাধব' প্রভৃতি নাটকেও আত্মপ্রকাশ

১। এ' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের 'নাট্যসংগীতের রূপায়ন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করলো নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীতের রূপ এবং সংগীতের ভাষায় এলো অনেকটা পরিমার্জিত রূপ।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৭ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'জনা', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'নিমাইসন্ন্যাস, 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'নসীরাম', 'পূর্ণচন্দ্র', 'শঙ্করাচার্য' প্রভৃতি নাটক নাটিকায় ও প্রহসন-নাট্যে নাটকীয় সংগীতের রূপে এলো এক নূতন বিকাশের সমুজ্জ্বল রূপ। বাঙলাদেশে সংগীতবিকাশের ইতিহাসেও তখন নূতন যুগ-সৃষ্টি বলা যায়। মানুষের সংগীত-রুচি ও সংগীত-জীবনরসেও দেখা দিল তখন এক নূতন অভ্যুদয়। সেই নূতন অভ্যুদয়ের যুগ-সন্ধিক্ষণেই গিরিশ-চন্দ্রের নাটকীয় সংগীতে প্রকাশ পেল এক রসোজ্জ্বল রূপ এবং সৃষ্টি হোল আনন্দময় পরিবেশ। সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন: "গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোন নাট্যকারই সংগীতকে নাটকীয় তাৎপর্যের সঙ্গে তেমন ক'রে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র নানা ধরনের নাটকীয় সংগীত রচনা করেন। তার মধ্যে তাঁর শ্যামাসংগীত ও ভক্তিমূলক সংগীতগুলিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বিল্ব-মঙ্গল' নাটকের সংগীত-সন্নিবেশ সর্বাধিক নাটকীয় গুণসম্পন্ন। * * কিন্তু গিরিশচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যদৃষ্টি ছিল, যার ফলে তাঁর নাটকীয় সংগীত অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত"।[২] শুধু 'বিল্বমঙ্গল'-ই বা কেন, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও প্রহসনিক নাটকে ও নাটিকায়ও সংগীতের রূপ আনন্দোজ্জ্বল।

গিরিশচন্দ্রের পর রসরাজ অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যকারগণ কর্তৃক অংশে নাট্যসংগীত-রচনায় গৈরিশশৈলীকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ১৮শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারগণের নাটকীয় সংগীত-রচনায় সংগীতের রূপে এলো এক নূতন জাগরণ এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত-রচনায় সুর ও

২। দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার (১৯৬০), পৃ ৪০০

সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টি হোল এক হরগৌরীমিলনের মাধুর্য। আনন্দোজ্জ্বল সেই রূপ; রসচঞ্চল সেই নাট্যসংগীতের বিকাশ ও আবেদন।

রবীন্দ্রনাথ গানের জন্যে গান, কিংবা কাব্যের জন্যে গান অথবা নাটকের জন্যে গান রচনা ছাড়াও বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান উৎসব-সম্পর্কে গান রচনা করেছেন অসংখ্য সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। গেয়নাট্য বা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য-সম্পর্কিত গানের নিদর্শন তো আছেই। তাছাড়া কবি তাঁর বিচিত্র নাটকের অনুসঙ্গী ক'রে নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীতও রচনা করেছেন অসংখ্য। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য হিসাবে তিনি রচনা করেছেন 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রভৃতি।[৩] এ'সকল নাট্যে গানেরই মেলা আর স্বর-নিবেদনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্র ও জীবনের রূপায়ন। গানের সাহিত্য এ'সকল গীতি ও নৃত্যনাট্যে রসোত্তীর্ণ, অপরূপ ও অনন্যসাধারণ। এ' ধরনের সংগীতময় নাটকের সৃষ্টি এক রবীন্দ্রনাথের হাতেই সার্থক হওয়া সম্ভব হয়েছে।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'নাট্যগীতি' নাম দিয়ে নাটকীয় সংগীত রচনাও কম করেন নি। কবির নাট্যগীতির কথা ও স্বরের ছন্দ তরঙ্গায়িত। কবি-রচিত 'শ্যামা'-সম্পর্কিত একটি গানের নিদর্শন যেমন,

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে ॥

রুনু রুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর, মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতস্বর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে ওঠে করতালি ধ্বনি—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে ॥

নিরালয় তোর বনের মাঝে সেথা কি এমন নূপুর বাজে।
এমন মধুর গান? এমন মধুর তান?
কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস্ কবে?
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে ॥

গানের কথা বা সাহিত্য ভাবসমৃদ্ধ, কাব্যসঙ্গী ও রসচেতন। রবীন্দ্রনাথের এই 'শ্যামা'-সম্বন্ধীয় সংগীতের কথায় মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং Kali the Mother বাংলা ও ইংরাজী

৩। এ'সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

কবিতা-দুটির কথা। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ নৃত্যশীলা শ্যামার রূপ-বর্ণনায় লিখেছেন—

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস বলে মা দানবজয়ী॥—প্রভৃতি

'শ্যামা'-সম্পর্কিত আর একটি নাট্যগীতি রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমরা নৃত্য করি সঙ্গে॥
দশ দিক আঁধার করে মাতিল দিক্-বসনা,
জলে বহ্নিশিখা রাঙা বসনা—
সুখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে—
ত্রিভুব কাঁপে ভুরুভঙ্গে॥

নিছক নাটক-সম্পর্কিত না হোলেও নাটকীয় সংগীতের রসবাহী এই কবিতা বা সংগীতগুলি।

এবার রবীন্দ্রনাথের নিছক নাটকাশ্রয়ী সংগীতেরই নিদর্শন দেব কিছুটা। 'রাজা ও রাণী' নাটকে নাট্যসংগীতের সংখ্যা অধিক না হোলেও সখীগণ, ইলা, কাঠুরিয়া প্রভৃতির কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে সংগীতের আবেদন। 'রাজা ও রাণী'-র দ্বিতীয় দৃশ্যে কুমার সেন ও ইলার সম্মুখে সখীদের গান প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যরসপূর্ণ। সখীদের গান—

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই।—প্রভৃতি

ইলার গান অর্থপূর্ণ ও দর্শননির্ভর। ইলার গান—

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।

ভালোবাসে সুখে দুঃখে,
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির জীবননির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশ নাই বল্‌লেই চলে। কিন্তু তাহলেও দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্দিরে অপর্ণার কণ্ঠে সুর-সাহিত্য-পূর্ণ সংগীতের ব্যঞ্জনা দেখি—

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিকক্ষণ।
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ' 'মালিনী' প্রভৃতি নাটিকায় সংগীতের বিশেষ সমাবেশ নাই। কিন্তু তাঁর 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'অরূপ-রতন', 'ঋণশোধ', 'মুক্ত-ধারা', 'রক্তকরবী', 'চিরকুমার-সভা', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ', 'নটীরপূজা', 'শেষরক্ষা', 'পরিত্রাণ', 'তপতী', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটক ও নাটিকায় নাটকীয় সংগীতের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত রাগে ও তালে ক্ল্যাসিক্যাল ও দেশী শ্রেণীর কত নাট্যসংগীতেরই না সমাবেশ করেছেন তাঁর নাটক ও নাটিকার তাৎপর্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ কখনও বালকদলের কণ্ঠে দিয়েছেন গান—

(১) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি।—প্রভৃতি

(২) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।—প্রভৃতি

আবার ঠাকুরদাদার কণ্ঠে দিয়েছেন—

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্‌রে সবাই, টান্‌রে সবাই টান্‌।
বোঝা যতই বোঝাই করি
করব রে পার দুঃখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক্‌ প্রাণ। – প্রভৃতি

পুনরায় সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

তোমার সোনার আলোয় সাজাব আজ
দুঃখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার। —প্রভৃতি

গানের ভাব ও ভাষা প্রাণবান ও সচ্ছল। 'শারদোৎসব' নাটকের শেষে সমবেত কণ্ঠে গানের সাহিত্য রসোচ্ছল ও ভাবমুখর। নাটকে এ' ধরনের ভাবোজ্জ্বল গান বাংলা সাহিত্যের জগতে গৌরবময়। বালকগণের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে! —প্রভৃতি

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে গানের সমাবেশও অপরূপ। অন্ধকার ঘর; রাণী সুদর্শনা ও তাঁর দাসী সুরঙ্গমা। আলোর ভিখারিণী সুদর্শনা। সুরঙ্গমা আলোকে আহ্বান জানিয়ে গেয়েছে—

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও, সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে। —প্রভৃতি

এর পর সুরঙ্গমার কণ্ঠেও গীত হয়েছে—

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ।
নিঃশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন। —প্রভৃতি

কিছুক্ষণ পরে বালকগণের সঙ্গে ঠাকুরদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে আবার দক্ষিণ-বাতাসের আহ্বান-সংগীত—

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো। —প্রভৃতি।

এর পর গানের আর শেষ নাই। বাউলদলের গান, পাগলের গান, নাগরিক-দলের গান, নাচের দলের গান—এভাবে সমবেত কণ্ঠে, একক কণ্ঠে গানের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে। নাটকের সার্থক পরিবেশন কবির মনে যে আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি করেছিল, তাই ব্যক্ত হোয়ে নৃত্যশীল বালকদের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়েছিল—

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।—প্রভৃতি

এভাবে সকল নাটক ও নাটিকার সকল সংগীতের নমুনা দেওয়া এ' প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। তবে নাটকের প্রয়োজনে বা নাটকের সৌকর্য ও সৌন্দর্য-সাধনে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশকর্মে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনা নাই। সময়ে সময়ে নাটকীয় সংগীতে সাংকেতিক ইঙ্গিত স্বপ্নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত করে, আবার বাস্তবের অধ্যক্ষ রূপায়নও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিল্পীর মনে আঁকে স্বপ্নলোকের ছবি। নাটকীয় সংগীতে কবির এই আলো-ছায়ার দোলা দেবার যে অপরূপ ভঙ্গী, নাট্যসংগীতের ও নাট্যজগতের ক্ষেত্রে তা সত্যই অতুলনীয়। কবি ও মরমী নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ প্রায় সকল ইংগিতময় নাটকেরই মর্মকথার আভাস দিয়ে বলেছেন—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুনিয়ে।
আমারে কতো কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
*   *   *
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

পঞ্চক ও শোণপাংশুগণকে উপলক্ষ্য ক'রে কবির অন্তরের কথার রেশই প্রতিধ্বণিত হয়েছে তাঁর প্রায় সকল নাটকীয় সংগীতে। অবশ্য হাস্য-কৌতুকের কিংবা বিচিত্র পরিবেশ-প্রাসঙ্গিক গানের নাট্যসংগীতের কথা স্বতন্ত্র।

'ফাল্গুনী' নাটকে সংগীতের কথাই ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধবসন্ত-রাগের একান্ত বিলাসী এবং বসন্ত-ঋতুর ছিলেন পরম-অনুরাগী। অবশ্য বর্ষা-বাদলের পরিবেশও ছিল তাঁর কাছে একান্ত প্রিয়। 'ফাল্গুনী'-নাটকের সূত্রপাতে যুবকদলের কণ্ঠে কবি দিয়েছেন বসন্ত-আহ্বানের গান—

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

* * *

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে ॥

এখানেও নাটকীয় সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে কবি-মনের গোপন-কথা নব-পল্লবিত সুষমাবেশিত বসন্ত-ঋতুর আহ্বান-গীতের মাধ্যমে। অবশ্য নাট্য-সংগীত বা নাটকীয় সংগীতের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি-মনের দর্শনরূপের অনুশীলন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সংগীত যে রসোত্তীর্ণ হোয়ে নাটক-সীমানারও বহু উর্ধে উন্নীত একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

এ' প্রসঙ্গে নাটকীয় সংগীত না হোলেও নাটকে সংস্কৃত শ্লোকের অনবদ্য অনুবাদ-লালিত্যের উল্লেখ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। নাটকে নাটকীয় সংগীতের সাহিত্য-মহিমার মতো সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদগুলিও নাটক-পরিবেশকে সমুন্নত ও উজ্জ্বল করেছে। 'চিরকুমার সভা' নাটকে এ' ধরনের অনুবাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। 'চিরকুমার সভা'-র তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি রসিকের কণ্ঠে উচ্চারিত—

(১) অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্—
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্ ॥

বিশ্বসত্তাকে বাদ দিয়ে বিশ্বাত্মা ভগবানের উপলব্ধি মিথ্যা। কেননা তিনিই তো বিশ্বচরাচরের সর্বত্র অনুস্যূত। তিনি বিশ্বময়। তাই বিশ্বসৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে বিশ্বাত্মার অপরূপ রূপ-লাবণ্য উপলব্ধি করতে হয়। রূপের ভিতর দিয়েই অরূপের হয় সাধনা ও অনুভূতি। তারপর একথাও সত্য যে, গানের রূপরেখায় যখন রসধারার বর্ষণ হয়, তখনই অসীম এসে ধরা দেন সীমার মাঝে, অরূপ ধরা দেন রূপের মাঝে। এটাই তো গানের গোপন-রহস্য। কবি বলেছেন যে, গানের আলোকেই চিনে নেন তিনি তাঁর আজন্ম-সাধনার ধন সেই রহস্যময়ী অন্তর্যামীকে—চিরদিন যিনি কবিরে হাসালো কাদালো ও চিরদিন দিল ফাঁকি। এবার তাই গানের রূপের মধ্যে দিয়ে অরূপের সঙ্গে হবে মিলন, হবে দেবতাকে কবির জানা। আর এই জানাজানির আকুলতাই আনবে বিরহ-বেদনার সঙ্গে মিলন-আনন্দ। কবি গেয়েছেন—

তখন তারি আলোর ভাষায়,
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায়
জাগে পরমবাণী।

প্রেমবৈচিত্ত্যের পর এ' যেন ভাব-সম্মিলন ও পরমমিলন। ভাষা তখন হয় প্রাণময় ও আলোকদীপ্ত, প্রেমধারায় আচ্ছন্ন হয় বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণু এবং সেই প্রেমের আলোকস্পন্দনেই শোনা যায় জীবনদেবতার প্রাণদীপ্ত মিলন ও সান্ত্বনার বাণী। এই বাণী সুরশিল্পীর জীবনের অন্তরে বাহিরে আনে অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ, আনে জাগরণ। গানের সার্থকতাই তো এখানে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সংগীতপিয়াসী। তাই তিনি গান রচনা করেছেন অফুরন্ত; গানের মালা গেঁথেছেন সারা জীবন ধরে, গান গেয়েছেন অবিশ্রান্ত এবং গানের সুরে প্রিয়তম জীবনদেবতারই করেছেন বন্দনা। যেমন তিনি গেয়েছেন,

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,

দিয়ো তোমার জগৎ-সভায়
এইটুকু মোর স্থান।

গান ও সুরের পসরা সাজানোই ছিল যেন কবির জীবনব্রত। আর এটাই তো স্থষ্টির সার্থক প্রেরণা!

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের গান জীবনসাধনায় গান এবং রবীন্দ্রনাথের সুর জীবন-জাগরণের সুর। কথা ও সুরের বেণীবন্ধনে গান রচনা করেছেন তিনি নিজের জীবনাদর্শকেই অনুসরণ ক'রে এবং সেই আদর্শ শুধু তাঁরই নয়, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জীবনানুভূতির পরমপরিণতি। একথা আমরা জানি যে, রচনাকে রূপদান করে রচয়িতা তাঁরই প্রতিভার দীপ্তি দিয়ে এবং সেই দীপ্তিই আনে পুলক ও জাগরণ শিল্পী ও শ্রোতার অন্তরে। সুতরাং রচনা রচয়িতার ব্যক্তিচেতনারই প্রতিফলন ও দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথও গান রচনা করেছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার আলোকে এবং সেই আলোকও স্নিগ্ধস্নাত অধ্যাত্ম-অনুভূতির অমৃতধারায়। সুতরাং সুরশিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের জীবনমন্থনজাত রসধারা এবং সেই রসধারাকে প্রবাহিত রাখতে হবে তাঁর প্রতিটি গানে ও প্রতিটি কবিতায়। সুতরাং সুরের, কথার ও ছন্দের যান্ত্রিক প্রতিফলন নয় রবীন্দ্রসংগীতের সাধনা বা অনুশীলন; রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের প্রতিফলনই যথার্থ রবীন্দ্রসংগীত এবং তার জন্যে পরিচিত হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথেব জীবনদর্শনের সঙ্গে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা

'দর্শন' শব্দের সার্থকতা চাক্ষুষ দেখায় বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে,—ইংরাজীতে যাকে বলা যায় 'immediate awareness' বা 'to see God face to face'। সুতরাং দেখায়, শোনায়, জানায় বা কেবলমাত্র পড়ায় নয়, প্রত্যক্ষ-অনুভূতি বা চাক্ষুষ-উপলব্ধির নামই 'দর্শন'। পাশ্চাত্যে 'ফিলজফি' তথা 'দর্শন'-শব্দটির পূর্ণ-সার্থকতা নির্ভর করে বৌদ্ধিক জ্ঞান বা intellectual knowledge-এর উপর, কিন্তু ভারতবর্ষে বোধি বা intuitive knowledge-র সার্থকতা ও সমাদরই সমধিক। এই বোধি বা জ্ঞান বুদ্ধির পরিশুদ্ধ রূপ এবং প্রাণের তথা মহাপ্রাণের যথার্থ জাগরণ। দর্শনশাস্ত্রে মনের উপযোগিতা আগে, তারপর মন বিশুদ্ধ হোলে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি স্থিত বা বিশুদ্ধ হোলে বোধি বা স্বপ্রকাশ জ্ঞানের উপযোগিতা। এ'জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত নয়,—অতীন্দ্রিয়। রবীন্দ্রসংগীতের দার্শনিকতায় কেবল মানস কিংবা বৌদ্ধিক জাগরণের দীপ্তিই সব নয়, বোধির স্বচ্ছ রস-নির্যাস বা রসনিঃসৃত প্রকাশ ও আনন্দতৃপ্তিই আসল।

সংগীতে দর্শনের সার্থকতা সংগীতের প্রাণপুরুষকে জাগ্রত করা। 'গানাৎ পরতরং ন হি' কিংবা 'ন বিদ্যা সংগীতাৎ পর',—'গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নাই' এ'কথার সার্থকতা এ' নয় যে, সংগীত পরিধিতে বা পরিমাণে বড় বা বিস্তৃত কিন্তু আদর্শ ও আনন্দতৃপ্তির দিক থেকেই সংগীত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই আদর্শ ও আনন্দস্বরূপকে আমরা সাধারণত জানতে বা বুঝতে পারি না, আর না-পারার অক্ষমতাই সংগীত-জীবনসিদ্ধির পথে আনে ব্যর্থতা। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধুই ছিলেন না বুদ্ধির সাধনসিদ্ধ কবি, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ বোধিরও আলোকদীপ্ত এবং সেই সার্থকতার আলোকেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর সংগীত ও কাব্য। সুতরাং গান ও কবিতা তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনানুভূতিরই প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি।

মানুষের জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার জীবনচিন্তা ও জীবনসাধনার উপর

এবং সর্বোপরি পরমসত্যের পূর্ণ-উপলব্ধিতে। "রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা"-সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাই এটুকু যাচাই করা প্রয়োজন যে, জীবনসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চরমসত্যোপলব্ধির স্পর্শ লাভ করেছিলেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ 'হিবার্ট-লেকচার'—'*Religion of Man*'-নিবন্ধে ১ তাঁর জীবনোপলব্ধির দিয়েছেন কিছুটা পরিচয় এবং সে পরিচয় থেকেই পাওয়া যাবে কবির বর্তমান ও ভবিষৎ ভাবগবত জীবনের ছন্দ, গতিপ্রকৃতি, চিন্তাধারা ও অনুভূতি। সেই *Religion of Man*-নিবন্ধে তিনি বলেছেন:

(a) This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning. On the contrary, it has followed the current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my conscionsness ***with a dircet vision.*** [2]

(b) When I was eighteen, a sudden spring breeze of religious experience for the first tune came to my life and passed way leaving in my memory a dircet message of spiritual reality. One day while I stood watching at early dawn the sun sending out its rays from behind the trees, I suddenly felt as if some ancient mist had in a moment lifted from my sight, and the morning light on the face of the world revealed an inner radience of joy. The invisible serene of the commonplace was removed from all things and all men, and their ultimate significance was intensified in my mind; and this is the definition of beauty. That which was memorable in this experience was its human message, the sudden expansion of my consciousness in the super-personal world of man.

(c) When I grew older and was employed in a responsible work in some villages * *. The ordinary work of my morning had come to its close, and before going to take my bath I stood for a moment at my window, overlooking a market-place on the bank of a dry river bed, welcoming the first flood of

---

১। পরে মেসার্স জর্জ এ্যালেন আনউইন এণ্ড কোম্পানি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

2. Vide *The Religion of Man* (1944), p. 17

3. Ibid., pp. 93-94.

rain along its channel. Suddenly I became conscious of a stirring of soul within me. My world of experience in a moment seemed to become lighted, and facts that were detached and dim found a great unity of meaning. [1]

(d) I still remember the day in my childhood when I was made to struggle across my lessons in a first primer, strewn with isolated words smothered under the burden of spelling, * * Suddenly I came to a rhymed sentence of combined words, which may be translated thus—'It rains, the leaves tremble'. At once I came to a world wherein I recovered my full meaning * * The unmeaning fragments lost their individual isolation and may mind revelled in the unity of a vision.

In a similar manner, on that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth. All things that had seemed like vagrant waves were revealed to my mind in relation to a boundless sea. I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening inidividuality which is a spiritual work of art'. [2]

'জীবনস্মৃতি'-তে 'প্রভাতসংগীত'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনানুভূতির আর একটি পরিচয়ও দিয়েছেন যার উল্লেখ এ'সম্পর্কে প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখেছেন: "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের

1. Ibid., p. 95
2. Ibid. pp. 95-96,

স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে—তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না" ।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই দিব্যদর্শন বা অন্তর-উপলব্ধিই ভাবঘন মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পরে 'কৌতুকময়ী অন্তর্যামী' বা 'জীবনদেবতা'-রূপে গানে ও কবিতায়। *Religion of Man*-এ সে মর্মকথার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন: "This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressed to what I called *Jivan devatā*, the Lord of my life" । কবির 'মানসসুন্দরী', 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা'—'সিন্ধুপারে' 'চিত্রা' 'নিরুদ্দেশে যাত্রা', 'চৈতালী' প্রভৃতি কবিতায় রূপ লাভ করেছে এবং কবি সেই জীবনদেবতার পরমকৌতুকময় রহস্যতম ভাবতত্ত্বকেই বিশ্বজীবনবোধে চরম ও পরম অনুভূতি বলে স্বীকার করেছেন।

প্রকৃত কথাও তাই যে, 'জীবনদেবতা'-রূপ পরমরহস্যময়.'ভাবতত্ত্ব' বা অপার্থিব ধারণাই কবির জীবনের সুনির্মল নিসর্গানুভূতির ফলশ্রুতি। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেন, এই অনুভূতি 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে আরম্ভ ক'রে 'মানসী' ও 'চিত্রাঙ্গদা' পর্যন্ত প্রাণরস সঞ্চার করেছে এবং 'চৈতালি' ও 'কল্পনা'-য় সে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'খেয়া'-র ঐ রহস্যময় অনুভূতি বা ভাবতত্ত্ব আরো স্পষ্ট ও গভীরতর হয়ে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে পূর্ণতার রূপ গ্রহণ করেছে। কবি-মানসের ঐ অধ্যাত্ম গভীর রস অথবা তত্ত্বানুভূতি ক্রমশঃ তাঁর "সমগ্র কাব্যচেতনার অংশ হইয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবনদেবতা শুধু তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী-মাত্র হইয়া থাকেন নাই, তিনি কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়া, এক চিন্তাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র

১। 'আজি এ' প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখির গান !
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ' ।—প্রভৃতি
—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

জীবন, সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে রূপদান করিতেছে"।[১] এর নিদর্শন আমরা চৈতালীর 'খেয়া' কবিতায় পাই—

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।

*　　*　　*

শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

জীবন-নদীর দুই তীরের একদিকে বেদনাহত কবি ও অন্যদিকে সর্ববেদনার অতিক্রান্ত জীবনদেবতা। দু'জনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন মুখোমুখী হোয়ে মিলনের আশায়, কিন্তু তখনও উভয়ের মিলন হয়নি। আবার 'খেয়া'-কাব্যের 'শেষ-খেয়া' কবিতায় পাই স্পষ্টতর এর রূপ—

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর-পানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।

*　　*　　*

দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্‌ল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ-খেয়ায়।

এখানে 'কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে' শুধু নয়, ঘরের যারা যাবার তারা গেছে ঘরে ও পারে যারা যাবার তারা গেছে পারে, কিন্তু নদীর

১। 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১), পৃঃ ৯৯

মাঝখানে যেজন দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায়, তাকে ডাকে জীবনদেবতা পারে ওঠার জন্যে – মিলন দেবার জন্যে। এখানে কবি চৈতালির খেয়াপথ থেকে অনেক দূর অগ্রসর তাঁর জীবনদেবতার দিকে ; চাওয়া-চাওয়ির সীমাও অনেক নিকটে.। কিন্তু গীতিমাল্যে কবি যেন আরো অতি-নিকটে এবং হৃদয় বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হোলেও অনেক আশ্বস্ত ও আত্মনির্ভরশীল। গীতিমাল্যের গানে পাই—

নাম-হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

*   *   *

জানি যেন সকল জানি
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

এখানে বিচ্ছেদের ব্যবধান অত্যন্ত কম। এখানে কবি জীবনদেবতার অঙ্গের অপূর্ব স্পর্শ-হাওয়া অনুভব করছেন—'অপূর্ব তার গায়ের গাওয়া', সুতরাং মিলনের আর দেরী নাই। তবে গীতিমাল্যের কোন কোন গানে কবি-হৃদয়ের হতাশ-বেদনার যে প্রকাশ নাই—তা নয়, যেমন 'তীরে বসে যায় যে বেলা' এবং 'ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি'। তবে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে ও বিশেষ ক'রে গীতালিতে কবির চাওয়া যেন পাওয়ায় পর্যবসিত, হতাশ হোলেও মিলনের আশায় কবি-মন আনন্দ-স্নিগ্ধ, কেননা জীবনদেবতার চরণে কবির তখন উৎসর্গীকৃত জীবন! কবির সততই প্রার্থনা জীবনদেবতার কাছে তাঁর জীবনগতিকে ফেরানোর জন্যে—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়োনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায়
রেখো না বসায়ে!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ 'জীবনদেবতা'-র এক সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন অপরূপভাবে। 'আত্মপরিচয়'-কে তাই তাঁর জীবনদর্শন ও জীবন-

বোধের পূর্ব-পরিচিতিও বলা চলে। কবিতা-লেখা কিংবা গান-লেখার পিছনে যে অদৃশ্য হস্তের তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত ও প্রেরণা পেয়েছেন এবং সেই ইঙ্গিত ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁর জীবনদেবতাই একথা কবি বার বার স্বীকার করেছেন। 'আত্মপরিচয়'-এর সূচনায় তিনি লিখেছেন: "কাব্যরচনা-সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। * * আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ' সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান"। কবি এই একটি অবিচ্ছিন্ন সর্বানুস্যূত তাৎপর্য-সম্পর্কে দীর্ঘকাল পরে লিখেছিলেন,

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবির অন্তরমাঝে অধিষ্ঠিত প্রাণপুরুষই 'জীবনদেবতা'। কবি সেই দেবতার অদৃশ্য অলৌকিক হস্ত-সঞ্চালনের কথায় পুনরায় লিখেছেন,

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা-আনন্দে ছুটে চলে যায়

নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

কবি বলেছেন: "শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। * * কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন"। কিন্তু সেই কৌতুকময়ীই আবার কবিকে অদৃশ্যভাবে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন—

একী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে বলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?

* * *

চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই যে তাঁর জীবন-পথের অদৃশ্য চালক, তিনি বিশ্বকবি, বিশ্বের চিরন্তন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর নিত্য-নূতন যোগ। পুনরায় 'আত্মপরিচয়'-এ তাই লিখেছেন: "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্য

দান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন —সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে"। রবীন্দ্রনাথ একথাই আবার কাব্যের মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

* * *

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

এই যে কবির জীবন-পথের দিশারী অনন্তকালের চির-পুরাতন যাত্রী, ইনিই জীবনদেবতা। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিতেও কবি এই দেবতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,

১। 'জীবনদেবতা' কবিতা 'গীতিমাল্য' আলোচনায় উদ্ধৃত করেছি।

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হেথায়—চলেছি কিসের অম্বেষণে ?

* * *

'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাবনা নীরব হাসি।

কিংবা—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?

এই কৌতুকময়ী সুন্দরী মধুরহাসিনী বিদেশিনী অন্তরতম বিশ্বপ্রকৃতিই কবির বিশ্বজীবন 'জীবনদেবতা'। এই জীবনদেবতাই কবির অন্তর্নিহিত সৃজন-শক্তিরূপে সকল কাব্য, গান প্রভৃতির রূপদান করেছেন। এই সৃজনশক্তিকে কবি কখনো কখনো বলেছেন—'একটা নিগুঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্ত-রিন্দ্রিয়'। এই নিগুঢ় চেতনাই কবিকে 'রূপারূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে', এবং এর মধ্য দিয়াই কবি বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেছেন নিত্যনূতনভাবে সকল সময়। কবি বলেছেন, এই 'রহস্যময়ী' দেবতাঁর গোপন-ইঙ্গিতেই তাঁর সমগ্র জীবনছন্দের গতি হয়েছে নিয়ন্ত্রিত এবং অতীন্দ্রিয় জীবনবোধ হয়েছে সার্থক। কবি পরিণত বয়সেও আপনার এই জীবনমর্মের নিগুঢ় পরিচয় দিয়েছেন এই কবিতাটিতে—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে যোগ দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ আপনি ফিরে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া.
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

প্রলয়-সৃজনে না জানি একার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

সীমার মাঝে অসীম, রূপের মাঝে অরূপের দিব্যরূপই তাই কবির 'জীবন-জীবতা'। বিশ্বের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সকল বোধকে নিয়ে বিশ্ববোধ-রূপ জীবনদেবতার সঙ্গে পরমমিলনই কবির 'মুক্তি'। এ' মুক্তির রূপ অন্তরে ও বাহিরে সমগ্রভাবে ও অখণ্ডরূপে বিরাজিত। কবি একদিকে এই মুক্তির রূপ ও অন্যদিকে জীবনদেবতার রূপের পরিচয় দিয়ে পুনরায় বলেছেন,

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ ঘুমঘোর ?

* * *

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

নবীন জীবনডোরে চিরপুরাতন যখন কবিকে আপনার ক'রে বাঁধেন তখনই তা কবির 'মুক্তি'। কবি এ-প্রসঙ্গে 'আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন: "নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কালমহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম"। এরই জন্যে কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—

অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। * *
* * *

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

কবি 'প্রকৃতির পরিশোধ'-এ, 'মালিনী'-নাট্যে ও অন্যান্য কাব্যে ও গানে এই তত্ত্বের আভাস দিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়ও কবি একথার ইঙ্গিত দিয়েছেন বারবার। তিনি বলেছেন—'সংসার জীবনময়, নাহি হেথা মরণের স্থান'। মৃত্যুও মুক্তির রূপ, কেননা এই মৃত্যুই পুরাতনের মাঝে আনে নূতনের পরিবেশ। তাছাড়া মৃত্যুতে শোকই বা কি! কবি বলেছেন—'মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর। সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর'। একটি জীবনখেলা নয়, অনন্তের পথে অনন্ত ও অসংখ্য জীবনখেলার অভিনয়। সুতরাং ক্ষণিক মৃত্যুতে শোক কি বা ভয় কি!

কবি বিশ্ব-ভুবনের কবি, বিশ্ব-প্রকৃতির কবি। কেননা কবি বলেছেন, এই বিশ্ব-ভুবনই সসীম ও অসীম দ্বৈতখেলার লীলাভূমি। বিশ্বরস-আস্বাদনের ক্ষেত্রেই তো বিশ্বভূমি। বিষাদ ও আনন্দঘেরা এই সংসার। তিনি বলেছেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। তারি জন্যে কবি বিশ্বের সঙ্গে কোনদিন কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করেন নি। তিনি 'আত্মপরিচয়'-এ এ'প্রসঙ্গে বলেছেন: "আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই। * * আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ"। তিনি পুনরায় বলেছেন: "প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না,

সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। * * জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তি-রসের আস্বাদন"।

'জীবনস্মৃতি'-তেও রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলেছেন : "'এখানে কত ভাঙা-গড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন'। ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখ-আনন্দের রহস্যময় দ্বৈতলীলাস্রোতেই যথার্থ জীবনরসের আস্বাদ পাওয়া যায়"। কবির 'কড়ি ও কোমল' কবিতাগুলিতে কবি-জীবনের এই রহস্যময় খেলার ইঙ্গিত রয়েছে। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেন : "মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা-রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলির মর্মকথা"।

'কড়ি ও কোমল'-এর অতৃপ্ত মিলন-আকাঙ্খাই বিচিত্র স্তর অতিক্রম ক'রে বিষাদভারাক্রান্ত 'খেয়া'-কবিতায় পরিণতি লাভ করেছে এবং পরে 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' গানে এবং পরিশেষে গীতালি'-তে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "আধ্যাত্মিক রস-বোধের প্রকাশ কবির যে যে কাব্যে হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যে কবিত্ব হিসাবে 'খেয়া'-কাব্য শ্রেষ্ঠ। * * 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালী', 'গান', 'নৈবেদ্য' তত্ত্ব, কিন্তু 'খেয়া' কবিতা এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা। ইহার মধ্যেই কবির গূঢ়বাদ বা মিষ্টিসিজিম্ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল"।[১] ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : "নিসর্গ-চৈতন্য, আধ্যাত্মিক আকূতি এবং মিষ্টিক অনুভূতির এই মিলন, ইহা আরম্ভ হইল এই 'খেয়া'-গ্রন্থ হইতে"।[২] রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যও এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "খেয়া'-র কবিতায় বিদায়ের সুরই একমাত্র উপজীব্য নয়,

১। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, ১৯৩৯), পৃ০৬৩-৬৪

২। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃ০১৪৮

নবতর জীবনের আভাসও আছে"।৩ অনেকের মতে, 'খেয়া'-র একান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনই গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতার তটভূমি, কিন্তু অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মতে—'খেয়া' "অতিদূর 'বলাকা'-পর্বের উপকূল" এবং "'গীতাঞ্জলি'-পর্ব 'আধ্যাত্মিক গোধূলির রহস্য-সুদূর একটি দ্বীপখণ্ড মাত্র"। অবশ্য বিভিন্ন রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ ও বিচারশৈলী কিছু কিছু ভিন্ন হোলেও 'গীতাঞ্জলি'-র সঙ্গে সঙ্গে 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' যে ভগবদ্ভক্তির কাব্য ও কবির জীবনচিন্তার প্রশান্ত-গম্ভীর একটি ধারা একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা'-র আলোচনাপ্রসঙ্গে কবির রচিত 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'-তে নিবদ্ধ গানের ভাবতত্ত্বের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে কিছু অন্যান্য গানে নিহিত দার্শনিক ভাবেরও দেব পরিচয়। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির অধিকাংশ গানের মধ্যে কবির অধ্যাত্ম-জীবনচিন্তাধারার পরিচয় দেবার পূর্বে তাই ঐ গীতিগ্রন্থ-তিনটির পিছনে কবির গভীর মননশীলতা ও সাধনধারার কিছুটা পরিচয় দেওয়া সমীচীন মনে করি।

গীতাঞ্জলির উদ্বোধনপর্বে স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কাব্যপরিক্রমা'-গ্রন্থে গীতাঞ্জলির গীতি-রচনার মধ্যে মোটামুটি তিনটি সাধনস্তরের আভাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

১। "সংসারের দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা তাঁহার (কবির) 'দূতী'; তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে, তখন এই দুঃখ-আঘাতেই তো তাঁহার স্পর্শ তিনিই আমাদের জাগাইয়া দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন,—'আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে"। এই ব্যথার গানই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

২। 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'। অহংকারের বাঁধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে

৩। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ (২য় খণ্ড, ১৩৬৮), পৃ:৪১

মিলন হইতেই পারে না, কারণ অহংকার 'সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে আপনাকে যে বাজাতে চায়'।

৩। এ'দেশের 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে' অপমানের তলায় ভগবানের চরণ যেইখানে নামিয়াছে—সেইখানে তাঁহাকে প্রণাম না করিলে তাঁহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেইখানে তাহাদের সঙ্গে একা না হইলে 'মৃত্যুমাঝে হ'তে হবে চিতাভস্মে সবার সমান'—এই বড় যাত্রায়, সে সকল মানুষের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্মযোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করেছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ
খাট্‌ছে বারো মাস।

বাংলা গীতাঞ্জলিতে কবির সাধনার ধারার এইরূপ সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া গীতাঞ্জলিতে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার মূর্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ হৃদয়াঙ্গম করা যায়"।[৪]

ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গীতাঞ্জলির গান ও কবিতার মধ্যে মোটামুটি পাঁচটি ভাবধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সে পাঁচটি ভাবধারা হোল: (১) ভগবানকে সহজে না পাইবার জন্য হতাশ ভাব ও প্রবল বিরহ-বেদনার অনুভূতি, (২) অহংকার ত্যাগ করিয়া দুঃখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে নির্মল করিয়া ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করা ও তাঁহার দয়া প্রার্থনা করা, (৩) প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণ-স্পর্শের অনুভূতি, (৪) দীন-দরিদ্রের মধ্যে, হীন-অস্পৃশ্যদের মধ্যে পতিত-পাবন ভগবানের অবস্থান—ধরণীর ধূলায় ভূমার আসনের অনুভূতি, (৫) অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি।[৫]

গীতাঞ্জলির মতো গীতিমাল্য ও গীতালির গান এবং কবিতায়ও আমরা বিচিত্র ভাবের বিকাশ দেখি। "গীতাঞ্জলিতে কবি-হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও বিরহের কান্না গীতিমাল্যে একটা বিরহ-বেদনায় পরিবর্তিত হইয়াছে" এবং

৪। কাব্য-পরিক্রমা (১৩৪০ সাল), পৃ০ ১৩১-১৪০

৫। রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা (১৩৬৪ সাল), পৃ০ ৪৩৪-৪৩৫

"গীতালি ও পরবর্তী রচনায় এই বিরহ-ব্যথা মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই প্রিয়তমকে অনুভব করিয়াছে। চাওয়াই তাঁহার পাওয়া হইয়াছে"।[৬] মোটকথা গীতাঞ্জলির আকুল-বিরহ-ক্রন্দন গীতিমাল্যে শান্ত-মধুর বিরহ-ব্যথায় রূপান্তরিত এবং গীতিমাল্যের এই রূপান্তর গীতালিতে চরম-সার্থকতা লাভ করেছে।

ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গীতাঞ্জলির মতো গীতিমাল্য ও গীতালির মধ্যেও কবির অন্তর-ভাবধারা বা সাধনধারার কয়েকটি স্তর-বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন। গীতিমাল্যে তিনি তিনটি প্রধান ভাবধারার এবং গীতালীতেও তিনটি ভাবস্তরের উল্লেখ করেছেন। (ক) গীতিমাল্যে তিনটি ভাবধারা হোল: (১) "সংসারের নানা কর্মের মধ্যে ও প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে পরম-দয়িতের স্পর্শের ব্যাকুলতাময় অনুভূতি ও তাহার সহিত কবির প্রেম-লীলার আনন্দ-প্রকাশ; (২) সহজ ও সরল উপলব্ধির বিপুল আনন্দ-প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ; (৩) কবির ব্যক্তিগত জীবনে লীলাতত্ত্বকে অনুভব করিয়া নিজের আন্তর প্রেরণাতেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া"। (খ) পরে গীতালীতে তিনটি প্রধান ভাবস্তরের প্রকাশ যেমন (১) "ব্যথার মধ্য দিয়া ভগবানকে লাভ—বেদনার পরমদান গ্রহণ, (২) পূর্ণ-উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণ, (৩) পথিক-মনোবৃত্তির প্রকাশ ও নবতর চেতনা ও রসের অন্বেষণ"।[৭]

॥ গীতাঞ্জলির ভাবতত্ত্ব ॥

পূর্বে আলোচনা করেছি যে, 'খেয়া'-র গানে ও কবিতায় কবি-জীবনে ভাব ও রূপের জগতে দেখি এক নূতনের খেলা এবং এক নূতন জীবন। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও দেখি তখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিপক্ষে এক বিরাট জন-আন্দোলন। কবি-চিত্তকে সে আন্দোলনের প্রবাহ স্পর্শ করেছিল। তিনি ফিরে যান সে' সময়ে শান্তিনিকেতনে। ব্যথিত জনচিত্তের বেদনায় তিনি বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু সংযত ও শান্ত। শান্তিনিকেতনের নিঃসঙ্গ প্রশান্ত পরিবেশে জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতার পথে আত্মপ্রকাশ

৬। ঐ, পৃ ৪৪৭—৪৪৭

৭। ঐ, পৃ ৪৫০, ৪৬০

করলো কবির মধ্যে.তখন 'গীতাঞ্জলি-র' রচনা। 'খেয়া'-র কবি খেয়া পার হোয়ে যেন নবজন্ম লাভ করলেন 'গীতাঞ্জলি'-র কূলে। কবি-চিত্তে এলো এক নূতন রূপের স্পর্শ এবং সেই স্পর্শের রসচেতনাই উদ্বুদ্ধ করলো কবিকে 'গীতাঞ্জলি' রচনায়।[১]

'গীতাঞ্জলি' কবির জীবনের অধ্যাত্ম অনুভূতির যে ভাবোজ্জ্বল নির্যাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পাশ্চত্য কবি ও দার্শনিকদের মধ্যে, এমন কি কবি ইয়েটস্, আণ্ডার হিল্ প্রভৃতিও ভুল করেছেন কবিকে মিষ্টিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে। পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তিত mystic ও mysticism একটু ধোয়াটে, বেশ পরিচ্ছন্ন নয় এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম অনুভূতির স্বচ্ছ-বিকাশের মতো ততো সুস্পষ্ট নয়। এজন্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইংরেজী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে এর একরকম প্রতিবাদ জানিয়েছেন বল্লেও ভুল বলা হয় না। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্রাংশ হোল—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা হইব, * *।

Gitanjali-সম্বন্ধে এখানে (পাশ্চাত্যে) যতই আলোচনা করি ততই দেখি কেবল আপনাকে এরা mystic বলিয়া জানে। আমি এটা পছন্দ করি না। আদত mysticism-বোধ যদি এদের থাকিত, তাহলেও বুঝিতাম আপনার একটা দিক অন্তত এরা বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাও নহে। আর art, poetry, inspiration of life হিসাবে লোকে আপনাকে বুঝিতে শেখে ইহাই ইচ্ছা করি। আমি সেই জন্য বলি যে, আপনার poetry, drama, novels and stories-এর মধ্যে Gitanjali অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জিনিস আছে (from the point of Art as the representation of life)। সে সকলের তুলনায় Gitanjali জীবনের যে একটা রহস্যের দিক দেখাইয়াছে—অবশ্য তাহার তুলনা নাই, কিন্তু আপনাকে কেবল গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া দেখিলে আপনাকে ছোট করা হয়। আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবিদের হইতেও যিনি কাব্যে শ্রেষ্ঠতর, তাঁহাকে mystic বলিয়া literary art বা কাব্য হইতে

১। এ' সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অভিমত 'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ', ২য় খণ্ড পৃ ১৮ দ্রষ্টব্য।

সাধনের একপাশে রাখিলে অবিচার হয়, তাহা mysticism-এর নামেই হউক আর সাধনের নামেই হউক, আর Psalmist-এর সহিত একাসনে বসাইয়াই হউক। Mr. Yeats and Mrs. Underhill এ' বিষয়ে কিয়দংশ ভুল করিয়াছেন"।

পত্রটির মন্তব্য মূল্যবান। পত্রটির অংশ উদ্ধৃত হয়েছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Birth Centenary (1864-1964) কমিটি প্রকাশিত Souvenir থেকে। মোটকথা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তব্য হোল, পাশ্চাত্য মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-র মর্ম সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং পারেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য অনেক সময় প্রমাদপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ আসলে 'মিষ্টিক'-স্তরেরও অনেক উচ্চে এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তিনি অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আলোকে প্রদীপ্ত ছিলেন।

যাক, গীতাঞ্জলির বিষয়বস্তুরই করি আলোচনা পুনরায়। গীতাঞ্জলিতে গানের সংখ্যা ১৫৭টি। যদিও সবগুলি গানই গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম-ভাবসমৃদ্ধ নয়, তবুও কবির অন্তরাকুতি ও আবেগ সকল গানের মধ্যেই সুস্পষ্ট। গীতাঞ্জলির প্রথম গান হোল—'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে' প্রভৃতি। পূর্ব অধ্যায়ে এই গানপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যে, কবির যুগ-যুগান্তের যাত্রাপথের চিরপথিক ও চিরসঙ্গী ছিলেন তাঁর কৌতুকময়ী জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী। কবির যাত্রা চিরদিনই নিরুদ্দেশের পথে, কিন্তু কবি সতত্ই মিলনকামী। 'আমার মাথা নত করে দাও হে' এই প্রথম গানটিতে কবি জীবনদেবতাকে তার 'অহং'-মালিন্য মুছে পবিত্র ক'রে নিতে বলেছেন ; কেননা 'অহং'-জ্ঞান বা 'অহং'-অভিমানই মানুষকে মিথ্যা আত্মগৌরব দান ক'রে পরম-মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জীবন-সাধনার ক্ষেত্রে তাই সাধককে 'অহং'-জ্ঞান শূন্য হোতে হয়। কবি বলেছেন—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ;

এই অহংজ্ঞান বা 'অহং'-বোধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'-গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ ১৯১) যে আলোকপাত করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "এই অহংকার বা অহং-বোধের গুণে মানুষে মানুষে ভেদ, পরস্পরের রুচির ভেদ, আকাঙ্ক্ষার ভেদ। * * আবার অহংবোধ না হইলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হইলে মিলনও সম্ভবে না এবং মিলন না ঘটিলে প্রেমও হয় না"। ক্ষুদ্র অহং-বোধই 'আমি' এবং এই আমিকে যিনি পরিচালনা করেন সংসারে, 'আমি'-র ক্ষুদ্রসত্তা যাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত বা যিনি 'আমি'-র প্রতিষ্ঠা তিনিই 'তুমি'। এই 'তুমি'-ই রবীন্দ্রনাথের চির-আকাঙ্ক্ষিত 'কৌতুকময়ী' জীবনদেবতা—যিনি কবিকে সকল কাজে, সকল গানে, সকল কবিতায়, সকল রচনায় অফুরন্ত প্রেরণা দান করেন। কবি শিলাইদহ-কুমারখালি থেকে ১৩০২ সালে ৬ই চৈত্র শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে এই 'আমি' ও 'তুমি'-র এক বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন: "যিনি 'আমি'-নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে, লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর হইতে, একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইয়া অনাদিকালের ঘাট হইতে অনন্তকালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসায়—সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যস্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, 'চিত্রা'-গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে, তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশ্বরূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ-সংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি

যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, 'চিত্রা'-কাব্যে তাহারই কথা আছে * * "।[২]

কবি নিজের জীবনদেবতার পরিচয় দিয়েছেন পত্রেও। জীবনদেবতাই যখন সকল সময় কূলে-অকূলে কবিকে সকল কাজে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন নিজের ইচ্ছার কোন সার্থকতা নাই, জীবনদেবতার ইচ্ছা ও ইঙ্গিতই সার্থক ও মূল্যবান। তাই তিনি সকল দুঃখ-বেদনার মধ্যে একমাত্র আশ্রয়স্থল জীবনদেবতার কাছে আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে বলেছেন—

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে—
তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।
যাচি হে তোমার চরম-শান্তি,
পরাণে তোমার পরম-কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মমূলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'আত্মপরিচয়'-এ পুনরায় 'অহং'-বোধের ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: "অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্যেই তো মনু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিষের মতো জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভালো"। 'অহং' ক্ষুদ্র-আমি এবং এই 'আমিই' ধন-মান-যশ-ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা ক'রে পরমদেবতার মিলন লাভ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। কবি জীবন-দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাই লোভনীয় কোন সম্মানই তিনি

২। 'সঞ্চয়িতা' (১৩৬২ সাল আশ্বিন সংস্করণ), গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য

আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি চান চরম-শান্তি এবং জীবনদেবতার পরম-বিকাশ নিজের অন্তরের মধ্যে।

জীবনদেবতা কবির চিরদিনের ও যুগ-যুগান্তরের প্রিয়তম সখা। প্রতিটি জন্মেই কবির সঙ্গে হয় তাঁর পরম-মিলন, অথচ কবির নিকট তিনি চির-পুরাতন হোয়েও চির-অজানা। রহস্যময় উভয়ের মিলন, তাই বিরহ-বেদনা কবির যেন নিত্যসহচর, আর সেই বিরহ-বেদনার দহনই আবার পরমসখা জীবনদেবতার সঙ্গে আনে মিলনের আনন্দ। কবি তাই গেয়েছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।[৩]

পরমসখা অন্তর্যামীর সঙ্গে মিলন হোলে বিশ্বসংসারে আর কেউ পর থাকে না। সবাই হয় তখন আপন, কেননা বিশ্বাত্মার আনন্দস্পর্শ বিশ্ববোধেরই জাগরণ এনে দেয়। তখন মনে হয় তিনি চিরজনমের পরিচিত বন্ধু। কবি একথাই আরো স্পষ্টভাবে পরিচয় দিয়ে বসেছেন—

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

৩। গীতাঞ্জলির ৩নং গান

কবি বলেছেন, ক্ষুদ্র 'আমি'-অভিমানের জন্যেই মাঝে মাঝে ভুল হয় যে, জীবনদেবতার সঙ্গে বুঝি তাঁর মিলনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাই আবার প্রার্থনা জানান প্রেমময়ের কাছে যেন তিনি তাঁর সর্বদা চোখে চোখে থাকেন। মিলন-সুখ ও ভালোবাসার রীতিই কিন্তু তাই যে, কখনো বিচ্ছেদ-বেদনা, আবার কখনো মিলনের-আনন্দ। আলোছায়ার দ্বন্দ্বখেলার মধ্যেই তো প্রেমময়ের প্রেমের লীলা ও অফুরন্ত অবিশ্রান্ত আনন্দলীলা। গীতাঞ্জলির ছয় সংখ্যক গানটিতে এই আনন্দলীলার চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি আরও সুন্দরভাবে—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভুলোকে,
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

সত্যই প্রেমময় জীবনদেবতার আনন্দস্পর্শ যখন জীবনে আসে তখন 'অলস আঁখির আবরণ' দূর হোয়ে অমৃতময় আলোকমালায় প্লাবিত হয় সমগ্র জীবন ও মন।

কবি বলেছেন যে, আনন্দের সেই সাগর থেকে ক্রমাগতই উত্তাল তরঙ্গমালা ছুটে এসে আঘাত করছে মানুষের জীবন-তটে। তাই সকল মানা, সকল নিষেধ তুচ্ছ ক'রে গা ভাসাতে হয় সেই তরঙ্গের মাঝে। একটি জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা তো অভিশাপ। তাই জীবন-খেয়াকে অনন্ত সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে যেতে হবে নবজন্মলাভের পারে, আর গান হবে পরাণসখা জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনের। কবি তাই গেয়েছেন—

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই,
টান্ রে সবাই টান।

* * *

কোন শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে,
পালের রশি ধরব কষি
চলব গেয়ে গান।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বাণ।[৪]

গীতাঞ্জলির বারো সংখ্যক গানটিতে কবির এই বাণী আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত। কবি গেয়েছেন—

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।

গানের মর্মকথা এই যে, কবির অনন্তযাত্রার পথে সঠিক লক্ষ্যের কথা কবি নিজেও অনেক সময় জানেন না, তাই অজানা পথেই তাঁর জীবনদেবতার অঙ্গুলি-নির্দেশে যেন চলেছেন তিনি কোন এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে—'দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া'। সত্যই অনির্দেশ্যের—যুগ-যুগান্তরের পথে কবির জীবন-তরণী বাওয়া। তারপর একথাও ঠিক যে, জীবনযাত্রার পথে পুরাতনকে পিছনে ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেলেও পুরাতন দুঃখ-বেদনার ভার বহন করতেই হয়, কিন্তু কবির কাছে সেই ভার ও আঘাত মধুময় ও আনন্দময়, কেননা সেই জীবন-বেদনার ভারই তাঁকে নিয়ে যাবে তাঁর রহস্যময় জীবনদেবতার মিলনের পথে। কবি তাই গেয়েছেন—

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।[৭]

মিলনতৃপ্তির পিয়াসী হোলে দুঃখ-বেদনার আঘাত তো আসবেই। তাছাড়া জীবনদেবতা তো 'হাসি-কান্নারই ধন'। আনন্দকে পেতে গেলে দুঃখ বরণ

৪। গীতাঞ্জলির ৯নং গান।

করতেই হবে। অবিশ্রান্ত দুঃখ-আনন্দের আলো-ছায়ার ভিতর দিয়েই সেই দয়িতের সঙ্গে মিলন সম্ভব। কবি 'প্রাণ'-কবিতায় একথারই আভাস দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে—

(১) * * *
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়
মানবের সুখে দুঃখে গাহিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
(২) * * *
বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্ম মৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।[৫]

বিরহ-মিলন, দুঃখ-সুখ, জন্ম-মৃত্যুর খেলাই যুগ-যুগান্তর ধরে বিরাট বিশ্বের বুকে চলেছে। সেই খেলার সাথী হওয়াই কবির জীবনব্রত।

গীতাঞ্জলির নবম সংখ্যক গানের প্রতিধ্বনি পাই আবার পনেরো সংখ্যক গানে। যেমন কবি গেয়েছেন—'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান', তেমনি ভিন্নভাবে গেয়েছেন—'জগৎ জুড়ে উদার সুরে, আনন্দগান বাজে' প্রভৃতি। উভয় গানেই কবির পরম-আত্মনির্ভরতা এবং নির্ভয় ও বিশ্বপ্রেমের বাণী শোনা যায়। 'সে গান কবে গভীর রবে, বাজিবে হিয়ামাঝে', 'হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে', 'আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে'—এই সকল গীতি-কবিতার মধ্যেই প্রকাশ পায় কবির সুমহান বিশ্বপ্রাণতার আদর্শ।

৫। 'প্রাণ' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন : (১) প্রথম—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' প্রভৃতি, (২) দ্বিতীয় 'এ' আমার শরীরের শিরায় শিরায়' প্রভৃতি।

গীতাঞ্জলির ষোল সংখ্যক গানটিতে কবির হৃদয়-মন্দাকিনী যেন দ্রবীভূত। ভগবদ্-বিরহানল এখানে শতগুণে সহস্রগুণে প্রজ্জ্বলিত। এ' প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীনীহার রঞ্জন রায় বলেছেন: "* * গীতাঞ্জলিতে শুধু 'সাধনার কথা, বিরহের ব্যথা', শুধু ভগবত-বিরহের ক্রন্দনই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। * * বর্ষার ঝর ঝর বর্ষণ কবির হৃদয়ে বিরহ-বেদনার আঘাত দিয়ে আকুল করেছে"। কবি তাই গেয়েছেন,

মেঘের পরে মেঘ জমেছে :
আঁধার করে আসে—
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

* * *

তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

এই বাদল-দিনের গানের সমগোত্রীয় আরো অনেকগুলি গান আছে গীতাঞ্জলিতে এবং সেগুলি আকুতি-সমপর্যায়ের। যেমন সতেরো সংখ্যক গানটিতে—

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল লিখা—

ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের কথায় এখানে বলি: "ভাগবত-অনুভূতি লাভ এখনও ঘটে নাই, সেই তাঁহাকে পাওয়া এখনও হয় নাই, অথচ পাইবার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ, অধীর বিরহী চিত্ত-দুয়ার খুলিয়া সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মৃদু পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে তাঁহার সৌরভ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। অথচ তিনি আসিতেছেন না, মনোমন্দিরে আসিয়া বসিতেছেন না—ইহার বেদনা কবিকে পীড়িত করিতেছে। নানা পরিবেশের মধ্যে, নানা অবস্থায় এই বেদনার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে, * *"।[১]

বাদল-দিনের এবং রাতের গভীর অন্ধকার-পরিবেশে কবির মন উৎকণ্ঠিত। ঝরঝর জলের শব্দের মাঝে বিজুলির ক্ষণিক আভায় অন্ধকার কিছুটা উজ্জ্বল হোলেও অন্ধকার আবার নিবিড় আবরণ টেনে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। মাঝে মাঝে মেঘের ডাকে ও উতল বাতাসের শব্দে কবির চিত্ত চঞ্চল হোয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে ভরা-বাদলের ঝরঝর বারিধারা, অশান্ত পবন ও মেঘের গুরুগুরু শব্দ কবিরই বেদনাভরা বিরহের ক্রন্দন ও মিলনের আকুল আবেদন। কিন্তু কবির পরাণ-দ্বার উন্মুক্ত ও প্রেমের দীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে জীবনদেবতার আগমনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে। বরষার দিনে কবি বিরহ-বেদনার সুরে প্রিয়তমের আগমনে কিছু লক্ষ্য ক'রে রচিত গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত গানগুলি—

(১৭নং)— * * *

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ' ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি। —প্রভৃতি

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃঃ ১৬৪

(১৮নং)— আজি শ্রাবন-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। —প্রভৃতি

(১৯নং)— আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাব যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে। —প্রভৃতি

(২০নং)— আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

(২১নং)— আজ বারি ঝরে-ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড়-দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে। —প্রভৃতি

(৩৫নং)— এসো হে, এসো সজল ঘন,
বাদল-বরিষণে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ' জীবনে। —প্রভৃতি

এই সবগুলি গানে দেখা যায়, চিরপ্রিয়তম জীবনদেবতার বিরহে বেদনাহত কবি মিলন-তৃপ্তির জন্যে অধৈর্য, কাল-বিলম্ব যেন আর সহ্য হয় না—'সময় গেলে হবে না যাওয়া'। তাই 'পরাণ দিয়ে' দুটি প্রাণের মধ্যে প্রেম-মিলনের দীপ জ্বালানোর জন্যে কবির একান্ত আবেদন। জ্ঞান নয়, প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনই একমাত্র দুটি জীবনকে নিয়ে নয়, বিশ্বের সকল জীবনকে নিয়ে 'আপনার জন' বলে গ্রহণ করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, বন্ধন-মুক্তির গানই আমরা শুনি, কিন্তু কবির এই বন্ধন ও মুক্তির দ্বৈতলীলার গান আমরা সচরাচর শুনিনি। তবে একথাও আবার সত্য যে, কবির এই বন্ধনের গান প্রেমময় জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্রতর করে, কেননা এ' বন্ধন কবির দয়িতের সঙ্গে বিচ্ছেদের বন্ধন এবং এই বিচ্ছেদই আনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ। ঝড়ের রাতে অন্তরতম জীবনদেবতার অভিসার সার্থক করার জন্যেই কবির আকুল আকুতি। কেননা তিনিই তো কবির পরাণসখা বন্ধু—'পরাণসখা

বন্ধু হে আমার'। 'বুক ছাপিয়ে'-পড়া প্রেমতরঙ্গ বয়েই চিরসখার হবে আগমন কবিকে ধরা দেবার জন্যে।

চৌত্রিশ সংখ্যক 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' গানটিতে কবির অন্তরের একান্ত মিলন-আকুতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরম-দয়িত অন্তর্যামীর মধ্যেও মিলন-অভিলাষ যেন স্পষ্ট মনে হয়। পথেই দু'জন ; বিশ্বের বুকেই দু'জনের লীলাখেলা ; তবে একজন অপূর্ণ, অতৃপ্ত ও বেদনাহত, আর অন্যজন পূর্ণ, আত্মতৃপ্ত ও সর্ববেদনাবিলুপ্ত। স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী এই চিত্রটি অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'কাব্য-পরিক্রমা'-য়। তিনি লিখেছেন : "এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি স্বামী তাঁহাকেও কবি তেমনি নিশ্চল নির্বিকল্প নির্গুণ ঈশ্বর করিয়া ভাবেন নাই। লোকলোকান্তর ও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ ও পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই পথেই যিনি সকল পথের অবসান ; যিনি পরম-পরিণাম, তিনি সঙ্গীরূপে পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন। কবির জীবনে এই লীলা করিবার জন্য তিনিও বাহির হইয়াছেন। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে ?'—সে কোন্ অনাদি কাল হইতে যে তিনি বাহির হইয়াছেন তাহা কে জানে। সেই জন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে—'O world invisible, we view thee'![১] কবি গেয়েছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি
    আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
    রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে,
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
    গেছে আমায় ডেকে।

* * *

১। কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ১৩৩-১৩৪

যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ—
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে।[১]

কবির জীবনদেবতার মধুরস্নিগ্ধ মূর্তি চন্দ্র-সূর্য-তারকাদের দীপ্তিকেও ম্লান করে—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। কত শত সকাল-সাঁঝের প্রবাহে যুগ-যুগান্তরের পথে কবির যাত্রা এবং প্রতিটি যাত্রাপথে তাঁর প্রিয়সখার গোপন প্রেম-ইঙ্গিত চরণধ্বনির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আজ যেন যাত্রাশেষের সময় এসেছে এবং বাতাসে ভেসে আসছে সেই প্রিয়সখার অঙ্গ-সৌরভ, সুতরাং নিকটতম হয়েছেন কবির প্রিয়তম, মিলনের আর বিলম্ব নাই, আনন্দে উতলা হয়েছে তাই কবির দেহ-মন।

গীতাঞ্জলির সাঁইত্রিশ সংখ্যক গানে কবির 'নিশার স্বপন' ভেঙেছে, বাঁধনও শিথিল হয়েছে, বিশ্বের প্রতি প্রসারিত তাঁর প্রেমদৃষ্টি, হৃদয়-শতদলও প্রস্ফুটিত। পরাণসখা জীবনদেবতা কবির হৃদয়-দুয়ার ভেঙে দাঁড়ালেন সম্মুখে, যেন প্রভাতের সুনির্মল স্নিগ্ধ আলোকে প্রাণ পূর্ণ। কবির নয়ন-জলে সিক্ত হৃদয় নিবেদিত হোল দেবতার চরণতলে এবং নূতন জীবনের হোল সূচনা। আনন্দের জয়গান নিয়ে তাই কবি গেয়েছেন,—

নিশার স্বপন ছুটল রে এই
ছুটল রে।
টুটল বাঁধন টুটল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎপানে,
হৃদয়শতদল সকল
দলগুলি এই ফুটল রে এই
ফুটল রে।
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে

১। গীতাঞ্জলির ৩৪নং গান।

নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুটল রে।

*   *   *

ভাঙা-কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে এই
উঠল রে।

বন্ধনই তো কারাগার! কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে, কবির বন্ধন তাঁর অন্তর্যামীর বিরহ-বেদনাজাত। তাই এ' বন্ধন মাধুর্য ও মিলনের বার্তা বহন করে। কবির জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনে প্রভাত-স্নিগ্ধ মুক্তির আলোক প্লাবিত করলো কবি-চিত্তকে।

কবির এই আনন্দগান-সম্পর্কে মনে পড়ে এখানে গীতাঞ্জলির একশো কুড়ি সংখ্যক গানটি। সেখানে কবি সীমার মাঝে অসীমের জয়গান গেয়েছেন এবং বিশ্বের বর্ণে গন্ধে রূপে রসে গানে ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। অপরূপের লীলামাধুর্যে আত্মহারা হোয়ে কবি গেয়েছেন—

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

এই গানটির পরিপূরক হলো একশো একুশ সংখ্যক গানটি—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

এখানে রবীন্দ্রকাব্যের সার্থক ভাষ্যকার অজিত কুমার চক্রবর্তী আলোক-পাত ক'রে বলেছেন: "মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটিই সমস্ত জগতের খেলা, সৃষ্টির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা বলিয়া সসীম ক্রমাগতই অসীম রূপে আপনাকে ধরা দিতেছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের জীবন 'প্রতিপদেই উৎসুক, অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে', সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তাঁহারও রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি। সন্ধ্যার গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্ 'অজানার পদধ্বনি' বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতনির মধ্যে 'মেঘের জটা' উড়াইয়া কাহার অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়, প্রভাতের আলোর ধারায় কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব নব রঙীন্ বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ বেশ? প্রভাতে শুধু 'অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে' সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে একটিবার আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে চলিয়া যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা".[১]

'কত গানে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে' বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র লীলারূপ। কবির ভগবান 'বিশ্বপ্রাণ জীবনদেবতা'। নিত্য ও লীলার অভিন্ন-মূর্তি জীবনদেবতা; তাই লীলাকে বা বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে ত্রিভুবনেশ্বরের প্রেমলীলা সার্থক হয় না। কবি লীলাবাদী, লীলাপ্রেমিক তিনি। তাই লীলার জয়গান গেয়ে তিনি বলেছেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

১। কাব্য-পরিক্রমা (১৩৪০), পৃঃ ১৩৬-১৩৭

'প্রকৃতির পরিশোধ'-পর্যায়ে কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-তে এই লীলাভিসার-প্রসঙ্গে বলেছেন, :"প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই সে এই সৌন্দর্যের কাজে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্র-বেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু সেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া! এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন"। এই ভাবটিকেই শেষ বয়সে কবি 'মুক্তি' কবিতায় প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, যার উল্লেখ আমরা পূর্বেও করেছি—

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
> অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানা-বর্ণ-গন্ধ-ময়। প্রদীপের মতো
> সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
> জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
> তোমার মন্দির-মাঝে। * *
> যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

দ্বৈতলীলার তাই পিয়াসী কবি। তারি জন্যে কবি আবার বলেছেন—

> তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
> যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে

পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ।১

কবি বধূর বেশে প্রেমভিখারী বর জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনের আনন্দ-অভিসারে চলেছেন। চিরস্বয়ম্বরা; নিত্য-নূতন এই মিলন-বিবাহ। যুগ-যুগান্তের বুকে চলেছে এই অভিসার, লীলাখেলার আর শেষ নাই! কবি তাই বলেছেন—'আমায় নিয়ে মেলেছে এই খেলা'; 'আমার হিয়ায় চলেছে রসের লীলাখেলা' প্রভৃতি। বৈচিত্র্যকে নিয়েই কবির জীবনসখা জীবন-দেবতার খেলা। কবি 'শারদোৎসবে' এ' তত্ত্বের বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: "মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তাঁর জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ আছে। * * বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করে না দিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না।* * হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়"।

গীতাঞ্জলির উনচল্লিশ সংখ্যক গানটিতে কবির বিরহ ও নিরাশার ক্রন্দন আরও সুস্পষ্ট। হৃদয়ে আসন পাতা, কিন্তু জীবনদেবতা তখনো আসেন নি। এ' যেন উৎকণ্ঠিতা নায়িকার বাসকসজ্জার পরিবেশ। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায় পদধ্বনি, আশার সঞ্চার হয় এই এলো বুঝি প্রিয়তম, কিন্তু পরক্ষণেই না আসার জন্যে নিরাশা ও হৃদয়ের ক্রন্দন। বিষাদের কালনাগিনী যেন কবিকে দংশন ক'রে জর্জরিত করেছে বিষবিন্দুতে। প্রাণচঞ্চল কবি। কবি পরে বুঝেছেন নিজের ভুল কোথায়! তিনি জ্বালেন নি হৃদয়-মন্দিরে প্রেমের দীপ, ধূপও হয়নি জ্বালা দয়িতকে আরতি জানানোর জন্যে। সুতরাং হয়নি পরাণসখাকে পাওয়া, অথচ 'পাবার আশা নিয়ে' তিনি বসে আছেন। উৎকণ্ঠার ব্যাকুলতা নিয়ে কবি তাই গেয়েছেন—

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে গান গাওয়া—

১। 'গ'ন' কবিতা, ১৫ই পৌষ ১৩২০ সালে রচিত।

আজও কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।

* * *

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধরে—
রে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয়নি আমার পাওয়া।

পরের চল্লিশ সংখ্যক গানটিতে দেখি, কবির জীবনদেবতা মিলন দান করতে এসেও ফিরে যাচ্ছেন দুয়ার রুদ্ধ দেখে। কবি কিন্তু দিব্য-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন। তখনও বিশ্ব-মনের সঙ্গে কবির প্রেমের যোগ ঘটেনি বলেই এই নিস্ফলতা ও নিরাশার বেদনা—'আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে'। বিশ্ব মনের সঙ্গে কবি-মনের তখনও যোগ হয়নি বলেই তো জীবনদেবতা মিলনের পথ পাচ্ছেন না, এসেও ফিরে যাচ্ছেন।

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও।
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও—
ধুলায় একাকার।

কবির জীবনদেবতা বিশ্বজনেরও দেবতা, শুধুই তাঁর একার দেবতা নন। তাই কবি যতদিন না তাঁর নিজের মনকে বিশ্ব-মনের সঙ্গে একাকার না করতে পারছেন ততদিন তাঁর জীবনদেবতা মিলন-পিয়াসী হোয়ে আসবেন কেন!

ঠিক এই রকম হতাশা ও বেদনার আকুলতা লক্ষ্য করি আমরা গীতাঞ্জলির একষট্টি সংখ্যক গানটিতে—'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি, কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী'। কবি সেখানে বলেছেন—

এসেছিল নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

কবি সুপ্ত ; কবি-মনের সঙ্গে বিশ্ব-মনের তাই প্রেমনিবিড় সম্পর্ক তখনো ঘটে নি, সুতরাং জীবনদেবতা মিলন দিতে এলেও 'তার মালার পরশ বুকে লাগেনি'। গীতাঞ্জলির ষাট সংখ্যক গান 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' গানটিও সমার্থক। কেননা জীবনদেবতার বীণার ঝংকারে কবি জাগ্রত হোলেও তাঁর সঙ্গে কবির মিলন সম্ভব হয়নি। নিষ্ফলতার বেদনায় 'হৃদয়ভরা অশ্রুভারে' কবি ব্যাকুল—

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি—
পাইনে দেখা তার।

গীতাঞ্জলির গান তাই বারেবারে কবির অন্তর-বেদনার ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি। আশার আলোক দেখা দিলেও নিরাশার অন্ধকার আবার কবির মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। 'আলো-ছায়ার এক বিচিত্র' দোলাচল খেলা চলেছে কবির জীবনে এই গীতাঞ্জলির গানগুলির মাধ্যমে। কবি তাঁর নিরাশার কারণ অনুসন্ধান ক'রে বুঝেছেন যে, 'অহং'-অভিমানই তাঁকে জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-সুখ থেকে বারবার বঞ্চিত করছে, তাঁর ব্যক্তি-মনকে বিশ্ব-মনের সঙ্গে একাকার হবার পথে বাধা দিচ্ছে। সুতরাং অহংকার ত্যাগ করা উচিত।

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।
দিনের কাজে ধুলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি,
এমন তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহংকার।

কবি এবার জীবনদেবতার আবির্ভাবের সার্থকতাকে আর বিফল হোতে দিতে চান না। তাই তিনি স্নান ক'রে ও প্রেমের বসন পরে শুদ্ধ-শুচি হোতে চেয়েছেন। দেবতার আসার সময় হোল, সুতরাং মিলন-অভিসারের আশায় মালা গেঁথে এবার প্রস্তুতির প্রয়োজন—

এখন তো কাজ সাঙ্গ হল
দিনের অবসানে।
হল রে তাঁর আসার সময়
আশা এল প্রাণে।

এর পরবর্তী গানে কবির রঙিন আশার সার্থকতার দীপ্তি যেন আরো স্পষ্ট। এই দীপ্তি ও তৃপ্তির আনন্দেও কিন্তু অশ্রুজল-মেশানো। তবে বিরহ আজ মধুর হয়েছে জীবনদেবতার আনন্দ-স্পর্শে। কবির মন আজ বিশ্ব-মনের সঙ্গে এক হয়েছে; তাঁর মনোহরণ দেবতা আজ জলে স্থলে ফুলে ফলে সর্বত্র কবির মনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন—

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা আখির ডোর।
আজিকে এই আকাশতলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে, মনোহরণ,
ছড়ালে মন মোর।

রাঙা রাখীর ডোরই তো প্রেমের বন্ধন। জীবনদেবতার সঙ্গে আজ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন কবি। কেননা পরবর্তী 'প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত' প্রভৃতি গানটিই সে মর্মকথা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছে –

* * *

এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি, তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।

এটাই তো বিশ্ব-মনের পরিচয়। কবির জীবনদেবতা বিশ্ববৈচিত্র্যের অনু-পরমানুতে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। অথচ তিনি আবার অনন্ত অসীম। এই সীমার মাঝে অসীমের লীলাখেলাই তো অভিনব প্রেমলীলা। বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাকার হওয়ার নামই কবির জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন। এ' মিলন যেমন অদ্ভুত, তেমনি অভিনব ও মধুর। কবি একথারই আভাস দিয়েছেন গানের পরবর্তী অংশে—

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।

কবি এই মিলনেরই চিরপিয়াসী। ক্ষণিকের হোলেও এ' মিলনের জন্যেই কবির বিচ্ছেদের ক্রন্দন—

তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেক-তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি।

কবির এ' ডাকার আর শেষ নাই! যুগ-যুগান্তের যাত্রাপথে প্রেমঘন জীবনদেবতার জন্যে কবির আকুল ক্রন্দন আর আনন্দ-বেদনার গান—

'গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না-হাসি'। তাই ক্ষণিকের জন্তে বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেলেও কবির মন হয় আনন্দ-তৃপ্ত।

গীতাঞ্জলির সাতচল্লিশ সংখ্যক গানেও সেই সীমার মাঝে অসীমের লীলাখেলা। কবি বলেছেন—'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ-রতন আশা-করি'। অনন্তপথের যাত্রী কবির চিত্তে কেন জানি চলার মমতায় যেন একটু দৈন্য দেখা দিয়েছে—

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
    ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
    অমর হয়ে রব মরি।

এ' যেন কবি-জীবনে এক অভিনব ঘটনা! একি চির-আকাঙ্ক্ষিত জীবন-রতন জীবনদেবতার উপর কবির অভিমান? কিন্তু তাই বা কেন? এতে মিলন-অভিসারের সুরই তো প্রতিধ্বনিত। কবি জীবনের ঘাটে তরী ভিড়িয়েছেন বারবার। বিচ্ছেদ-বিরহের তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ-মন। এবার তাই সকল 'ঢেউ খাওয়া' শেষ ক'রে 'প্রাণের বীণা' নিয়ে যাবেন 'অতলের সভা-মাঝে'। এই অতলই তাঁর প্রাণপুরুষ জীবনদেবতা। বিশ্বের বুকে বিরহের গান তো বিচ্ছিন্ন, তার শুরু আছে, আবার শেষ আছে। কিন্তু আদি-অন্ত-হীন 'চিরদিনের' নিত্য সুরের গান ধ্বনিত হয় এক অনন্তলোকে জীবনদেবতারই সভামাঝে। কবি তাঁর অশ্রুসিক্ত শেষ গানটি 'নীরব' জীবনদেবতার পায়ে উপহার দিয়ে গানের পালা শেষ করতে চান। গান নীরব হোলে তবেই তো প্রিয়তমের সঙ্গে হবে কবির আনন্দ-মিলন।

গীতাঞ্জলির পঞ্চান্ন, ছাপান্ন, আটান্ন ও উনষাট সংখ্যক গানগুলির প্রায় এক সুরে বাঁধা। যেমন,

(৫৫)— আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করো না বিড়ম্বিত তারে।

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির-ভূবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

* * *

(৫৬)— তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নিজে—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।

* * *

(৫৮)— জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।

* * *

(৯)— এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে,
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে। —প্রভৃতি

এই সকলগুলি গানেই কবির অন্তরের নিবিড় বেদনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দর, বল্লভ ও কান্ত জীবনদেবতার আহ্বান শোনা যাচ্ছে—'তব গম্ভীর আহ্বান কারে'। কবি বিরহ-বেদনাতুর, দয়িতের পথ চেয়ে বসে আছেন তিনি, তাই মিলন-তৃপ্তিকে নিরাশ না করার জন্যে জীবনদেবতাকে কবি মিনতি জানাচ্ছেন—'কোরো না বিড়ম্বিত তারে'।

কিন্তু পরবর্তী গানে বেদনার সুর আরো গভীর হোলেও আশার আলোকে কবির প্রাণ দীপ্ত—'মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে'। জীবনবল্লভ অন্তর্যামী নিজেই এসেছেন এবার তাঁর অনন্ত-

লোকের সিংহাসন থেকে নেমে হাতে বরণমালা নিয়ে—'হাতে লয়ে বরণ-মালা, এলে তুমি নেমে'। এর পরের গানেও (সাতান্ন সংখ্যক) মিলনের আকুতি প্রকাশ পাচ্ছে—

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।

শুধু হৃদয় কেড়ে নেওয়াই নয়, 'তারে আগুন দিয়ে দহো'। সমস্ত দৈন্য, গ্লানি, বিষাদ ও বিরহ-বেদনা দূর ক'রে মিলন-তৃপ্তি দেবার জন্যে কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর 'কৌতুকময়ী' জীবনদেবতার কাছে। কর্মকোলাহলময় বিশ্বের বুকে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেও কবির দেবতা 'নীরব' ও শান্ত—পবিত্র ও অনিদ্র। বাসনার বিপুল ধুলায় আচ্ছন্ন কবির মন, তাই তাকে ধৌত ক'রে চিরপবিত্র তাঁর দেবতাকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি নিজের হৃদয়-সিংহাসনে।

কবির বাষট্টি সংখ্যক গানটি যেন শান্তি ও সান্ত্বনার গান। কবি বলেছেন, যুগে যুগে পলে পলে দিবা-রাত্র তাঁর জীবনদেবতার জয়গানেই অতিবাহিত হয়েছে জন্ম-জন্মান্তর। কত গান হয়েছে গাওয়া, কত দুঃখ-বেদনার অশ্রু হয়েছে ঢালা। তাই জীবনদেবতা আজ প্রসন্ন হোয়ে আসছেন কবিকে মিলন-আনন্দ দেবার জন্যে। দুঃখের পর সুখের দিন আসে, বেদনার পর আনন্দের দিন আসে, আর তখনই পরশমণি জীবন-দেবতার হয় পুণ্য আবির্ভাব! তারি জন্যে কবি গেয়েছেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

* * *

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে,।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

দুখের পরে পরম-দুখে
তারই চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয়
পরমমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

এ' প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমার ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধের কথা।[১] তিনি শারদোৎসবে উপনন্দের দুঃখ-সাধনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: "ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করেছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। * * আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়"। সুতরাং দুঃখের বা মৃত্যুর রূপকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে মধুরতম প্রিয়তম বন্ধু বলেই অনুভব করেছিলেন।

কবি যে নিত্য-নূতনের পূজারী ও নূতনের পথচারী সেকথা চৌষট্টি সংখ্যক গানটিতে তিনি প্রকাশ করেছেন—'একটি একটি করে তোমার, পুরাণো তার খোলো, সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো'; 'এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র, সেই কথাটি ভালো'। এই কথাগুলিতে জীবনদেবতার কাছে কবির আত্মনিবেদনের ভাব সুস্পষ্ট। অনন্তের পথযাত্রী কবি এবং অনন্তের পথে গীন তাঁর অনন্তচারী জীবনদেবতার জয়গানেই সার্থক—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কবির মর্মকথা অনেক সময় কবিও ধরতে-ছুঁতে পারতেন না, অথচ অজানা এক ইঙ্গিতে—অজ্ঞাত এক প্রেরণায় তিনি চালিত হতেন অনন্তযাত্রার পথে। কবি একথা স্বীকারও করেছেন—

ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,

১। ১৩২৪ সালে পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'-পত্রিকায় প্রকাশিত।

তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কবি যে দুঃখ-বেদনার কবি এবং তাঁর দয়িতের জন্যে উপহারও যে বেদনার সেকথা কবি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কবির 'পূজা-গৌরব পুণ্য-বিভব' কিছুই নাই, বরং 'লজ্জার দীন বেশ', তাই তাঁর অভিসার-উৎসবে আড়ম্বর নাই। 'বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই কেহ', তাই কেবলি অশ্রুজল সম্বল, আর বেদনার উপহারে জীবনদেবতার সেবা—'কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা-মন্দির-দ্বারে'। কবি তবুও কিন্তু আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন তাঁর দেবতার আগমন-প্রতীক্ষায়, যদিও বারেবারে সে দীপ নিবে গেছে। তবে কবি জানেন—'হবে হবে প্রভাত হবে, আঁধার যাবে কেটে'।

গীতাঞ্জলির চুয়াত্তর সংখ্যক গানে রুদ্রমূর্তির সঙ্গে প্রসন্নতাকে, অশান্তির সঙ্গে শান্তিকে মিলনসূত্রে গ্রথিত করেছেন কবি। তিনি তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' কথাই চরমকথা। "রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম-পরিচয় হত তা'হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্,'—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরমসত্য এবং পরমসত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই সংসারের সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছুতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়েই যেতে হবে; রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে তো নিরর্থক ও মিথ্যা!" কবি তাই গেয়েছেন—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কাণ।
ভুলব না আর সহজেতে
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে,
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সেই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও হে মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্।

গীতাঞ্জলির সকল গান নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও অধ্যাত্ম-সাধনা সত্যই অপরূপ ও অভিনব। এ'প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "আমি পূর্বেই বলেছি, 'গীতাঞ্জলি'-র গানগুলিতে সাধনার বেদনা, ব্যর্থতা ও বিরহের ক্রন্দনের সংবাদই বেশী পাওয়া যায়, অথচ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত ফলটির সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধনার বৈচিত্র্যকে আমাদের দেশ স্বীকার করিয়াছে বটে, এবং বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ কোলাহলও কম করে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়াছে পরিণত ফলটির দিকে, এবং তাহার মাপকাঠিতেই সাধন-পন্থার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে। যে-জীবনে ভাগবতোপলব্ধি আসিয়াছে, সেই জীবনের রস ও আনন্দ-হিল্লোলই আমাদের দেশের অধ্যাত্ম-চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে, এবং অধ্যাত্ম-জীবনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছে, এই রস ও আনন্দ-হিল্লোলই মুখ্য, সাধনপন্থা গৌণ, সে পন্থার ব্যথা এবং বেদনাও গৌণ। এই হিসাবে ভারতীয় চিত্তে 'গীতাঞ্জলি' খুব বৃহৎ মূল্য বহন করে না"।[১]

উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-সাধনায় ভগবানকে খোঁজার শেষে আছে, পরম-শান্তিতে সেখানে সাধনার সমাপ্তি আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনায় তাঁর চরম ও পরম বস্তু জীবনদেবতাকে খোঁজার আর অন্ত নাই। নিত্য-নূতন সেই খোঁজা, নিত্য-নূতন সেই খোঁজার ব্যাকুল-বেদনা ও

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃঃ ১৬২-১৬৩ এবং স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কাব্য-পরিক্রমা' ২য় সংস্করণ), পৃঃ ১৪২-১৪৩

আনন্দ। এ' যেন নিত্য-নূতন গন্ধ রূপ রস ও আনন্দের মেলা। কবি নিজেই সে সাধনার মর্মকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবনলোকে।
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে।
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ডোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

পুনরায় ডক্টর রায়ের ভাষায় এর তুলনা দিয়ে বলি: "নিত্য নূতন করিয়া নূতন সৃষ্টির মধ্যে বিহারই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ধর্ম, কিন্তু কোন নূতন সৃষ্টিই ততক্ষণ তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই যতক্ষণ না তিনি তাহার সমস্ত সম্ভাবনা পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন"। কবি এই নূতন বিশ্বজীবন ও বিশ্ববোধের স্পর্শানুভূতি লাভ করেছেন বিশ্বের সঙ্গেই যোগসাধন ক'রে। বিশ্বচরাচরের প্রাণকেন্দ্র যেখানে নিত্যস্পন্দিত, সুখ-দুঃখ-বেদনা-আনন্দের যেখানে নিত্যমেলা, সেই ধূলির ধরণীতলেই কবির আনন্দ-মিলন তাঁর জীবনদেবতার সঙ্গে। কবির গানও সেই মর্মই প্রকাশ করে—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসার'
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

বনে নয়—বিজনে নয়, ধ্যানে নয়—বৈরাগ্যে নয়, 'সবহারাদের মাঝে' 'সবার পিছে—সব্বার নীচে' বিশ্বচরাচরকে নিয়েই বিশ্বজীবন অন্তর্যামীর সঙ্গে কবির আনন্দখেলা ও প্রেমলীলা। জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত-প্রবাহে নিত্য-নূতন জ্ঞান-অভিজ্ঞতার ফল-ফুলে কবির জীবন আজ পূর্ণ এবং সেই পূর্ণপাত্রেরই অর্ঘ্য দেবেন কবি তাঁর পথের চিরসাথী জীবনদেবতাকে। কবি তাই গেয়েছেন—

কত শরৎ-বসন্ত-রাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে—
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।

কবির বিশ্ববোধের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের হয়েছে মিলন। তাই তিনি ***Religion of Man***-গ্রন্থে 'spiritual union-সম্পর্কে উপনিষদের মন্ত্র গান ক'রে বলেছেন—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিশতঃ' এবং 'য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি'। এ'প্রসঙ্গে কবি নিজের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত ক'রে ***Religion of Man***-য়েই বলেছেন: "Our union with a Being, whose activity is world-wide and who dwells in the heart of humanity, cannot be a passive one. In order to be united with Him we have to divest our work of selfishness and become *Visvakarmā*, 'the World-Worker', we must work for all. When I use the words 'for all', I do not mean for a countless number of individuals. All work that is good, however small in extent, is universal in character. Such work makes for a realization of *Visvakaramā*, 'the World Worker' who work far all. In order to be one with this Mahātmā, 'the Great Soul,' one must cultivate the greatness of soul which indentifies itself with the soul of all peoples and not merely with that of one's own".[1]

১। (ক) Cf. *Religion of Man* (3rd impression 1949), p. 69; (খ) শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্র-দর্শন' (২য় সংস্করণ, ১৩৬৩), পৃ· ৭৯ দ্রষ্টব্য।

কবির এই বিশ্বকর্মা-জীবনের বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন মেলে নিম্নলিখিত গানগুলিতে—

(১১৮)—উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী-রথে
ঐ যে তিনি, ঐ-যে বাহির-পথে
আয়রে ছুটে টানতে হবে রশি—
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনোমতে।

* * *

আকাঙ্খা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে।

(১১৯)—ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে।
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরই মতন শুচি-বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার প'রে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

ধূলির সৃষ্টিকে অবহেলা ক'রে স্রষ্টার সন্ধানে দেবালয়ে কিংবা গভীর অরণ্যে তপস্যায় ধ্যানমগ্ন থাকা কবির ধর্ম নয়; সৃষ্টির মধ্যে অগণিত নরনারীর সুখ-দুঃখের সমভাগী হোয়ে বিশ্বের কল্যাণে আত্মদান করাই কবির ধর্ম ও জীবনব্রত। কবির ভগবান 'কৌতুকময়ী' জীবনদেবতাও নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সর্ব-মানুষের অন্তরে ও বিশ্বের অণু-পরমাণুতে। মুক্তি তাই দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-বন্ধনের মধ্যেই—'মুক্তি কোথায় আছে। আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধা সবার কাছে'। কবির সাধনাও নব-জন্মলাভের জন্যে—'চলে যাব নব-জীবনলোকে, নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে'। পুরাতন জীর্ণ জীবনকে পিছে ফেলে নব-জীবনোচ্ছাসের আনন্দ লাভই কবির কাম্য—'পরব তব নবমিলন-ডোর'। কবির বিশ্বজীবনরূপ জীবনদেবতারও তাই অনন্তের পথে নিত্য-নূতন লীলা—'বারে বারে নূতন লীলা তাই'। কবির মিলন-অভিসারেরও তাই শেষ নাই—'তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর'। সুতরাং প্রতিটি নিরুদ্দেশের যাত্রাপথেই কবির প্রাণে নূতন বিরহ-বেদনার জাগরণ ও নূতন মিলন-আনন্দের শিহরণ দেখা যায়—

মনে করি এইখানে শেষ—
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন ক'রে হৃদয় জাগে,

সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই যে উদ্দেশ।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এ'এক অপূর্ব মুক্তির আনন্দরস-সম্ভোগের নিদর্শন। বারবার জীবনদেবতার সভা থেকে আদেশ আসে বলে কবি জীবন-মরণকে একই জীবনপ্রবাহের অবস্থান্তর বলেছেন। মৃত্যু জীবনের পূর্ণতা লাভেরই সোপান। কবি তাই গেয়েছেন—

শেষের মধ্যে অশেষ আছে
এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।
সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু—
নীরবতায় বাজছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

এ'গানটিতে আলোকপাত ক'রে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবি-রশ্মি'-তে বলেছেন: "এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্ত থাকিয়া যায়, মরণের পরে যে অনন্ত জীবন আসে, সেখানে সকল অভাবের সম্পূরণ হয়। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ গ্লানি ও অসম্পূর্ণতা মরণের পুতধারায় ধৌত হইয়া যায়,—তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ!"

॥ গীতিমাল্যে দর্শনতত্ত্ব ॥

গীতিমাল্যে কবি-জীবনের অনুভূতি গীতাঞ্জলি অপেক্ষা আরো কিছু গভীর ও আরো কিছু নিবিড়। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ'প্রসঙ্গে বলেছেন: "গীতাঞ্জলিতে কবি-হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও বিরহের কান্না গীতিমাল্যে একটা মধুর বিরহ বেদনায় পরিবর্তিত হইয়া নিরাশা ও দুঃখের তীব্র অনুভূতি কমিয়া গিয়াছে; চোখের জলের মধ্য দিয়া একটা দূর-সান্ত্বনার তটভূমি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে"।[১]

১। রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ৪৪৭

গীতাঞ্জলিতেও দেখেছি যে, কবির জীবনসাধনা অনন্তের পথে ব্যথা-বেদনারই সাধনা। কিন্তু কেন এই ব্যথা-বিরহের বেদনা? কবির অন্তরের বেদনা যেন তাঁর অন্তর্যামী জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-প্রতীক্ষারই বেদনা। এই বেদনার নিদর্শন পাই আমরা উপনিষদের ঋষি ও বৈষ্ণব-সাধকদের ভিতরও। কিন্তু এখানে কবির হৃদয়-বেদনা ও বিরহ-ব্যাকুলতার মধ্যে পাই এক অভিনবত্বের পরিচয়। পরমস্থিতিরূপ অমৃত-প্রতিষ্ঠার পূর্ণ রূপ আছে, উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ-সাধনায় চরমপ্রাপ্তি এবং বৈষ্ণব-সাধকদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতত্ত্বের সাধনায়ও পরম ও চরম আস্বাদন আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার চরম ও পরম তত্ত্বে যেন বিরাম নাই, বরং আছে তাঁর পরমরহস্যময় জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন-অভিসারের উদ্দেশ্যে যুগ-যুগান্তরের অনির্দ্দেশ্য গতি ও গান গেয়ে পথ চলা। এ' প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের সুচিন্তিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "গীতাঞ্জলির অনেক গানে বিরহের সুগভীর ব্যথা ও বেদনা, 'গীতিমাল্য'-এর কোন কোন গানে মিলন ও বিরহের আনন্দ খুব স্পষ্ট; বৈষ্ণব-পদকর্তাদের ভাবজগৎ, কল্পনার জগৎ 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র অনেক গানেই ছায়াপাত করিয়াছে, তবু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, মূর্তিসাপেক্ষ যে-প্রেম বৈষ্ণব-পদাবলীতে মান, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ঠিক সেই প্রেমই রবীন্দ্র-কবি-মানসের উপজীব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম রহস্যময়, তাঁহার দেবতাও রহস্যময়, নব নব বিচিত্র তাহার রূপ, গভীর বিচিত্র রহস্যের মধ্যে কোথায় কখন যে তাঁহার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে ধরা দেয় তাহা কবি নিজেও ভাল করিয়া জানেন না"।[২]

কথাও তাই। বৈষ্ণব-সাধকদের বিরহ-বেদনার সাধনার উদ্দেশ্য অনাস্বাদিত প্রেমস্বরূপ পরম-পুরুষ-প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও পুণ্যস্পর্শ লাভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আনন্দরসময় সাধনা নিত্য-নূতন চির-অতৃপ্ত অথচ দুর্জ্ঞেয় মিলন-তৃপ্তির সাধনা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান অনেক। রবীন্দ্রসাহিত্য-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অভিমত উদ্ধৃত করা এ' প্রসঙ্গে সমীচীন মনে করি। তিনি বলেছেন: "অনেকের বিশ্বাস,

২। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪১), পৃ° ১৬১

গীতাঞ্জলির গান বৈষ্ণব-কবিতার নিছক প্রভাবমূলক। বৈষ্ণব-কবিদের প্রভাব গীতাঞ্জলিতে আছে, যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যত্র। কাজেই ইহা গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য নয়। * * রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন বিচিত্র; তাহার অনেকগুলি স্তর আছে : উপনিষদের স্তর, প্রাকৃতিক অনুরাগের স্তর, দেশপ্রাণতার স্তর, আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের স্তর, বৈষ্ণব-ভাবের অর্থাৎ সে স্তরে মানবপ্রেমের সহিত ভগবৎপ্রেম মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই বৈষ্ণব স্তরও ইহার অন্যতম। গীতাঞ্জলিপর্বের গান এই সমস্ত স্তরের ভিতর দিয়া নির্যাসিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে—বৈষ্ণব-কবিদের একস্থর মনে এমন বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতে পারিত না। বৈষ্ণব-পদের যে বিচিত্রতা তাহা প্রেমের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগের ভাববৈচিত্র্যে গঠিত। বৈষ্ণব-কবিরা জীবনের একটি ভাগকেই অসংখ্যভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালে জীবন যখন অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত, কবির অল্পবিস্তর বহুমুখী না হইয়া উপায় নাই। এ দোষ বা গুণ কোনো কবি-সম্প্রদায়ের নয়—অতীত ও বর্তমানের। এই বহুমুখীতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিদের হইতে পৃথক। কবির জীবনে যে স্তরগুলির কথা বলিলাম, সব স্তরের নির্যাস গীতাঞ্জলির পর্বের গানে আছে। এমন গানও আছে (গীতিমাল্য, ৯৯), আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষায় ক্রমবিকাশবাদ না জানিলে, কোনো মহাকবির পক্ষেও লেখা যাহা অসম্ভব হইত"।[৩]

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার বস্তু উপনিষদের 'গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং' আত্মচৈতন্য কিংবা বৈষ্ণবদর্শনের লীলাময় বিশ্বরূপ ভগবান নন, তিনি জীবনকুঞ্জের অভিসার-নিশার পরমরহস্যময় নায়ক 'জীবনদেবতা'। কবি তাঁর এই রহস্যময় দেবতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পাড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত-দ্রাক্ষাসম।

৩। (ক) রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ (১ম খণ্ড. ১২৬৮) পৃ° ২১—২৩
(খ) ডক্টর শ্রীনিহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ° ১৬২
(গ) স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী : কাব্য-পরিক্রমা (২য় সঃ), পৃ° ১৫০-১৫১

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বরণ বাসরশয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য-নব।

* * *

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা আজিকে হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিরহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।

কবির জীবনদেবতা তাই অন্তরতম, জীবননাথ, বঁধু, প্রাণেশ ও অন্তর্যামী বিশ্বজীবন-পুরুষ।

গীতিমাল্যের 'পথে চাওয়া' কবিতায় কবি পথ-চাওয়াতে ও পথে-চলাকেই জীবনেব পরম-সুখ ও পরম-আনন্দ বলে বর্ণনা করেছেন। এই পথের পথিক তাঁর নিত্য-চলার সাথী জীবনদেবতাও। কবি বলেছেন—

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর দিয়ে—
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ।

রৌদ্র-ছায়া ও বর্ষা-বসন্তই তো প্রকৃতির অপার্থিব দ্বৈতলীলা। এই লীলার মধ্যে থাকে রূপ-রস-গন্ধভরা বৈচিত্র্যের খেলা। কবি আপন অন্তরের দুয়ার খুলে জীবনদেবতার প্রতীক্ষায় বসে আছেন একা, মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে

হাসেন ও গান করেন শুভক্ষণের অপেক্ষায়। দেবতার দিব্য-তনুগন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে, সুতরাং কবি ভাবেন আর বুঝি দেরী নাই প্রিয়সখার আগমনের। দয়িতের প্রতীক্ষায় এই চাওয়াতেই আনন্দ, চরম-পাওয়াতে নয়। কবি তারি জন্যে গেয়েছেন—

সারা দিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,
ততক্ষণ রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ॥

গীতিমাল্যের 'ভাসান' গানটিতে কবির মিলন-চেতনা যেন আরো মুখর হোয়ে উঠেছে। কবি নদীর তীরে বসে তরী ভাসানোর জন্যে আকুল অন্তর। সন্দেহ-দুঃখ-হতাশার বাতাসে তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ। শূন্য মন। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসে বাঁশীর সুরে প্রিয়তম জীবনদেবতার ডাক, শিহরি ওঠেন কবি, বেলা গেল, ভাবেন এখনো দেবতার সঙ্গে মিলন হলো না। তীব্র-ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন কবির দেহ-মন। কবি আকুল-চিত্তে তাই গেয়েছেন—

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল-ফোটোনো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি?

*　　　*　　　*

শূন্যমনে কোথায় তাকাস? সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি।

'দিনান্ত' কবিতায়ও কবির অন্তরের মিলন-আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কাব্য সেখানে বলেছেন—

এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায়
দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা—
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা।

কবি জানেন যে, কতবারই না তাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে জীবন-তরী ভাসাতে হয়েছে ও হবে—

আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের হাটে হাটে।

এবার তাই এই জীবনেই কবি জীবনদেবতার মিলন লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন—'এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে'। বিশ্ব-প্রেমিক কবি; ভুবনতলে সবহারাদের সঙ্গেই তার ব্যবসা ও বেচা-কেনা। তিনি জানেন যে, সবার সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখলেই বিশ্বপ্রাণ জীবনদেবতার স্পর্শ লাভ করা সম্ভব হয়। তাই তিনি বলেছেন—

ব্যবসা মোর সবার সাথে,
চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করবো যতোই
বেচা-কেনা।

বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনদেবতার প্রকাশ এবং বৈচিত্র্যকে নিয়েই তিনি পূর্ণ। সুতরাং জীবনপাত্র পূর্ণ করতে হোলে বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গেই পরমসুন্দর জীবনদেবতার মিলন-তৃপ্তি কামনা করতে হয়।

গীতিমাল্যের গানে ও কবিতায় দেখা যায়, কবির পূর্ণমিলন কিন্তু হয় নি তাঁর জীবনদেবতার সঙ্গে। এ' যেন মিলন-অভিসারের প্রস্তুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার বেদনা ও ব্যাকুল-ক্রন্দনেরও শেষ নাই। যেমন দেখি—

(১)— দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাইনে তোমারে।

(২)— তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ' আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে,
* * *
নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে।

(৩)— কেন তোমরা আমায় ডাক,
আমার মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ 'দিকের' পানে
গানে গানে।

গীতিমাল্যের গানগুলিতে মিলনের আকুতি আছে, কিন্তু গভীর কোন তত্ত্বকথা নাই বা সাধনা নাই। তবে সেগুলি কবির অন্তরের সহজ সরল রসভারাক্রান্ত আবেদন। স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী এ' প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর 'কাব্য-পরিক্রমা'-য় : "* * সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবির অধ্যাত্ম-সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ-প্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে"।

গীতিমাল্যের 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি কাব্য-সৌন্দর্যে, ভাব-সম্পদে ও অধ্যাত্মভাব-ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ। এখানে কবি যেন একটু আত্মতৃপ্ত, সংশয়হীন ও আনন্দমুখর। গীতিমাল্যের 'দেহ' কবিতায় তিনি অঙ্গ তথা নিজেকে আনন্দে-গড়া যুগ-যুগান্তরের স্তন্যপানপুষ্ট ও রসধারায় মগ্ন বলে স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু ঐ' গানটিতে তিনি পরম-দয়িত সুন্দরের সঙ্গ লাভ ক'রে পরম-ধন্য, পুণ্যস্নাত ও আলোকস্নিগ্ধ! কবি গেয়েছেন—

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষুদুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর।'

কবি পরম-আকাঙ্ক্ষিত জীবনদেবতার স্পর্শ লাভ ক'রে চিরধন্য, চিত্ত অনুরাগে রঞ্জিত এবং প্রাণ মিলন-সুধায় তৃপ্ত। কবির জন্ম-জন্মান্তরের

জীবনদীপ্তি যেন আজ এই নূতন জীবনে মিশ্রিত হয়েছে। কবি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তাই গেয়েছেন—

এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে,
নবীন করে লও হে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর, জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।

পূর্বেই বলেছি যে, কবি যেন এখানে কৃতকৃতার্থ; নূতন জীবনে জীবন-দেবতাব নূতন স্পর্শ চেতনায় দীপ্ত ও শান্ত। অর্থসমৃদ্ধ ও ভাবস্নিগ্ধ এই গানকে উপলক্ষ ক'রে গীতিমাল্যের গানগুলিসম্পর্কে স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী বলেছেন: "গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভারমুক্ত ফুলের মতো নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। গীতাঞ্জলির কোন গানই এই গানগুলিব মতো এমন সুন্দর, এমন গভীব, এমন আশ্চর্য সরল নহে"।

॥ গীতালির গানতত্ত্ব ॥

গীতালিব গানগুলিব রচনা-কাল ১৩২১ সাল, গীতিমাল্যের ১৩১৫-১৩১৬ এবং ১৩১৮-১৩২১ এবং গীতাঞ্জলির ১৩১৩-১৩১৭ সাল। রবীন্দ্রসংগীতের দার্শনিক তত্ত্ব বা ভাবতত্ত্বেব মূলকথার পবিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি যে, কবির জন্ম-জন্মান্তরবাহী বেদনাময় সাধনা কখনো অতৃপ্ত, আবার কখনো বা তৃপ্ত এবং পথিকের দেবতা বিশ্বের বেদনায় বিগলিত ক্ষমাসুন্দরমূর্তি জীবনদেবতা। এই রবীন্দ্রসংগীতদর্শন তাই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত কিংবা অন্য কোন বাদ বা মতেব প্রকাশক ও পবিপোষক কিনা এ' প্রশ্ন অবান্তর, কেননা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'আত্ম-পরিচয়'-এ এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তিনি বলেছেন: "তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈত-বাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তরদেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার প্রত্যক্ষ এই, বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত-ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ' লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্‌বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের—সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে"। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দর্শনচেতনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অভিনব উপলব্ধির রূপ। কবি সে রূপের সুস্পষ্ট আভাস দিয়ে 'আত্মপরিচয়'-গ্রন্থে পুনরায় বলেছেন: "আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে-একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে-একটি নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখ-দুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখ-বেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্‌ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে"।

সুতরাং কবি 'পথের গান' গেয়েছেন চিরদিন পথ-চলার সার্থকতাকে স্বীকার ক'রে, কেননা পথে চলাতেই কবির চির-আকাঙ্ক্ষিত জীবনদেবতাকে পাওয়া—'পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া'। কবি বারবার তাই বলেছেন যে, তাঁর কাব্য, গান ও সকল রচনার পিছনে রয়েছে এক অঙ্গুলি-চালনার গোপন ইঙ্গিত ও প্রেরণা এবং সেই ইঙ্গিতের বশবর্তী হোয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাব্য, গান, নাটক প্রভৃতি। সুতরাং তাঁর নিজের বলে কোন কৃতিত্ব সে-সব সৃষ্টিতে নাই, কৃতিত্ব যদি থাকে তো অন্তরিন্দ্রিয়ের সেই গোপন নিগূঢ় চেতনায়। তার জন্যে তিনি বলেছেন —'যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে, তাঁরি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া'।

কবি কেবলই তীরের ঘাটে ঘাটে তরী ভেড়াতে চান নি, তিনি অকূল-নীরে শান্ত-গভীরে যেখানে তাঁর হৃদয়দেবতা আছেন, সেখানেই চান যেতে, আর তারি জন্যে তুফান তাঁকে তীর থেকে বারবার নিয়ে যায় অকূল-নীরে—

মাঝ-দরিয়ায়। কবির যাত্রা তো যুগ-যুগান্তরের অসংখ্য অনন্তের ঘাটে। তাই ঘাটে ঘাটে যাওয়ার অবসরে তাঁর প্রিয়সখা পথিকের মিলন-তৃপ্তি তিনি লাভ করেন এবং এই তৃপ্তিই তাঁর পক্ষে পরম ও চরম আনন্দ। কবি তাই এ'সম্পর্কে গেয়েছেন—

> পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
> পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
> যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে
> তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
> চায় না যে জন পিছন-পানে ফিরে,
> বায় না তরী কেবল তীরে তীরে—
> তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
> যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া।
> পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

অন্তরের কপাট খুলে সম্মুখে আহ্বান জানাচ্ছেন তাই কবি তার চিরসাথী জীবনদেবতাকে। এই যে আহ্বানের চাওয়া, এই যে অন্তরের দ্বারে চাওয়ার আঘাত দেওয়া, এই আঘাতই তো পাওয়ার বা চিরমিলনের আনন্দকে সার্থক করে। তারি জন্যে কবি গেয়েছেন—

> পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
> পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
> দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
> তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
>
> * * *
>
> যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।
> পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

তবে পথে চলার মধ্যে চির-বিরহ-বেদনার ক্ষণিক ব্যথা আছে, উৎকণ্ঠা আছে ও আকুলতার ক্রন্দন আছে, কেননা তখনও মিলন সার্থক হয়নি, কবি ও জীবনদেবতার মধ্যে তখনো পর্যন্ত আছে ব্যবধানের দূরত্ব। গীতি-মাল্যের একটি গানেও ঠিক এর প্রতিধ্বনি পাই—

ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণতলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : "এই ব্যথার পরম-দান তিনি (কবি) আহরণ করেছেন গীতালিতে। গীতিমাল্যের মধ্যে ভক্ত-ভগবানের নিবিড় প্রেমলীলার অভিব্যক্তি থাকলেও একটা পরিপূর্ণ ও শেষ-মিলনের মধ্যে কবি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের চরম-পরিণতি খুঁজেন নাই এবং গীতালিতে নিবিড় উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের মধ্যে নবচেতনার একটা সুর বাজিয়াছে। মিলনের আনন্দের সহিত--উপলব্ধির পরমতৃপ্তির সহিত একটা অতৃপ্তি ও বেদনা কবি যেন উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই অনাদি বিরহের বেদনা বুকে ধরিয়া, নব নব রূপে, নব নব রসে, নব নব পরিস্থিতিতে, প্রিয়তমের সহিত নিত্য-নূতন লীলা করাই কবির কামনা * *"।[১] প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রসলীলার মর্মকথাই তাই যে, বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য, সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁর লীলায় সম্পৃক্ত। তিনি ঘাত-প্রতিঘাতও দুঃখ-ক্লেশ-বেদনা-ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমি ও আমরা ছাড়া নন। এই তত্ত্বানুভূতিই কবির আসল জীবনোপলব্ধির কথা।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, যাত্রাপথের আনন্দ-গান গাওয়াই কবিরও জীবনধর্ম ও জীবনব্রত। গীতালির 'পথিক', 'সাথি' প্রভৃতি গানের মর্মকথাও তাই। 'পথিক' গানে তিনি বলেছেন—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন যে কাটায় গণি গণি, বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা, বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্তি আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায় আঁচল পাতি।

১। কাব্য-পরিক্রমা (২য় সংস্করণ, ১৩৬৪), পৃ° ৪৪৯

অনন্ত যুগের অনন্ত চলার পথে বিশ্বলোকের চরণধ্বনি শোনা যায়; কত যুগের রথের রেখা অনন্তকালের বক্ষে আঁকা রয়েছে; ক্লান্ত শ্রান্ত, চলার আর শেষ নাই। কবিও জানেন না যে, কবে তিনি পথে বার হয়েছেন, তাই সে যুগ-যুগান্তরের কথা! তবে প্রতিটি চলাই আবার কবিকে দিয়েছে নূতন জীবন-রসের পরিচয়। তারি জন্যে পথে-চলার নিত্যরসে থাকাই তাঁর আকাঙ্খা, কেবল জীবনদেবতার সঙ্গে চির-মিলনের জন্যে নয়। কবি গেয়েছেন—

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে, এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা, পথে যেতেই ভালোবাসা—
পথে-চলার নিত্য-রসে,
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

এ' কবির সেই একই কথা—যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি—

নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

'সোনার তরী'-রচনায় বিশ্বনৃত্যপ্রসঙ্গেও কবি ভিন্নভাবে বলেছেন,

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা-আনন্দ,
নব-সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

এই নূতন রঙের পরশ পাবার জন্যেই কবির বারে বারে আসা-যাওয়ার খেলা। কবি নিজেও বলেছেন যে, খেলা একেবারে চুকিয়ে দিলে তো প্রেম

হবে বৃথা। তাই নিত্য-নূতন খেলা ও খেলার সাথী জীবনদেবতার সঙ্গে নিত্য-প্রেমলীলার আনন্দ! 'সাথি' কবিতায়ও ঐ এক কথা—

ওগো নবপ্রভাত-জ্যোতি ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।

গীতালির আর একটি পথের গানে আমরা কবির বিরাট বিশ্ববোধের সার্থক নিদর্শন পাই। তিনি গেয়েছেন সেখানে—

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে
যেই গেহ,
সেই তো আমার গেহ।

* * *

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবার নিয়ে যাবার মাঝে লুকিয়ে
আছ তুমি,
সেই তো আমার তুমি।

পৃথিবীর ধূলি যতই দুঃখ-বেদনাপূর্ণ হোক না কেন, তা জীবনসাথী জীবনদেবতারই লীলাভূমি বলে চিরমধুময়। সর্বজনের এই ধূলিময় মর্ত্যভূমি তাই কবির কাছে স্বর্গভূমি। 'প্রকৃতির পরিশোধ'-এ কবি এই মর্মকথারই আভাস দিয়ে বলেছেন—

হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।

কবি আকাশে উড়ো পাখীর নিদর্শন দিয়েছেন এখানে। পাখী পৃথিবী ত্যাগ ক'রে উর্ধে অনন্তে আকাশচারী হোলেও অবশেষে যেমন পৃথিবীর বুকেই ফিরে আসে, তেমনিই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বারে বারে আসে

যায়, আবার বারে বারে পৃথিবীর ধুলাতেই তারা ফিরে আসে। এই আসা-যাওয়ার গতিপথেই সকল প্রাণ ক্রমে পরমমিলন লাভ করে পরমপথিক ভগবানের। কবির জীবনধর্মও তাই। বিশ্বের কোটি কোটি যাত্রীর সঙ্গে তাই কবিও চান চলতে ; একা নয়, সকলের সঙ্গে মহানন্দে ঐ পরমমিলনের দিকে। এই কথারই পুনরায় প্রতিধ্বনি পাই গীতালির 'পুনরাবর্তন' কবিতায়—

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের-ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ন-নীরে।

ধরণীর ধুলি যে কবির কাছে কত পবিত্র সেকথা তিনি বহু কবিতায়, বহু গানে ও বহু রচনায় প্রকাশ করেছেন। এই 'পুনরাবর্তন' কবিতার 'আবার * * ধুলার পরে করি খেলা', 'নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে' কথাগুলি থেকেই বোঝা যায়। দুঃখ-সুখের ও ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন-প্রবাহই যেন কবির কাছে পরম-আনন্দের সামগ্রী; কেননা এই আলো-ছায়ার ভিতর দিয়েই চিরসাথীর সঙ্গে কবির চির-আনন্দের মেলা।

গীতালির 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' গানটিতেও কবি-চিত্তের অক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আকুলতার ভাব যেন কিছু অধিক। চিরদিনই কবির যাত্রা সম্মুখের দিকে জীবনদেবতার প্রতি—'দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে', সুতরাং পিছন-ফেরার দীনতা তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে। তবে কবি ব্যথা ও বেদনারই চিরপূজারী, কেননা ব্যথা ও বেদনাই তাকে নিয়ে যাবে তাঁর চিরসাথীর সান্নিধ্যে। কবি গেয়েছেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।

গীতালির 'জ্যোতি' গানটিতেও দেখি কবি-জীবনে নিরাশার মাঝে আশা ও আনন্দের রেখাপাত করেছে। একে কবি বলেছেন 'আগমনীর গান'। গানটি হোল—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ এস এস নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমাই হউক জয়।
প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

কবি একান্ত শরণাগত ভাবে তাঁর জীবনদেবতাকে জানাচ্ছেন নূতন উদ্যমে প্রেমের আহ্বান। কঠোরতার পাশে কোমলতা ও অকল্যাণের পাশে সকল-কিছু কল্যাণকে নিয়েই কবির জীবনদেবতার সামগ্রাক সচ্ছল রূপ। তিমিরবিদারী সে জ্যোতির্ময় রূপে অখণ্ড ও খণ্ড, পূর্ণ ও অপূর্ণ, অসীম ও সসীম, মুক্তি ও বন্ধন, এক ও বৈচিত্র্য একাকার। কবি 'আত্মপরিচয়'-এ এ' গানের মর্মকথার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : "পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত আর এক দিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর এক দিকে মুক্তি। তার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য-ভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে

গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে"। সুতরাং 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়' গানটি কবির জীবন-উপলব্ধির তত্ত্ব এবং এই উপলব্ধ তত্ত্ব বা সত্যই কবির জীবনধর্ম। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একেই ভিন্নভাবে বলেছেন 'মিস্টিসিজম্'। এই মিস্টিসিজম্ কিন্তু পাশ্চাত্যের মিস্টিসিজম্ নয়, এ' হোল প্রাচ্যের তথা অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষের তত্ত্বস্পর্শী মিস্টিসিজম্। ডক্টর দাশগুপ্ত 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-গ্রন্থে বলেছেন: "জীবন ও চৈতন্য মানবসত্তার এমন এক বিশ্ব-পরিব্যাপ্তি পেল যাতে সে সব-কিছুকে ছাড়িয়ে সর্বানুভূঃ হোযে উঠলো। এ' হোল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের মিস্টিসিজম্" (পৃ° ৬৯)। এ' হোল সত্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধির বা প্রত্যক্ষ-তত্ত্বোপলব্ধির মিস্টিসিজম্ যা তাঁর গানে কবিতায় সাহিত্যে নাটকে নানা নিবন্ধে ও চিঠিপত্রে স্পষ্ট প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'সাহিত্যের পথে' (পৃ° ৩১) প্রবন্ধে বলেছেন: "জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠ বস্তু—গাছ নয়, তাব রস টানিবার ও প্রাণ ধবিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে-একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ— তাহা একই কালে বস্তুময় শক্তিময় সৌন্দর্যময়"। এই সমগ্রতাব অনুভূতিতে যে একটি অখণ্ড সত্যের প্রকাশ তাতে বস্তু, শক্তি'ও সৌন্দর্য—সৎ চিৎ ও আনন্দ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ও নিহিত। রবীন্দ্রসংগীতে এই রহস্যঘন তত্ত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট।

॥ উপসংহার ॥

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার উপযোগী ক'রে অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ও দেশী উভয় সংগীতধারাকে অনুসরণ ক'রে। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক, উৎসব, ঋতু-বর্ণনা প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য বিষয় উপলক্ষ্য করেও অনেক গান তিনি রচনা করেছিলেন সেকথা উল্লেখ করেছি। ব্রাহ্মসমাজের অভিজাত রুচি তদানীন্তন কালে ভারতীয় সংগীতের ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের গীতিধারাকে অব্যহত রাখার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মো-পসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগে নাই,—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপনি বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে"।[১]

তাহলেও কবির প্রতিটি গানেই তাঁর জীবনদর্শন ছড়ানো রয়েছে। হাস্য-কৌতুক, ঋতু-বর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা, উৎসব-পরিবেশ প্রভৃতির গানেও কবির জীবনচিন্তার ভাবধারা অনুস্যূত। সুতরাং প্রতিটি গান নিয়ে তাঁর দর্শনমতের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীতদর্শনচিন্তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীরা কেবলি সুর ও কথার হুবহু প্রতিফলন তথা অনুশীলন ও পরিবেশন না ক'রে সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ এবং জীবনদর্শন আলোচনা এবং উপলব্ধি করেন যাতে গানের সঙ্গে সঙ্গে। গানে প্রাণ সঞ্চার করাই গানের যথার্থ অনুশীলন এবং সে প্রাণ স্পন্দিত হবে গান-রচয়িতার জীবনাদর্শের সঙ্গে শিল্প-সার্থকতার আদর্শচিন্তাকে সঙ্গে নিয়ে। গানের ভিতর দিয়ে যখন উপলব্ধি করি আমরা বিশ্বের সৌন্দর্য ও বিশ্বরাজার লীলামাধুর্যকে তখনই গান হয় সার্থক। রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই সার্থকতার গান উপহার দিয়েই উপসংহার করি এই গ্রন্থের আলোচনা—

১। কাব্য-পরিক্রমা (১৯৪০), পৃ ১১০

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম-বাণী।
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন-সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

এটাই হোল কবির বিশ্বাত্মবোধ ও জীবনসত্যের নিবিড় উপলব্ধি গানের ভিতর দিয়ে।

প্রথম পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ও ফকির লালন শাহ্

বাউলধর্ম-সাধনা ও বাউলগান বাঙলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকার সময়ে এবং পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ-কালে বাউল-সাধকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দিন-রচিত 'হারামণি'-গ্রন্থে ভূমিকা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন : "আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল-পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

> কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে!
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
> দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে"। ১

'*The Religion of Man*' ইংরেজী গ্রন্থের পরিশিষ্টেও কবি বাউলধর্ম ও বাউলতত্ত্ববিষয়ে আলোচনার সময় 'The Baul Singers of Bengal' নিবন্ধে বিক্রমপুরের বাউল ব্রাহ্মণ ছক্কু ঠাকুরের গানের পরিচয় দিয়েছেন। ২ মোটকথা রবীন্দ্রনাথ যে বাউলগান ও বাউলতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন এ'সব আলোচনা থেকে বোঝা যায়।

১। এ'গ্রন্থে পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় বাউলগান আলোচনার সময় এই অংশের উল্লেখ করেছি। প্রাসঙ্গিকক্রমে এখানেও উল্লেখ করলাম।

২। *The Religion of Man* (London 1949), p. 213

পূর্ববাঙলার ফকির লালন শাহ্ (সাধারণত লালন সাঁঈ নামে পরিচিত) ছিলেন বিদগ্ধ বাউলধর্মের সাধক। তিনি বাউলগানও রচনা করেছিলেন অসংখ্য। তাঁর বাউলগানগুলি তত্ত্বে ও ভাব-গাম্ভির্যে অপরূপ ও অতুলনীয়। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ্-সম্পর্কে লিখেছেন : "পূর্বতন নদীয়া জেলার (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা) কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়রাগ্রামে লালনের জন্ম এবং মৃত্যু হয় ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক (ইংরেজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার"।[৩] মৃত্যুকালে লালন শাহের বয়স হয়েছিল ১১৬। লালন শাহ্ বাউল সিরাজ শাহ্ বা সাঁঈয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। লালন শাহ্-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর 'হারামণি'-গ্রন্থে, সুবোধচন্দ্র মজুমদার 'গ্রাম্য-সাহিত্য'-নিবন্ধে,[৪] ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাউলগান-সংগ্রহ'-গ্রন্থে। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ্-সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় দান-প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন : "লালন প্রথম প্রথম সেউড়িয়ায় খুব কম থাকিতেন। চতুষ্পার্শবর্তী অঞ্চলে—পাবনা রাজসাহী, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় শিষ্যগণের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। সেই সময় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে"।[৫] "লালনের চেহারা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক লালনপন্থী ফকির খোদবক্স শাহ্ বলেন (১৯৪০ সালে বয়স ৯৭ বৎসর) যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্টি-হীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, আয়ত চক্ষে এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি"।[৬]

বাউলরা প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত এবং দীক্ষা ও সাধনভেদেই এই চার ভাগ বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। আউল, বাউল, দরবেশ ও সাঁঈ (সাঁঈ

৩। 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', (উত্তর খণ্ড), পৃ° ৬

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম ভাগ) গ্রন্থে (পৃঃ ৯৯২) লিখেছেন : "লালন থাকিতেন কালিগঙ্গার ধারে, ঠাকুরদের জমিদারি বিরাহিপুর পরগণার ছেউড়িয়া গ্রামে"।

৪। 'বঙ্গদর্শন', ১৩১৬, বৈশাখ, পৃঃ ৪৬-৫০

৫। 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', পৃঃ ১১

৬। ঐ, পৃঃ ১৩

'স্বামী'-শব্দের অপভ্রংশ)। লালন ফকীর ছিলেন সাঁঈ বা স্বামী স্তরের সাধক। 'সাঁঈ' বাউলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম স্তর অথবা উপাধি। এই বাউলধর্ম ও বাউলসাধনার সঙ্গে মুসলমান সুফী-সম্প্রদায়ের সুফী-ধর্মসাধনার সাদৃশ্য থাকলেও বাউলধর্ম বাঙলাদেশেরই নিজস্ব সম্পদ। 'বাংলার বাউল' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন: "বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে বলেই অন্তরে অন্তরে পরিপূর্ণ সহজ মানুষ অর্থাৎ প্রাকৃত বলেই বাউলেরা এমন প্রাণবন্ত। তাই তাঁরা বাইরের সব সাধনাকেও আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। প্রাণের লক্ষণ হল এই আত্মসাৎ করবার শক্তি। বাংলায় যখন বিংশতী-সুরবর্দী কাদিরী-নক্শ্বন্দী প্রভৃতি সুফী-সাধনা এল তখন হিন্দু মুসলমান এই দুই দলের পণ্ডিতদের কাছে মিলনের আশা ছিল না। ইঁটে ইঁটে মেলে না, মেলে কাদায় কাদায়। * * তাই বাউলের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। * * এই বাউলদের পথেই দরবেশ, সাঁঈ, কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সম্প্রদায় চলেছে"।[৭] রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন: "Those of the Bauls, who have Islamic leanings, call such death in life '*fana*', a term used by the Sufis to denote union with the Supreme Being"।

তবে রবীন্দ্রনাথ বাউলগান ও বাউলতত্ত্বের প্রেরণা বাঙলার রাঢ়-অঞ্চল ও পূর্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বাউল-সাধকদের রচিত গান ও ধর্মসাধনা থেকে লাভ করলেও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যে বাউল লালন শাহের সংস্পর্শ ও তাঁর রচিত গান একথা স্বীকার্য। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে (১ম ভাগ) লিখেছেন: "উনবিংশ শতাব্দীর বাউল-কবিদের মধ্যে লালন ফকীরের স্থান খুব উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। * * লালনের এই গানটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করিয়াছিল,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

৭। 'বাংলার সাধনা' (বিশ্বভারতী প্রকাশন), পৃঃ ৭৬-৭৭

চিরদিন পুষলেম পাখী
বুঝলেম না তার ফাঁকি-ঝুকি
দুধ-কলা দিই খায় রে পাখী, তবু ভোলে না তায় ॥৮

রবীন্দ্রনাথ ফকির লালন শাহের কুড়িটি গান সংগ্রহ ক'রে সর্বপ্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি'-শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশ করেন।৯ ডক্টর শ্রীভট্টাচার্য লিখেছেন : "ইহার পূর্বে লালনের দুই চারিটি গান কোনো কোনো সংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এতগুলি গান প্রকাশ করিয়া লালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন"। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে লালন শাহের সংস্পর্শে আসেন এবং লালন শাহের আসল খাতা থেকে সংগ্রহ ক'রে পরে বিশুদ্ধ আকারে কতকগুলি বাউলগান প্রকাশ করেন। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এ' প্রসঙ্গে লিখেছেন : "বাউলগানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত-সমাজে তাহার কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউলগান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রসপিপাসু কবিচিত্ত অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়া অবহেলিত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের রসসম্পদ বহুগুণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দিয়াই আমরা বাউল গানের অতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বাউলগানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউলগানের সংগ্রহেও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমতম ও শ্রেষ্ঠতম"।১০

মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'হারামণি'-গ্রন্থে ১১ রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তার কিছু অংশ পূর্বে আলোচনা করেছি। তাছাড়া 'হারামণি'-গ্রন্থে মৌলবী মনসুরউদ্দীন রবীন্দ্রনাথ-লিখিত যে ভূমিকার সন্নিবেশ করেছেন তারও উল্লেখ করেছি পূর্বে। এখানে বাউল-সাধক ফকির লালন শাহের দু' একটি বাউলগানের নিদর্শন দিই—যাদের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বাউল-

---

৮। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম ভাগ), পৃঃ ৯৯২-৯৩

৯। 'প্রবাসী', ১৩২২, আশ্বিন মাঘ সংখ্যা।

১০। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৯২

১১। তবে 'হারামণি'-গ্রন্থে লালন-রচিত বাউলগানগুলির কথায় বা সাহিত্যে কিছু বিকৃতি আছে।

প্রকৃতির যে সকল গান রচনা করেছিলেন তারও কিছু কিছু উল্লেখ করেছি পূর্বে। বাউল লালন শাহের বাউলগানের মাধুর্যের তুলনা নাই। বাঙলার সরস জলবায়ু ও অধ্যাত্মদৃষ্টিসেবী পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুযায়ী সাধন-ভাবস্নিগ্ধ অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন লালন শাহ্ সেকথা বলেছি। ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউলগান'-গ্রন্থে ১৬০টি গানের সমাবেশ করেছেন এবং আরো অনেক গানের পাঠ বিকৃত হোলেও তাঁর কাছে তাদের সংগ্রহ আছে। লালনের দু' একটি গানের নিদর্শন যেমন—

(১) পারে লয়ে যাও আমায়।
অ-পার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়॥
আমি একা রৈলাম ঘাটে,
ভানু সে বসিল পাটে,
তোমা বিনে ঘোর সংকটে
না দেখি উপায়॥
নাই আমার ভজন সাধন,
চিরদিন বিপথে গমন,
নাম শুনেছি পতিতপাবন
তাইতে দেই দোহাই।
অগতির না দিলে গতি,
ও নামে রহিবে ক্ষতি,
লালন কয় অধমের পতি
কে বলবে তোমায়॥

(২) কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে॥
নামটি না-শরিকালা,
সবার শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডুবে॥

ত্রিজগতে যে বায়রাঞা
তবে দেখি ঘরখানা ভাঙা,
হায়রে মজার আজব-রঙা
দেখায় ধনি কোন্ ভাবে ॥
আপনে চোরা আপন বাড়ী,
আপনে সে লয় আপন বেড়ী,
লালন বলে এ' লাচাড়ি
কই না, থাকি চুপে চাপে।[১২]

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও গীতি-কবিতায় বাউলগানের ভাব-ভঙ্গি-ছন্দ-সুর অপূর্ব নবকলেবর পাইয়াছে"। একটি অজ্ঞাত 'আগুণ আছে ছাইয়ের ভিতরে' বাউলগানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গীতিমাল্যে 'তুমি যে সুরের আগুণ লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এ' আগুণ ছড়িয়ে গেল সবখানে' গানটি রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রকৃতির অনেক গানে বাঙলার বিদগ্ধ বাউলদের রচিত গানের ছন্দ ও ভাবের বেশ মিল পাওয়া যায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাউলপ্রকৃতির গানগুলি কাব্যসুষমাপূর্ণ ভাষা বা সাহিত্য-সহযোগে আরো রসসমৃদ্ধ।

১২। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে এ'গানটিও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পাঠে 'ত্রিজগতে সে বায়রাঞা' স্থানে আছে 'ত্রিজগতে সে বাই বাঙ্গা'।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রসংগীত-সমীক্ষা

ভাবের বৈচিত্র্যে ও সুরের বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি বিস্ময়কর। রবীন্দ্র-সংগীতের সংখ্যার দিক চিন্তা করলেও অবাক হতে হয়—এত বিপুল সংখ্যক গান একই ব্যক্তি রচনা করেছেন ও সুরারোপ করেছেন। এই বিচিত্র সম্পদের বিশ্লেষণ বহুভাবে করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণের কাজে এগোবার চেষ্টা করব। এস্থলে গানের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হল। বিভিন্ন আসরে বা সভা-সমিতিতে কোন কোন বক্তা রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গানের সংখ্যার উল্লেখ করে থাকেন। তাঁদের অনেককেই বলতে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গান আড়াই হাজার বা তিন হাজারের কাছাকাছি। এমন কি কেউ কেউ চার হাজার পর্যন্ত উল্লেখ করে থাকেন। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'গীতিবিতান' তিনখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গানের সংকলন পাওয়া যায়। গীতবিতানে প্রকাশিত হয় নি এমন গানের সংখ্যা যদিও বা থাকে তা নিতান্ত নগণ্যই হবে। অখণ্ড গীতিবিতান (আশ্বিন ১৩৭১) অনুযায়ী গানের সংখ্যা নিম্নরূপ :

গীতবিতান খণ্ড	পর্যায়	গানের সংখ্যা
প্রথম	ভূমিকা	১
	পূজা	৬১৭
	স্বদেশ	৪৬
		৬৬৪
দ্বিতীয়	প্রেম১	৩৯৩
	প্রকৃতি	২৮৩
	বিচিত্র	১৪০
	আনুষ্ঠানিক	২১
		৮৩৭

গীতবিতান খণ্ড	পর্যায়	গানের সংখ্যা
তৃতীয়	জাতীয় সংগীত	১৬
	পূজা ও প্রার্থনা	৮৩
	আনুষ্ঠানিক	১৭
	প্রেম ও প্রকৃতি	১০২
	নাট্যগীতি	১২৬
	ভানুসিংহের পদাবলী	২০
	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য[২]	১৭৭
	পরিশিষ্ট[৩]	১২০
	পরিশিষ্ট[৪]	৭
		৫৫৯
	সর্বমোট[৫]	২০৬০

(১) ২ খানা গান 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এখানে বাদ দেওয়া হল।

(২) গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' ও 'বাল্মিকী-প্রতিভা' ধরা হয়েছে। এই ছ'খানা নাট্যের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৭,১৮, ১৯, ২৯, ৪৮, ও ৪৯-তম খণ্ড স্বরবিতানে। এই ছ'খানার প্রত্যেকটি নাট্য গীতিবিতানে অখণ্ডরূপে মুদ্রিত হওয়ায় গানের সংখ্যা গণনা করা অসুবিধাজনক। স্বরবিতানে গান হিসেবে যেভাবে সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই ভাবেই গণনা করা হল। তাতে এই ছ'খানা নাট্যের মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬১। এই গানের মধ্যে ৮৪ খানা ইতিপূর্বে 'গীতবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে পর্যায়ভুক্ত হয়েছে— সুতরাং (২৬১-৮৪) মোট ১৭৭টি গান স্বতন্ত্রভাবে এ'খণ্ডে ধরা হল। তাছাড়া 'তাসের দেশ' নাটিকার ২৭ খানা গানও 'গীতবিতান' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে বলে আলাদাভাবে দেখানো হল না।

(৩) মোটসংখ্যা গণনায় 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ৮টি গানের আখরহীন ও আখরযুক্ত উভয় সংখ্যা এবং ১৪টি গানের পাঠান্তরের ক্ষেত্রেও

উভয় সংখ্যা ধরা হল। এই ২২টি গান যদি একবার ধরা হয় তাহলে মোট সংখ্যা হবে প্রায় ২০৩৮টি।

উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী গানের মোট সংখ্যা প্রায় ২০৬০ কিংবা গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের ১৭৭ খানা বাদ দিলে ১৮৮৩টি। বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভগবদ্‌ভক্তিমূলক পূজা-পর্যায়ের গানই সর্বাধিক। 'গীতাঞ্জলি'-র কবির পক্ষে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। তারপর প্রেম-পর্যায় ও তারপর প্রকৃতি ও অন্যান্য। কাব্যরূপ ও সুর-মাধুর্য দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক গানের বিচার করলে দেখা যাবে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রসের উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পরবর্তী জ্ঞাতব্য বিষয় স্বরলিপিসম্পর্কে। বিশ্বভারতী এ' পর্যন্ত স্বর-বিতানের ৫৯টি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত ৬টি গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত ২৬১ খানা গানের স্বরলিপিসহ মোট ১৮৭৯টি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। এখনও ১৮১টি গান (২০৬০-১৮৭৯) বাকী রইল যার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়নি।

সুর ও তালের বিচারেও রবীন্দ্রসংগীত বাংলা ও ভারতের একটা বিশেষ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত ও বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের যে প্রভাব পড়েছিল তা তাঁর প্রথম জীবনের সংগীত-রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, জীবনে তিনি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের ছাঁচে বহুগান রচনা করেছেন। এই সমস্ত গান-সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অবকাশ আছে। স্বরবিতানের স্বরলিপিতে প্রথম দিককার রচিত ৫৪৬টি গানের রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। ('স্বরবিতান', খণ্ড ৪, ৮, ৯, ১০, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৫ দ্রষ্টব্য) রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্যও কম বিস্ময়কর নয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই ৫৪৬টি গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী ও তালের সংখ্যা দেখানো হল।

(ক) : স্বরবিতানে নির্দেশিত রাগ-রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত গানের সংখ্যা :
(স্বরবিতান খণ্ড : ৪, ৮, ৯, ১০, ১০, ২২-২৯, ৩২, ৩৫-৩৮, ৪৫)

রাগ-রাগিণীর নাম		গানের সংখ্যা
১	অহং	১
২	আলাইয়া	৬(১)
৩	আড়ানা	৫
৪	আশাবরি	১০(৪)
৫	আশা-ভৈরবী	২
৬	আনন্দ-ভৈরবী	১
৭	ইমন	৬(২)
৮	ইমলী	১
৯	ইমন-কল্যাণ	২২
১০	ইমন-ভূপালী	৪
১১	কর্ণাটী-খাম্বাজ	১
১২	কর্ণাটী-ঝিঁঝিট	১
১৩	কর্ণাটী ভজন	১
১৪	কাফি	৮
১৫	কাফি-সিন্ধু	৭
১৬	কামোদ	৩(১)
১৭	কানাড়া	৮(৪)
১৮	কাফি-কানাড়া	৩
১৯	কালাঙ্ড়া	৫(৩)
২০	কালাঙ্ড়া-সোহিনী	১
২১	কীর্তন	৭
২২	কেদারা	১১(৪)
২৩	কুকব (ককুভ)	১
২৪	খট্	৫(১)
২৫	খাম্বাজ	২২(৬)

	রাগ-রাগিণীর নাম	গানের সংখ্যা
২৬	গারা	১
২৭	গান্ধারী	১
২৮	গৌড়	২
২৯	গৌরসারঙ্‌	৭(২)
৩০	গৌরমল্লার (গৌড়-মল্লার)	২
৩১	গৌরী	১(১)
৩২	গৌরী-পূরবী	১
৩৩	গুজরাটি-ভজন	১
৩৪	গুর্জরি-টোড়ি	৩
৩৫	গুণকেলি	১(১)
৩৬	ছায়ানট	১১(৪)
৩৭	জয়জয়ন্তী	৫(২)
৩৮	জঙ্‌লা	১
৩৯	ঝিঁঝিট	১০(৭)
৪০	ঝিঁঝিট-খাম্বাজ	৩
৪১	টোড়ি	৮(৬)
৪২	টোড়ি-ভৈরবী	১
৪৩	তিলক-কামোদ	৩
৪৪	দেশ[১]	১৫(১)
৪৫	দেশ-কার	১
৪৬	দেশ-খাম্বাজ	১
৪৭	দেশ-সিন্ধু	১
৪৮	দেশী-টোড়ী[২]	১
৪৯	দেওগিরি	১

১। 'দেস' এই বানানও সংগীতশাস্ত্রে দেখা যায়।

২। 'তোড়ী' শব্দই শাস্ত্রনির্দেশিত। তাছাড়া দেবগিরি, বিলাবল, সারঙ্গ বা সারঙ্‌, আলাহিয়া, হেমক্ষেম প্রভৃতি নামও প্রচলিত।

রাগ-রাগিণীর নাম		গানের সংখ্যা
৫০	দেওগিরি-বেলাওল	১
৫১	দীপক-পঞ্চম	১
৫২	ধুন	১
৫৩	নট	১
৫৪	নট-নারায়ণ	১
৫৫	নট-মল্লার	৩
৫৬	নট-হাম্বীর	১
৫৭	নাচারি-টোড়ি	১
৫৮	নায়কী·কানাড়া	১
৫৯	পরজ	৩(১)
৬০	পরজ-বসন্ত	৪
৬১	পিলু	৬(২)
৬২	পিলু-বাঁরোয়া	৬
৬৩	পূরবী	৯(২)
৬৪	পূর্ণ-ষড়্জ-রাগিণী	১
৬৫	প্রভাতী	৩
৬৬	বড়হংস-সারঙ্	১
৬৭	বাউল	১১
৬৮	বাঁরোয়া	৫(৫)
৬৯	বাঁরোয়া-পিলু	১(১)
৭০	বাগেশ্রী	৩(১)
৭১	বাহার	২০(৬)
৭২	বাহার-বাগেশ্রী	২
৭৩	বিভাস	১১(৫)
৭৪	বেলাওল (বিলাবল)	৮(৪)
৭৫	বেহাগ	৩৫(৭)
৭৬	বেহাগ-খাম্বাজ	৬

রাগ-রাগিণীর নাম		গানের সংখ্যা
৭৭	বেহাগড়া	১
৭৮	বৃন্দাবনী-সারঙ্	১
৭৯	ভজন	১
৮০	ভীমপলশ্রী	৩(১)
৮১	ভৈরবী	৩৭(৩)
৮২	ভৈরোঁ (ভৈরব)	৯(১)
৮৩	ভূপালী	৫(৪)
৮৪	মল্লার	৯(৭)
৮৫	মহীশূরি-ভজন	১
৮৫	মালকোষ	১(১)
৮৭	মারু-কেদারা	১
৮৮	মিশ্র	১২
৮৯	মেঘ	১
৯০	মেঘাবলি	১
৯১	মূলতান	২(১)
৯২	যোগীয়া	১০(৬)
৯৩	রামপ্রসাদী	২
৯৪	রাজবিজয়	২(১)
৯৫	রামকেলি	১৩(৫)
৯৬	ললিত	৫(২)
৯৭	ললিত-কালাঙ্ড়া	১
৯৮	ললিতা-গৌরী	১
৯৯	লচ্ছাসার (লচ্ছাসাগ)	১
১০০	লুম-খাম্বাজ	১
১০১	সরফর্দা	২
১০২	সাহানা	৯(৬)
১০৩	সিন্ধু	৯(৫)

	রাগ-রাগিণীর নাম	গানের সংখ্যা
১০৪	সিন্ধু-খাম্বাজ	৫
১০৫	সিন্ধু-বাঁরোয়া	২
১০৬	সিন্দুড়া	৩
১০৭	সুরট	২
১০৮	সুরট-মল্লার	১
১০৯	সুহা-কানাড়া	১
১১০	শঙ্করা	৪(৩)
১১১	শঙ্করাভরণ	১
১১২	শুক্ল-বেলাওল (শুক্ল-বিলাবল)	১
১১৩	শ্যাম	১
১১৪	শ্রীরাগ	৩
১১৫	হাম্বীর	৯(৩)
১১৬	হেমখেম	১
	মোট	৫৪৬(১৩৪)

(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা দ্বারা 'মিশ্র' বোঝানো হয়েছে)

উল্লিখিত ৫৪৬টি গানের রাগ-রাগিণী তদন্ত করে দেখা যায়—ভৈরবী, বেহাগ, ইমন-কল্যাণ, খাম্বাজ, বাহার—এই কয়টি রাগ-রাগিণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশ, রামকেলি, কেদারা, ছায়ানট, বিভাস, যোগীয়া, সাহানা, সিন্ধুও বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। বাঙ্‌লার নিজস্ব সম্পদ বাউল ও কীর্তনও রবীন্দ্রনাথে গানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, কর্ণাটী, গুজরাটি বা মহীশূরী ভজন ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত তালিকায় দেখানো হলেও এগুলো আঞ্চলিক বিশেষত্বের দাবী রাখে। রাগসংগীতের পর্যায়ে এদের দেখানো বোধহয় ঠিক হবে না। তা ছাড়া মিশ্রসুরের ১২টি গান উপরোক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দুই কিংবা ততোধিক রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে এই গান-

গুলোর সুরোরোপ করা হয়েছে বলে স্বরবিতানে 'মিশ্র' নামে নির্দশিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ৫৪৬টি গানের মধ্যে ১১৬টি বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫২টি রাগ-রাগিণী মাত্র একটি করে গানে ব্যবহার করা হয়েছে। ১০টি রাগ-রাগিণীতে দু-টি করে এবং ১২টি রাগ-রাগিণীতে ৩টি করে গান ব্যবহৃত হয়েছে। রাগ-রাগিণীর সংখ্যা অনেক হলেও গানের সংখ্যা বিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ-রাগিণীর সংখ্যা কম। শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর সামান্য পরিবর্তন করে মিশ্রণ করেছেন বহু গানে। উল্লিখিত তালিকায় গানের সংখ্যার পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'মিশ্র' রাগ-রাগিণীর সংখ্যা দেখানো হল। বর্তমানে আলোচিত স্বরবিতানের ১৮ খানা খণ্ডে প্রকাশিত গানগুলোর অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা, সুতরাং এগুলো অধিকাংশই রাগাশ্রয়ী। পরবর্তী জীবনে অধিকাংগ গানই বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে কিংবা ছায়াবলম্বনে রচিত। তাছাড়া প্রচুর গান বাংলার লোক-সংগীতের ঢং-এ রচিত হয়েছে। এই মিশ্রণই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীতের পরিণত বৈশিষ্ট্য। এই মিশ্রণের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?"

বর্তমানে আলোচ্য ৫৪৬টি গানের তালের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। নিম্নে 'খ' তালিকায় কোন্ তালে কত গান আছে তা দেখানো হোল।

(খ): স্বরবিতানে নির্দেশিত তালের অন্তর্ভুক্ত গানের সংখ্য

(স্বরবিতান খণ্ড: ৪, ৮, ৯, ১০, ২০, ২২-২৯, ৩২, ৩৫-৩৮, ৪৫)

	তালের নাম	মাত্রা সংখ্যা	গানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	অর্ধ-ঝাঁপতাল	৫	১	
২	ঝম্পক	৫	৫	
৩	দাদরা	৬	৪৭	
৪	ষষ্ঠী	৬	১	

	তালের নাম	মাত্রা সংখ্যা	গানের সংখ্যা	মন্তব্য
৫	কাশ্মিরী খেমটা	৬	৩	
৬	তেওরা	৭	৩৬	
৭	রূপক	৭	১	
৮	কাহারবা	৮	২১	
৯	যৎ	৮	৫	১৪মাত্রার যৎ-ও প্রচলিত আছে।
১০	রূপকড়া	৮	৫	
১১	কাওয়ালি	৮	২১	১৬-মাত্রার দ্রুত ত্রিতালকে পূর্বে কাওয়ালি বলা হত। বর্তমানে ৮-মাত্রার কাওয়ালি প্রচলিত।
১২	নবতাল	৯	২	
১৩	ঝাঁপতাল	১০	৬৪	
১৪	সুরফাঁকতাল	১০	১৩	
১৫	একাদশী	১১	১	
১৬	একতাল	১২	১০৭	
১৭	খেমটা	১২	১৫	
১৮	আড়-খেমটা	১২	৯	
১৯	চৌতাল	১২	৪১	
২০	আড়া-চৌতাল	১৪	৩	
২১	ধামার	১৪	১৪	
২২	পঞ্চমসওয়ারি	১৫	১	
২৩	ত্রিতাল	১৬	৯১	
২৪	ঢিমা তেতালা	১৬	৬	
২৫	মধ্যমান	১৬	৬	
২৬	আড়াঠেকা	১৬	৯১	
২৭	নবপঞ্চ	১৮	১	
২৮	তালফেরতা	-	৭	
		মোট—	৫৪৬	

উপরি-উক্ত তালিকায় তালের নাম ও মাত্রা-সংখ্যাসহ গানের সংখ্যা দেখানো হল। উল্লেখযোগ্য, তালফেরতা-তালের মাত্রা-সংখ্যা দেখানো হয়নি, কারণ একই গানে দুই বা ততোধিক তাল পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে প্রাধান্য লাভ করেছে একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি গুরুগম্ভীর তাল। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রসংগীতে যখন রাগ-রাগিণীর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে তখনকার বিপুল সংখ্যক গানে দাদরা, কাহারবা প্রভৃতি লঘুপ্রকৃতির তালের ব্যবহার বেশী পাওয়া যায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, সংগীতের ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ সুরের ও তালের বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই বিরাট বিষয়বস্তুর গভীরে তত্ত্বানুসন্ধান করলে রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করি।[১]

১। প্রবন্ধটি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত। তাঁর অনুমতি অনুসারে এ'গ্রন্থে মুদ্রিত হোল। অবশ্য এ' বিষয়ে তিনি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাসের সহায়তা নিয়েছেন।